ওষুধ খেয়ে অসুখ
ভবানীপ্রসাদ সাহু
GEL
TABLETS

ওষুধ খেয়ে অসুখ

(বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও হাথী কমিটি (১৯৭৫) ঘোষিত
প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাসহ)

ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু

পরিবেশনায়

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

বিষয়সূচী

দু'চার কথা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সব কিছুই পণ্য, মুনাফার জন্য বলিপ্রদত্ত। সাধারণ মানুষের স্বার্থকেও সেখানে বলি দেওয়া হয়েছে। মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের উপরও সে বসিয়েছে তার অন্তহীন লোভের থাবা। গর্ভাবস্থা থেকে শ্মশান বা কবর, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, ব্যক্তিত্ব গঠন থেকে জ্ঞান অর্জন—শরীর ও জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সে ছাড় দেয় না।এ ব্যবস্থা টিকে থাকার প্রধান শর্ত—ক্রমবর্ধমান মুনাফা, সমাজের ব্যাপক মানুষকে কৌশলে প্রতারিত করে মুষ্টিমেয় দু'চারজনের হাতে কেন্দ্রীভূত সম্পদ ও ক্ষমতা। এর জন্য নানা কৌশলে তাকে তার পণ্য বিক্রি করতে হয়, সৃষ্টি করতে হয় নিত্যনতুন চাহিদা, বিশ্বাস ও সংস্কার।

এক সময় পুরোহিত ও রাজন্য সম্প্রদায় তথা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শাসকশ্রেণী নিজেদের অস্তিত্ব ও শাসনশোষণকে সুদৃঢ় করতে,—মানুষের অসহায়তা, সীমাবদ্ধ জ্ঞানও সারল্যের সুযোগে অজস্র মিথ্যা বিশ্বাস ও সংস্কার সৃষ্টি ও সুদৃঢ় করেছে, সেগুলিকে প্রশ্রয় দিয়েছে ও কাজে লাগিয়েছে, যেমন অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তি ও ঘটনাবলীকে। এর জের এখনো চলছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত, এরই সাথে একই শাসন-শোষণ-অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে অর্বাচীন ব্যবস্থা, পুঁজিবাদও মরীয়া হয়ে সৃষ্টি করেছে আধুনিক, 'বিজ্ঞানসম্মত' সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস—নিছক ব্যবসা ও মুনাফার জন্য। পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষের অসহায়তা ও অসচেতনার সুযোগ নিয়ে এই পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী নানা প্রতিনিধি মারফৎ তাদের ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। নিজেদের দেশের বাজার কব্জা করার পর কিংবা সেখানে সচেতন জনমতে কোণঠাসা হয়ে, টিকে থাকার অন্তিম প্রয়াস চালাচ্ছে অন্য দেশের বাজারে থাবা বাড়িয়ে, শুরু করেছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের আদর্শ শিকার। অর্থনৈতিক চাপ, সাংস্কৃতিক প্রভাব, ঢালাও ঘুষ, বিপুল বিজ্ঞাপনের হাতিয়ারের সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে তাদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন কিছু গোষ্ঠী, তাদের অনুকূল মানসিকতা। যাদের শাসন-শোষণ করা হচ্ছে তাদের মধ্য থেকে তাদের অজান্তে নিজেদের সমর্থক বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা শাসকশ্রেণী করে ; আর তখন তাদের এই শাসন-শোষণ হয়ে ওঠে আরো ভয়াবহ, আরো শক্তিশালী। কি সামন্ততান্ত্রিক, কি পুঁজিবাদী—উভয় ব্যবস্থাই একাজ করে চলেছে সার্থকভাবে,—যদিও উভয়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক কিছু পার্থক্যও। সামন্ততন্ত্র দোহাই দেয় ঈশ্বরের, পুঁজিবাদ সামনে রাখে আধুনিকতা ও বিজ্ঞানকে।

এখনো, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও গবেষণার সুফলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ব্যাপক মানুষের হাতে নেই, সে ক্ষমতা রয়েছে বিশেষ এক গোষ্ঠীর হাতে। এ জ্ঞানকে এ গোষ্ঠীরই সেবাদাসে পরিণত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়।

সাধারণ মানুষকে প্রতারিত ও শাসন করে, ধর্মব্যবসা বা অবতার ব্যবসা

চালানোর জন্য, অলৌকিকতা-আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত নানা কুসংস্কারকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয় নানা রহস্যময়, দুর্বোধ্য, ধোঁয়াশায় ঢাকা কথাবার্তা,—সেগুলির মুখোশ পরান হয় প্রাচীন দর্শনের। একইভাবে ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নানা জটিল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রহস্যময় শব্দাবলী, দুর্বোধ্য তথ্যাবলী—মুখোশ পরান হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবসা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয় সমাজে বিশিষ্ট বলে পরিচিত কিছু দালালের—এদের মধ্যে তথাকথিত বিজ্ঞানীরাও থাকেন। পরবর্তী ক্ষেত্রেও একইভাবে দালালগোষ্ঠী কাজ করে—এদের মধ্যে বহু তথাকথিত বিজ্ঞানীরা যেমন আছেন, তেমনি থাকেন তথাকথিত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও।

বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে একসময় কিছু ধর্মীয় অনুশাসন সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে ধরে রাখতে ভূমিকা পালন করেছে; ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষকে যুগিয়েছে মানসিক সাহস, যুগোপযোগী নৈতিকতা। কিন্তু শাসকশ্রেণী তাকে মূলত শাসনের কাজেও লাগিয়েছে, ধর্মের আফিমে মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিক্ষোভহীন নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছে ব্যাপক মানুষ। এর জের এখনো আছে। একইভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা জ্ঞান মানুষের জীবনকে সুস্থ-সুন্দর-উন্নততর করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। কিন্তু শাসকশ্রেণী তাকে ব্যবহার করছে ব্যাপক মানুষকে মূলত শোষণ করার কাজে, বিজ্ঞানের গণমুখী প্রয়োগের পরিবর্তে অপপ্রয়োগে সুদৃঢ় করা হচ্ছে শাসনের হাতিয়ার—এ উদ্দেশ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু দিকের প্রতি (যেমন, পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ গবেষণা) তথা আধুনিক পণ্যাবলীর প্রতি সৃষ্টি করা হয়েছে অস্বাভাবিক মোহাচ্ছন্নতা। এর সুফলগুলির কিছু ছিটেফোঁটা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

এইভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের সুফল পৌঁছে দেওয়ার আড়ালে পুঁজিবাদ জমিয়ে তোলে পুঁজির পাহাড়, বিস্তার করে আধিপত্য।তা করতে গিয়ে অজস্র মিথ্যাচার ও প্রতারণা তাকে করতে হয়, গড়তে হয় মিথ্যে চাহিদা ও বিশ্বাস। স্বাস্থ্যরক্ষা ও অসুস্থতার প্রসঙ্গে এইভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে কিছু বিপজ্জনক মানসিকতা ও পণ্যনির্ভরতা। শরীর কিছু খারাপ বুঝলেই দোকান থেকে নিজে কিনে বা চিকিৎসকের মাধ্যমে কিছু ওষুধপত্র না খাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, শরীর কিছু দুর্বল মনে হলেই টনিকের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, বাচ্চার শরীর ভাল করতে গ্লুকোজ-হরলিকস-ভিভা ইত্যাদি গেলাতেই হবে, টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত না মাজলে মুখটা কেমন লাগে, চুলের স্বাস্থ্যের জন্য নানা স্যাম্পু বা তেল কিংবা চামড়ার জন্য নানা ক্রীম বা লোশন অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে হয়॥

হাঁচি-টিকটিকির আওয়াজে মন খুঁতখুঁত করা, শ্রাদ্ধ-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বা ঠাকুরের পূজো না দেওয়া অব্দি নিশ্চিন্ত হতে না পারার মত অজস্র সংস্কার আগে তো বটেই, এখনো বহু মানুষের জীবন ও মানসিকতার সংপৃক্ত একটি দিক।

একইভাবে গত কয়েক দশকের মধ্যেই বিজ্ঞানকে সামনে রেখে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে ব্যাপক মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মর্যাদাবোধ, ভাললাগা-মন্দলাগা, মানসিক আবেগ, স্বাভাবিক শারীরিক ঘটনাবলী ইত্যাদিকে। তফাৎ হচ্ছে—পুরনো দিনের মত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রতি নয়,—আধুনিক মানসিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশ্বাস সৃষ্টি করা হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জিনিসের প্রতি। এইভাবেই ক্রয় ক্ষমতা যাদের আছে, তারা ছাড়াও নিতান্ত দরিদ্র মানুষও এই পণ্যসর্বস্ব 'আধুনিক' জীবনযাত্রার প্রতি মোহ পোষণ করতে শুরু করেছেন। অলৌকিকত্বে পরম বিশ্বাসী মানুষও, প্রয়োজনে তো বটেই, অপ্রয়োজনেও নানা পণ্যের খরিদ্দার।

পুরনো সংস্কারের মত আধুনিক সংস্কারাবলীর পেছনেও কাজ করে ব্যাপক মানুষের অসচেতনতার পাশাপাশি কিছু যুক্তিবোধহীন মানসিকতা। ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে ঈশ্বর-দেব-দেবী-অলৌকিকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকেরই সৃষ্টি হয়েছে বদ্ধমূল বিশ্বাস,—হাজার যুক্তিতেও টলেন না তাঁরা। একইভাবে ছোটবেলা থেকে ব্যবহার করে বা দেখেশুনে, ও দূরদর্শন-শিশুপাঠ্য পত্রিকা ইত্যাদিতে অজস্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, অনেকেরই আধুনিক নানা পণ্যের প্রতি সৃষ্টি হয়েছে দ্বিধাহীন বিশ্বাস। যুক্তিতথ্য দিলেও মন থেকে অনেক আধুনিকাই মানবেন না যে, ট্যালকম পাউডার বা বোরোলিন-বোরোপ্লাস জাতীয় জিনিস মাখলে ঘামাচি বা ব্রণ কমে তো না, বরং বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ; অনেকে হয়তো মানসিক আঘাতই পাবেন যদি তাঁকে বলা হয়, পয়সা খরচ করে যে টনিক-হরলিকস জাতীয় পদার্থ খাচ্ছেন তাতে আসলে তিনি বোকাই বনছেন ; অনেকে চিকিৎসকের ডিগ্রীর প্রতি হয়তো সন্দেহই প্রকাশ করবেন যদি সেই চিকিৎসক বলেন যে, সামান্য কষ্টে এ্যানালজিন ইত্যাদি না খেয়ে একটু ঘুমোন কিংবা কাশির জন্য কোন ওষুধ না লিখে দিয়ে বলা হয় গরম জলের ভাপ শ্বাসের সাথে নিতে।

পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানুষের মানসিকতা, অভ্যাস, কাজকর্মের ধারাও পাল্টেছে। এ ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক ব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা ও সমস্যা, উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান। এসবের ফলেও নানা রোগ সৃষ্টি হয়। আর সময়াভাবে মানুষ চায় হাতের কাছে পাওয়া রেডিমেড ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করে সুস্থ থাকতে। নানাবিধ সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ মানা, খাদ্য ও অন্যান্য অভ্যাস, শারীরিক শ্রম করা, সামান্য অসুবিধে সহ্য করা ইত্যাদির অবকাশ তার নেই ; হাতের কাছে পাওয়া জিনিষপত্র থেকে ওষুধ বা চিকিৎসার উপকরণ বানিয়ে নেওয়া বা সময়-সাপেক্ষ কিন্তু নিরাপদ চিকিৎসা করার ধৈর্য, সময় ও কষ্টস্বীকারের মানসিকতা সে হারিয়ে ফেলেছে। যে ব্যবস্থায় বৈষম্য ও তার কারণে অসুস্থ প্রতিযোগিতা,

ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি থাকবে না, দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সামাজিক উৎপাদনের বাইরে মানুষের হাতে থাকবে নিরুদ্বেগ কিছু সময়, তখন এই কারণেও রোগের ঘটনা আর ওষুধের প্রয়োজনও যেমন কমবে, যেভাবে হোক চটজলদি কষ্ট কমিয়ে নিয়ে কাজে লেগে যাওয়ার প্রয়োজনও যেমন কমবে, তেমনি জেনে বা না জেনে ক্ষতিকরও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহারের প্রবণতাও কমবে।

তবু নানাবিধ রোগের জন্য ওষুধের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের কাছে হাজির করেছে প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী নানা ওষুধ এবং শল্যচিকিৎসার মত জীবনদায়ী নানা চিকিৎসাপদ্ধতি। কিন্তু পাশাপাশি মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে,—পণ্যসর্বস্ব ব্যবস্থার অনুসঙ্গ হিসেবে, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবসাও করা হচ্ছে। পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের ফসল বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিসহ, ছোটখাট দেশী ও 'সরকারী' কোম্পানিগুলিও এ ধরনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিকর বলে এক দেশে নিষিদ্ধ একটি ওষুধ নিছক ব্যবসার জন্য অন্য দেশে চালানো হচ্ছে, আসল তথ্য চেপে গিয়ে বা মিথ্যে কথা বলে। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বিজ্ঞাপনের জোরে শরীর 'সুস্থ-সুন্দর' করার নামে কেনান হচ্ছে। নিছক ব্যবসার জন্য অনেকের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে অনাবশ্যক চিকিৎসা।

আর এসব কারণেই পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর ওষুধের বিরুদ্ধে তথা সুস্বাস্থ্যের জন্য আন্দোলন সফল হতে পারে না; যে ব্যবস্থায় শিক্ষা-সংস্কৃতি-খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান—সব কিছুই ব্যক্তি স্বার্থ ও মুনাফা কেন্দ্রিক এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে বলিপ্রদত্ত সেখানে ওষুধ ও চিকিৎসকমহল তথা সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা তার ব্যতিক্রম হবে এ আশা করা যায় না। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, সামাজিক দায়িত্ববোধহীনতা এ ব্যবস্থার সাথে জড়িত, জড়িত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে দেশকে বিকিয়ে দেওয়ার মানসিকতাও। যে ব্যবস্থা এসব প্রশ্রয় দেয় প্রয়োজন তার পরিবর্তন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের সুফলকে ব্যাপক মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ও তাদেরই স্বার্থে প্রয়োগ করা এছাড়া সম্ভব নয়। এ পরিবর্তন না ঘটিয়েই, আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের মোহে আচ্ছন্ন করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর গাড্ডায়,—যেন সেই বংশীবাদকের মত, যে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট করে হাজার হাজার ইঁদুরকে নদীতে ফেলেছিল। বাঁশীর সুর তো ভালই, কিন্তু তার প্রয়োগ কত ভাবেই হয়!

এ বইতে মুনাফা-সর্বস্ব, পণ্য-প্রাণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অতি প্রাথমিক একটি পদক্ষেপ হিসেবে, ওষুধের নামে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার, ব্যবসা ও প্রতারণার দিকগুলিকে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু পণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যা ঠিক ওষুধ হিসেবে প্রচলিত নয়; কিন্তু বিলাসদ্রব্য

বা 'পুষ্টিদায়কই' হোক বা অন্য ভাবে হোক—এগুলিও শরীরকে সুস্থ-সুন্দর রাখার জন্যই প্রচারিত। আলোচনার সুবিধার্থে প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে ওষুধ বা এ ধরনের পদার্থগুলির বিশেষ কয়েকটির ও বিশেষ কিছু কোম্পানির নাম করা হয়েছে। এর অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, শুধুমাত্র এদের ব্যবসা মার খাওয়ানোর জন্য এরাই আলোচনার একমাত্র বিষয় বস্তু, বা ব্যক্তিগতভাবে শুধু এগুলির প্রতি কোন বিদ্বেষ রয়েছে। স্থান সংক্ষেপ করা ও সামর্থ্যের অভাব—মূলতঃ এ দুটি কারণেই এ ধরনের সমস্ত সংস্থা ও পণ্যাবলীকে আলোচনায় আনা সম্ভব হয়নি।

পাশাপাশি একটি সতর্কতাও উচ্চারণ করা উচিত। আমরা যেন সচেতন হতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল্যবান অবদানকে অস্বীকার না করি। বিজ্ঞানের যা কিছু জনগণের স্বার্থবাহী, যা কিছু মানুষের উন্নততর সুস্থ জীবনযাপনের সহায়ক তাকে অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব। প্রয়োজন বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বন্ধ করা, প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ও তার সুফলকে পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুঠো থেকে বের করে আনা। এর সাথে চিকিৎসাক্ষেত্রে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার এর আগে শতশত বছর ধরে প্রচলিত ঐতিহ্যমণ্ডিত, লোকচিকিৎসা পদ্ধতির সঠিক মূল্যায়ন, গবেষণা ও তার সঠিক দিকগুলিকে সাম্প্রতিক জ্ঞানের সাথে মেলান। পুঁজিবাদের ছত্রছায়ায় লালিত নানা সংস্থা তথা বিভিন্ন শাসকবৃন্দের অনেকেই এই সব ঐতিহ্যমণ্ডিত চিকিৎসা পদ্ধতির উপর সম্প্রতি জোর দিচ্ছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, দিনের পর দিন এসব পদ্ধতির অবদমন ও অবমূল্যায়ন করার পর, এদের উপর আন্তরিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ছাড়া—কম খরচের বা সহজ পদ্ধতির ধুয়ো তুলে সেগুলি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার এই পুনর্নবীকৃত কৌশল মোটেই ব্যাপক মানুষের হিতার্থে নয়। এর মধ্যে জনগণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার প্রচেষ্টা রয়েছে, রয়েছে জনগণের চিকিৎসার ব্যাপারটি শুধু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টি পাথরে যাচাই না করে ও দুই পদ্ধতির সঠিক সমন্বয় না ঘটিয়ে, প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতিকে গরীবদের জন্য, আর আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সচ্ছলদের জন্য বলে কৌশলে প্রতিষ্ঠিত করলে, তা অপেক্ষাকৃত গরীবদের মধ্যে ব্যয়বহুল, আড়ম্বরপূর্ণ আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি আগ্রহ ও মোহেরই সৃষ্টি করে। এতে পুঁজিবাদী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাণিজ্যিক লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। এইভাবেই বিদেশী জাঁকজমকপূর্ণ চিকিৎসাপদ্ধতি, রঙচঙে দামী ওষুধ, বাহ্যিক আড়ম্বরে ভরা চিকিৎসক ইত্যাদির প্রতি বেশ কিছুজনের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়—নিছক বাহ্যাড়ম্বরের কারণেই।

পণ্য বিক্রি করে মুনাফার সুযোগ যেখানে প্রায় নেই এব্যবস্থায় সেই সব চিকিৎসাপদ্ধতির উপর আন্তরিক গবেষণাও উপেক্ষিত যেমন, আকুপাংচার, যোগব্যায়াম, প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'একটি দেশে ব্যতিক্রম ছাড়া, সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান গবেষণা এখনো মূলত বৃহৎ বহুজাতিক

সংস্থা ও তাদের প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের দবারা নিয়ন্ত্রিত। নতুন পণ্য আবিস্কার করে সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা করার জন্য এরা যে উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় করে এসব পদ্ধতির উপর গবেষণা সে তুলনায় নগণ্য। উপরন্তু আধুনিকতার নামে, কি আধুনিক চিকিৎসক কি আধুনিক শিক্ষিত মানুষ—উভয়ের মধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে ঐ সবের প্রতি সংকীর্ণ উন্নাসিকতা।

অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কিছু জনের আন্তরিক সম্ভ্রমের সুযোগ নিয়ে, গাছগাছড়ার বা তথাকথিত আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্রকে আধুনিক মোড়ক আর মুখোশে সাজিয়ে বহু ওষুধ বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এদের উপর আন্তরিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা না করে, অনিশ্চিত, অনুপস্থিত বা সন্দেহজনক কার্যকারিতার অধিকাংশ এসব পদার্থকে শুধু প্রাচীনত্বের ছাড়পত্র দিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে। অজস্র নামে বাজারে চালু নানা টনিক, নার্ভ টনিক, সেক্স টনিক, লিভার টনিক, হজম-গ্যাসের ওষুধ—এর কিছু সহজ উদাহরণ।

আলোচ্য এই বইটি সব ওষুধের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর, জীবনদায়ী, অত্যাবশ্যাক ওষুধের ব্যবহারই যাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটে তারই চেষ্টা করা হয়েছে। একারণে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাও সংযোজিত হয়েছে। চিকিৎসকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সঠিক চিকিৎসার আন্তরিক ও মানবিক প্রচেষ্টা অবশ্যই অত্যাবশ্যাক। অবহেলা ও ত্রুটি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য কিন্তু যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ ও সম্পদ, তার জন্য অবাধ অসুস্থ প্রতিযোগিতা স্বীকৃত ও সম্মানিত, সেখানে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত না হয়ে, চিকিৎসকেরা আলাদা মানসিকতার হবেন তা আশা করা যায় না। যে ব্যবস্থা চিকিৎসকের মানবিক ভূমিকাকে ব্যবসায়িক পর্যায়ে নামিয়ে আনে, চিকিৎসককে করে তোলে এ ব্যবস্থার ক্রীতদাস বা দালাল (শিক্ষক-অধ্যাপক, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী-দেরও), যে ব্যবস্থায় জীবনদায়ী ও প্রয়োজনীয় ওষুধ মানুষ পায় না কিন্তু ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ওষুধের নামে মানুষকে খাইয়ে ব্যবসা করা হয়, এবং সব মিলিয়ে জনগণের স্বাস্থ্যব্যবস্থাই হয় বিপর্যস্ত—এ বই সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি সামান্য উদ্যোগ।

এ উদ্যোগ আরো অনেকেই ও যোগ্যতর আরো কিছুজনও নিয়েছেন বা নিচ্ছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌স্‌দের সংগঠন 'ফেডারেশন অব্‌ মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভস এ্যাসোসিয়েশান অব্‌ ইণ্ডিয়া' (FMRAI) ভারতে আস্তানাগাড়া বহুজাতিক কিছু ওষুধ কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন নানা দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে। এই আন্দোলনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছিল ওষুধকে কেন্দ্র করে এদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও প্রতারণার দিকগুলিও। এর ফলে আন্দোলনরত মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌স্‌দের অনেকের চাকরী যায়, নানা ধরনের দমন-নিপীড়ন চলে—অবশ্যই বিদেশী কোম্পানিগুলি একাজ করে

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ্স্‌দের মাতৃভূমির আইনকানুনকে কাজে লাগিয়েই। পরবর্তীকালে সচেতন কিছু জনের উদ্যোগে ঔষধ-কেন্দ্রিক শোষণ-প্রতারণার দিকগুলিকে নিয়ে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে অন্যান্য সংগঠনও। যেমন বর্তমানে, অল ইণ্ডিয়া ড্রাগ এ্যাকশান নেটওয়ার্ক [C/O Dr. Mira Shiva, 40, Industrial Area (Near Qutub Hotel) N. Delhi-17], পশ্চিমবঙ্গে ড্রাগ এ্যাকশান ফোরাম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। শেষোক্ত সংস্থা মূল্যবান একটি পত্রিকাও প্রকাশ করছেন (Drug-Disease-Doctor; C/O Dr. Pijush Sarcar, P-254, Block B, Lake Town, Cal-89)। এছাড়া উৎস মানুষ (BD494, Salt Lake, Cal-64)-এর মত বেশ কিছু পত্রিকা, 'আজকাল'-এর মত দু'একটি সংবাদপত্র এবং নানা সংগঠনও এ আন্দোলনে নানা ভাবে শরিক হন। বাংলাদেশে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ ও কিছু সাফল্যের কথাও অনেকে জানেন। এই বইটি তৈরী করার ক্ষেত্রে এঁদের নৈতিক উৎসাহের পাশাপাশি, এঁদের প্রকাশিত নানা তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রকাশক-বন্ধু শ্রীশংকর মণ্ডল এবং ঘনিষ্ঠতম সহকর্মিনী ডাঃ আরতি সাহু (চট্টোপাধ্যায়)-এর কাছেও। এবং ছাপাখানার কর্মীবন্ধুদের কাছে যাঁরা এতভাবে আমাকে সাহায্য ও ক্ষমা করেছেন যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কৃতজ্ঞ থাকব সেইসব বন্ধুর কাছে যাঁরা বইটির নানা ত্রুটি, অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতাগুলি দেখিয়ে দেবেন।

সবশেষে এটা বলা দরকার যাঁরা ওষুধ খান, রোগে ভোগেন, দৈনন্দিন নানা সমস্যার মধ্যে চিকিৎসার সমস্যাও যাঁদের কাছে প্রকট, তাঁরা এ বইটি থেকে কিছুটা উপকৃত ও সচেতন হলে এ বইটির সার্থকতা। কিন্তু ড্রাগ এ্যাকশান ফোরাম-এর বা এ ধরনের আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হয়ে, ওষুধ কোম্পানিগুলি এবং তাদের, তথা এ ব্যবস্থার মুখপত্র হিসেবে কিছু চিকিৎসক, ওষুধ দোকানের মালিক, কিছু সবজান্তা ব্যক্তি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। গণমুখী এ আন্দোলন, এ আন্দোলন যাঁরা করছেন তাঁদের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার—এ সবের জনস্বার্থবাহী উদ্দেশ্য থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে নানা কৌশলে। এ ধরনের কিছু অপপ্রচার হচ্ছে এরকম—যারা ভাল প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করতে পারে নি ঐ ধরনের কিছু ডাক্তার এসব করছে, যে সব ওষুধ কোম্পানি কিছু ডাক্তারকে ভাল উপহার (ঘুষ!) দেয় নি তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছে, পেছনে দলীয় রাজনীতি কলকাঠি নাড়ছে, দেশী কোম্পানির ব্যবসা মার খাওয়ানোর জন্য বিদেশী কোম্পানির সূক্ষ্ম কৌশল এসব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ওষুধ ও চিকিৎসার বদলে প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি চালু করার চেষ্টা এগুলি এবং এতে নাকি সরকারেরও সায় আছে, ইত্যাদি। হীন ও মিথ্যা এসব অপপ্রচারের জবাব ব্যাপক মানুষই দেবেন।

আর এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা তো অনস্বীকার্য। জানা গেছে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু ওষুধনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও সংগঠনের সাথে আলোচনা করছেন। আমরা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে থাকব। তবে মূল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে, বরং আরো শক্তিশালী করে, পালিশ করা কিছু পরিবর্তন আসলে কতটুকু করতে পারে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। রোগ যদি হতেই থাকে, ওষুধের সরবরাহ যদি না-ই থাকে, তবে ওষুধ নীতির কাগজগুলি চিবিয়ে খেয়ে জনস্বাস্থ্য সমস্যা কমবে না। তবু প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপ ও আপাতত কিছু সুবিধার জন্যও এ ধরনের কাজ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যসরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের এক্তিয়ার ও ক্ষমতার মধ্যে তাঁরাও বেশ কিছু করতে পারেন। গর্ভাবস্থা নিরূপণের (?) জন্য হরমোনযুক্ত ওষুধের উপর কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রক ১৯৮২ সালে নিষেধাজ্ঞা জারী করার পরও অর্গানন (ইনফার ইণ্ডিয়া) নামক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিকে পশ্চিমবঙ্গে এ ওষুধ তৈরীর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা, নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর ওষুধ সম্পর্কে চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা, সরকারী হাসপাতাল থেকে এগুলি তুলে নিয়ে নিরাপদ কার্যকরী ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, ঔষধ উৎপাদনকে ন্যূনতম মুনাফা ভিত্তিক করা ও দেশীয় নিয়ন্ত্রণে আনা ইত্যাদির মত দু'একটি প্রাথমিক কাজ কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে করতে পারেন। পাশাপাশি পূর্বোল্লেখিত যে সব চিকিৎসাপদ্ধতিতে ওষুধ তথা পণ্যের ব্যবহার ন্যূনতম, সেগুলির উপর ব্যাপক গবেষণার উদ্যোগ দেওয়া দরকার। দেশের প্রতি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি ও তার সাথে সংযুক্ত করে এদের নিরাপদ ও কার্যকরী দিকগুলির ব্যাপক প্রয়োগ করা দরকার।

এগিয়ে আসার দায়িত্ব রয়েছে চিকিৎসকদেরও। মানবিক ব্যবহার ও আন্তরিক চিকিৎসার প্রচেষ্টার পাশাপাশি অন্তত প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবসা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজ তাঁরা অনায়াসেই করতে পারেন। মানুষের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে নানা কৌশলে মাত্রাছাড়া অর্থোপার্জনের লোভকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। গভীর বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে আসা রোগী যদি অনুভব করেন কিভাবে চিকিৎসকরাও এই ব্যবস্থারই শিকার, তবে তার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

এ সব ক্ষেত্রে বইটি সামান্য কিছু ভূমিকা রাখতে পারলেও তার সার্থকতা।

১লা মে, ১৯৮৬

ভবানী প্রসাদ সাহু

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কিছু উল্লেখযোগ্য সংযোজন ও পরিমার্জন সহ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। শারীরিক নানা জটিলতা সৃষ্টির পেছনে বিভিন্ন ওষুধের ভূমিকা সম্পর্কে সংযোজিত হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিচ্ছেদ। এছাড়া হাথী কমিটি (১৯৭৫) ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাও সংযোজিত হল। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে 'জাতীয় ওষুধ নীতি' এবং ড্রাগ প্রাইস কণ্ট্রোল অর্ডার প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে এ দিকগুলিও কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে। ওষুধের সুষ্ঠু ব্যবহার জানা এবং ওষুধ তথা চিকিৎসাকে কেন্দ্র করেও শোষণ ও প্রতারণার ব্যাপারে অন্তত কিছুজনকে সচেতন করার ক্ষেত্রে বইটির ভূমিকা সামান্য হলেও, আদৌ নিরাশাব্যঞ্জক নয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শোনা গেছে, নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে কিছু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এ বইটিকে সামনে রেখে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে রোগীদের বিভ্রান্ত করছেন। এটি বন্ধ হওয়া দরকার। বর্তমান শোষণজীবী ব্যবস্থায় কিভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান শোষণ ও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখা বইটির অন্যতম লক্ষ্য—আধুনিক ওষুধপত্রকে পরিহার করা নয়। আশাকরি সুস্থ মানসিকতায় সকলে এ ব্যাপারটি অনুধাবন করবেন ও সহযোগিতা করবেন।

১লা জুন, ১৯৮৮ ভবানীপ্রসাদ সাহু

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরীর ভাল করার হরেক দাওয়াই—কিছু মিথ্যাচার, প্রতারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস

নানা রোগের চিকিৎসায় ওষুধের ভূমিকা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। বহু হাজার বছর ধরেই মানুষ তার চারপাশের গাছপালা, জীবজন্তুর শরীরজাত নানা পদার্থ বা মাটি-পাথর তথা রাসায়নিক নানা পদার্থের ব্যবহার করেছে তার নানা কষ্ট লাঘবের আশায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার অভাবে এগুলির অনেকগুলিই ছিল ভ্রান্ত বা ক্ষতিকর ও অকার্যকরী। সাথে মিশে ছিল নানা কুসংস্কার, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ-মাদুলি, দেব-দেবীর পূজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি। প্রাচীনকালে রোগের বিরুদ্ধে নানাবিধ যে সব পদার্থের তথা 'ওষুধের' ব্যবহার হত তাদের অনেকগুলিই আবার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে কার্যকারিতা অর্জন করেছিল, যার অনেক কিছুই আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত ও উন্নত করা সম্ভব হয়েছে বা এখনো করা হচ্ছে—অবশ্য এর বেশীর ভাগ অংশই এখনো অবহেলিত।

এক সময় ভারতবর্ষে নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ গড়ে উঠেছিল। আত্রেয় (প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষক। চরক (২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি) ছিলেন রাজা কণিষ্কের চিকিৎসক—তিনি চিকিৎসাবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' সম্পাদনা করেন। বারাণসীর সুশ্রুত অস্ত্রোপচার ও নানা চিকিৎসাপদ্ধতির বিকাশ ঘটান। আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'সুশ্রুত সংহিতা' সংকলিত হয়। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা যে বিপুলভাবে বিকাশলাভ করেছিল তা সন্দেহাতীত। কিন্তু স্বর্ণযুগ ছিল মোটামুটি ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ অব্দি।[১]

অবশ্য এ সময়ের অনেক আগে বৈদিক যুগ থেকেই এদেশে চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যা ঘৃণিত ব্যাপার ছিল ("Brahminical contempt for medicine")।[২] চরক ছিলেন অম্বাপালিকা নামে এক বারাঙ্গনার পরিত্যক্ত ও পরে রাজপুত্র অভয়ের পালিত পুত্র। উচ্চবংশীয় কেউ চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করত না। তবু মূলত অজ্ঞতার ও ভ্রান্তবিশ্বাসের কারণে অথর্ববেদে চিকিৎসার নামে যে মন্ত্রতন্ত্র পূজা-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি হাস্যকর ব্যাপার স্যাপার ছিল (magico religious therapeutics) বুদ্ধের আবির্ভাবের (৫৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পূর্বেই তা বাস্তব, যুক্তি সম্মত ভিত্তি অর্জন করে। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার পুরো সমাজেরই গণ-বিরোধী ভাববাদী চিন্তার প্রসার ঘটে বা সচেতনভাবে ঘটান হয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। অসুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদির পেছনেও কর্মফল ও বৈদিক-আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণাকে সম্পৃক্ত করে

মিলিয়ে দেওয়া হয়। শাসকশ্রেণী তার নিজের শাসন-শোষণের স্বার্থে এধরনের সুবিধাজনক তত্ত্বকে কৌশলে ব্যাপক মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে থাকে, কখনো বা প্রাচীন ঐতিহ্যের নাম করে অথবা বিদেশী সংস্কৃতির থেকে দেশজ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র প্রচার করার জন্য।* তবে এটিও ঠিকই যে, নানা বৈদেশিক আক্রমণে ও বিশেষত মোগল আমলে সরকারী আনুকূল্যের অভাবে ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হতমান হয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসনে ব্যাপারটি চূড়ান্ত রূপ পায়। ব্যবসায়িক তথা শাসন-শোষণের স্বার্থে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা তথা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাপদ্ধতিও এ দেশের উপর চাপিয়ে দেয়। নিজস্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত জ্ঞানের প্রয়োগ, বিকাশ ও গবেষণার পরিবর্তে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আরোপিত হয়।

তবে অর্থনৈতিক বিকাশ, শিল্প বিপ্লব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদির ফলে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ইয়োরোপেই। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়মে, সমাজ প্রগতির অনিবার্যতায় পুঁজিবাদের গর্ভে এর জন্ম। তাই তথাকথিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি বা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে তার পুঁজিবাদী চরিত্রও প্রকট। আমাদের দেশেও সেই ধারা চলছে।

প্রাচীন রোমে সেলসাস (২৫ খ্রী: পূ:—৫০খ্রী:), গ্যালেন (১৩০—২০৫খ্রী:) প্রমুখ মনীষীরা পরীক্ষামূলক চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপে শুরু হল অন্ধকারময় যুগ। ৫০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যযুগ ছিল এই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্যদিকে এসময় আরবদেশ চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশ ঘটিয়ে নিজস্ব ইউনানি পদ্ধতির সৃষ্টি ঘটায়।

অন্ধকারময় মধ্যযুগের অবসানে পাশ্চাত্যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হল। উদীয়মান পুঁজির আনুকূল্যে ও স্বার্থে নানা গবেষণা যেমন আরম্ভ হয়, তেমনি এধরনের কাজের সামগ্রিক পরিবেশও তৈরী হল। প্যারাসেলসাস (১৪৯০-১৫৪১) প্রকাশ্যে গ্যালেন-এর প্রাচীন চিন্তাভাবনাকে পুড়িয়ে ফেললেন, চিকিৎসাবিদ্যা থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে এর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন। ফ্রাকাস্টোরিয়াস (১৪৮৩—১৫৫৩) মহামারীর

---

* শুধু ভারতবর্ষেই নয়, প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সর্বত্রই রাজা-পুরোহিত-শাসকশ্রেণীর স্বার্থে বা তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে অন্যান্য পেশার মত চিকিৎসাবিদ্যাকেও কাজে লাগান হয়েছে। সাথে ছিল নানা আধ্যাত্মিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা। ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া, মিশর—কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। (History of Science, Sarton, 1964) শাসকশ্রেণীর রোষ থেকে বাঁচার জন্য, চিকিৎসক তথা বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিরা তাঁদের লিখিত বর্ণনায় ভাববাদী কথাবার্তার আড়ালে বস্তুবাদী, পর্যবেক্ষণভিত্তিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। একই ভাবে চার্বাক তথা বস্তুবাদী দর্শনকেও হতমান করা হয়।

স্বরূপ নির্ধারণ করলেন। ভ্যাসালিয়াস (১৫১৪—১৫৬৪) মড়া কেটে শারীরবিদ্যার বিকাশ ঘটালেন। এ্যামব্রইজ পেয়ার (১৫১৭—১৫৯০) আধুনিক অস্ত্রোপচারের নানা পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। ১৫৪০ সালে ইংল্যাণ্ডে নাপিত শল্যবিদদের সংযুক্ত সংস্থা (The United Company of Barber Surgeons) প্রতিষ্ঠিত হল। (এটিই পরে "দি রয়েল কলেজ অব্ সার্জেনস" নাম পায়। ভারতের মত পাশ্চাত্যেও যে একসময় চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল তা এ থেকে বোঝা যায়।) আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে চলল। ১৬২৮ সালে হার্ভে রক্তসংবহন তন্ত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করলেন, ১৬৭০-এ লীউয়েনহক (Leewenhoek) অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, ১৮১৯-এ লিনেক আবিষ্কার করলেন স্টেথোস্কোপ। জেনার-এর টীকা দেওয়ার পদ্ধতি (১৭৯৬), ক্লড বার্ণার্ড-এর পরীক্ষামূলক চিকিৎসাবিদ্যা (১৮৬৫), পাস্তুর-এর জলাতংক টীকা (১৮৮৫), রবার্ট কক-এর জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণা (১৮৮২) ইত্যাদি যুগান্তকারী অজস্র ঘটনা রোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে বলিষ্ঠ হাতিয়ার যুগিয়ে চলল।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক সব কাজকর্ম যে নিরন্তর ঘটে চলা অসংখ্য জৈব রাসায়নিক কাজের ফল তা বোঝা গেল। নানা রোগে এই জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার অস্বাভাবিকত্বকে স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টায় বাইরের একটি রাসায়নিক পদার্থকে যোগান দেওয়াটা বিজ্ঞান সম্মত বলে প্রতিষ্ঠিত হল। আবিস্কৃত হতে থাকল এই ধরনের নানা রাসায়নিক পদার্থ তথা ওষুধ। ভারতের আয়ুর্বেদ, যোগব্যায়াম, চীনের আকুপাংচার, ছিকুং ইত্যাদি নানা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির মূল কথা ছিল শরীরের অভ্যন্তরীণ নানা রোগ শরীরেরই নিজস্ব প্রক্রিয়ার অস্বাভাবিকত্বে ঘটে এবং শরীরেরই নিজস্ব কার্যপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তার মোকাবিলা করা। সুস্থ খাদ্যভ্যাস, শারীরিক শ্রম, সুসংবদ্ধ জীবন যাপনের উপর মূল জোর দেওয়া হত। বিশেষতঃ প্রাকৃতিক চিকিৎসা, আকুপাংচার, ছিকুং, যোগব্যায়াম-এর মত চিকিৎসাপদ্ধতিতে বাইরের কোন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে নয়— শরীরেরই নিজস্ব ক্ষমতার সাহায্যে রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টা স্পষ্ট।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য হচ্ছে প্রধান বিচার্য ও সমাজের চালিকা শক্তি। তাই এ ব্যবস্থায় এই পণ্য তথা ওষুধের ব্যবহার বিপুল গুরুত্ব পেল, সৃষ্টি হল তার বাজার,—একদিকে ক্রমবর্ধমান মুনাফার জন্য (যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত) ওষুধ ব্যবসা, অন্যদিকে তার বাজার তথা অসুস্থ মানুষ। চিকিৎসক এক দিকে যেমন রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন, অন্যদিকে হয়ে উঠলেন ওষুধ ব্যবসায়ী ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগে চিকিৎসকদের এ ভূমিকা ছিল না। প্রকৃতিজাত

গাছ-গাছড়া ইত্যাদি থেকে নিজেরাই ওষুধ বানিয়ে কবিরাজরা যেমন রোগীদের দিতেন, তেমনি সামান্য কয়েকটি সূচ নিয়ে চীনের আকুপাংচার চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করে যেতেন। আর শুধু ভারত নয়—চীনসহ সমস্ত দেশেই প্রকৃতিজাত গাছপালা প্রাণীজ জিনিষ পত্রেরই ব্যবহার করতেন চিকিৎসকরা। ইয়োরোপের শিল্প বিপ্লব এ অবস্থাকে পাল্টে দিল। সারা পৃথিবী জুড়ে—শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই—পণ্য আর পুঁজিই হয়ে উঠল প্রধান নিয়ন্ত্রক। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম হল না। এর অন্যতম ফসল হল ওষুধ। পুরনো কুসংস্কারের পাশাপাশি বা পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার নিজের স্বার্থে, ব্যাপক প্রচারের জোরে, নিত্যনতুন চাহিদা, 'বিজ্ঞান সম্মত' সংস্কার ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে পণ্য বিক্রির জন্য। ওষুধের ব্যবহার ও ওষুধ তথা আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে পুরনো সব বিশ্বাসই যেমন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়, তেমনি এরও অর্থ অবশ্যই এ-নয় যে, ওষুধ মাত্রেই মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় বা শুধুমাত্র মুনাফা লোটারই মাধ্যম। পুঁজিবাদ যেমন মানব সমাজের উত্তরণের তথা প্রগতির একটি ধাপ, ওষুধপত্রও তেমনি চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু পাশাপাশি এটিও ঠিক যে, —পুঁজিবাদ যেমন নিজ অস্তিত্বের স্বার্থে যেন তেন প্রকারেণ, ব্যাপক মানুষের জীবন ও স্বার্থকে পদদলিত করে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবসা করতে চায়, ওষুধের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। আকাশছোঁয়া লাভের আশায় অল্প কিছুদিনের অভিজ্ঞতা বা গবেষণাকেই চূড়ান্ত ধরে তড়িঘড়ি অনেক ওষুধ ছাড়া হয়েছে বাজারে, ফলে অজস্র যে সব ওষুধকে আগে (বা এখনো) নিরাপদ ভাবা হত (বা এখনো হয়) তারা একসময় শারীরিক নানা ভয়াবহ দুরবস্থা, দুরারোগ্য রোগ বা ব্যাপক মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাতিল বা নিষিদ্ধ হয়েছে (বা এক সময় হতে পারে)। প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি শতশত বছরের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ায় এবং প্রায়শঃই সেগুলি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত রাসায়নিক পদার্থের উপরই মূল গুরুত্ব আরোপ না করায়—তাদের নিরাপত্তা ছিল—চূড়ান্ত না হলেও, অনেক বেশী। তাদের কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু একই সাথে ছিল তার মূল নীতিকে গ্রহণ করে গবেষণার সুযোগ। কিন্তু এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিপন্থী।

ফল স্বরূপ বহু শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত চিকিৎসাপদ্ধতির গবেষণা না হয়ে, তাদের ভুল দিকগুলিকে বাতিল করে কার্যকরী দিকগুলির সাথে আধুনিক জ্ঞানের মিলন না ঘটিয়ে, গড়ে উঠল মুনাফা ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা—কি ওষুধে, কি চিকিৎসাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতে, কি চিকিৎসক-শল্যবিদদের মানসিকতায়। আধুনিক ওষুধের ক্ষেত্রে আগেই বলা হয়েছে, ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে এদের ক্ষতিকর দিকগুলি। কিছু ওষুধ যেমন প্রাণদায়ী ও অত্যাবশ্যক তেমনি

বিপুল সংখ্যক 'ওষুধ' রয়েছে যেগুলি চূড়ান্ত ক্ষতিকর। চিকিৎসার নামে সেগুলি এই কিছুদিন আগেও পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করেছে, কিন্তু বর্তমানে নানা দেশে আইনতঃ নিষিদ্ধ। তবু বহু ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এখনো কোটি কোটি মানুষ ব্যবহার করে চলেছে। আর তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, প্রয়োজনীয় কোন ওষুধও ভুলভাবে, যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হলে বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমাদের স্বাধীন দেশে কত মানুষ ওষুধ বা চিকিৎসার কারণে ভিন্নতর রোগে আক্রান্ত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান চোখে পড়েনি। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৬২ সালে সেখানে ১৪ জন মারা গেছে রক্ত জমাট বাঁধার ওষুধ ব্যবহার করে, ৩৩ জন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেয়ে, ১২ জন ক্লোরামফিনিকলের জন্য, ১০ জন ব্যাথা কমানোর জন্য ফিনাইল বুটাজোন ওষুধ খেয়ে, ১০ জন এ্যাস্পিরিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে। এছাড়া ইনসুলিন, লিগনোকেইন, পেনিসিলিন, ফেনোবার্বিটোন, ফেনিটয়েন, এড্রেনালিন, প্যারালডিহাইড, কিছু ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি নানা ওষুধ থেকে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।[৩] না, এসব ওষুধের বেশী ডোজ বা আত্মহত্যার জন্য কেউ খায় নি। নিছক ওষুধের কারণেই এই মৃত্যু। আর শুধু মৃত্যু নয়, ওষুধের কারণে ভিন্নতর রোগ, দুরারোগ্য নানা অবস্থারও সৃষ্টি হয়। ইংল্যাণ্ডেরই (যুক্তরাজ্য ; United Kingdom) আরো নানা সমীক্ষায় একই ধরনের ছবি ফুটে উঠেছে। এখানে সম্প্রতি একবার প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের ধর্মঘটের দরুণ হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসার ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছিল। দেখা গেছে, "এ সময় মৃত্যু হারও শতকরা তিনভাগ কমে গিয়েছিল। ইটালি ও ইজরায়েলেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে।.....ওষুধের প্রতি রোগীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিরোধ জন্মে। ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোগের চেয়েও খারাপ হতে পারে, এটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ওয়াকিবহাল মহল দেখেছেন, ডাক্তার দেখায় যে তিনজন রোগী, তাদের একজনও হাসপাতালে ভর্তি হয়যেপাঁচজন,তাদের একজনের অসুস্থতাটি ওষুধ বা চিকিৎসকের দবারাই তৈরী। এটি ঘটনা যে, সাধারণ মানুষ, প্রচার মাধ্যম ও ডাক্তারী পেশার লোকদের দবারা পাশ্চাত্য ওষুধগুলি (Western medicine) বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মানুষকে যতটা বোঝানো হয় এগুলি ততটা সফলও নয়। পাশ্চাত্যদেশে চিকিৎসার খরচ ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাজ্যে চিকিৎসাখাতে খরচ হয়েছিল ৪৩.৭ কোটি পাউণ্ড, মোট জাতীয় আয়ের ৩.৯২% এবং মাথাপিছু ৯ পাউণ্ড। ১৯৭৮-এ এ খরচ ৮,০০০ কোটি পাউণ্ড, মোট জাতীয় আয়ের ৫.৭১% এবং মাথাপিছু ১৪১ পাউণ্ড। প্রকৃত অর্থে ৩০ বছরে ৬৫০% বৃদ্ধি। এই বিপুল খরচের জন্য বিশেষ কিছু হয়ে থাকলেও তা সান্ত্বনার ব্যাপার হত। কিন্তু জন্মের সময় হিসেব করে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বেড়েছে ৩ বছর আর ৪৫ বছর বয়সের সময় হিসেব করলে তা মাত্র দেড় বছর। এই বৃদ্ধির

অনেকটা আবার উন্নত জীবনযাপন প্রণালীর জন্যও বটে।... উন্নতিশীল দেশগুলির স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দের ৫০% যায় পশ্চিমী ওষুধগুলির জন্য। আবার পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী লোক স্বাস্থ্যের উপযুক্ত যত্ন পায় না।"[৪]

এই ভয়াবহ অবস্থার পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, কিছু ঝুঁকি নিতেই হয়। "চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয় যে কারণেই হোক না কেন চিকিৎসার প্রতিটি পদ্ধতিই ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু সম্ভাব্য ক্ষতির কথা ভেবে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন একেবারেই না করলে কোন রোগীকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুযোগও দেওয়া যাবে না।"[৫] তবু ব্যবসায়িক কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর আর ব্যয়বহুল চিকিৎসা অবশ্যই কাম্য নয়।

যে সব ওষুধ ক্ষতিকর বলে প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে জেনেশুনেও চালু রাখা, চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে ও ক্ষতির সম্ভাবনাকে চেপে গিয়ে ওষুধ ব্যবসা চালান, ইত্যাদিও অমানবিক। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক একটি খবর এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৪২টি ওষুধ নিষিদ্ধ। এর মধ্যে ২০টি ভারতেও নিষিদ্ধ, আজ রাজ্যসভায় একথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোযানা। নিষিদ্ধ ওষুধের মধ্যে আবার নোভালজিন ও ব্যারালগান এখনো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী এদুটি ওষুধকে বাজারে এখনো চালু রাখা হয়েছে বলে রাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন জানান।"[৬] অর্থাৎ নানা দেশে যে ৪২টি ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ হয়েছে তার বাকী ২২টি আমাদের দেশের মানুষকে আইন করেই খাওয়ান হচ্ছে। আবার আইন করেই নিষিদ্ধ করা নোভালজিন-ব্যারালগানও দেশের মানুষকে কিনতে ও খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই আমাদের ব্যবস্থা। কিন্তু এটি কার স্বার্থে? সাধারণ মানুষের জীবনের স্বার্থে নিশ্চয়ই নয়।

আর এই ক্ষতিকর ওষুধের পাশাপাশি কিছু ওষুধ বা জিনিসপত্রের ব্যবহারও চলে যা অপ্রয়োজনীয় —মানসিক শক্তি দেওয়া ও অনর্থক পয়সা খরচ করে ব্যবসায়ীদের পকেট ভারী করা ছাড়া এদের অন্য ভূমিকা নেই। শরীরকে সুস্থ, সুন্দর করে তোলার আশায় অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর এ-ধরনের যে অজস্র জিনিস বা ওষুধ আমরা ব্যবহার করি তার কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হল, যাতে আমরা অন্ততঃ সচেতন ও সাবধান হতে পারি, বুঝতে পারি এ ব্যবস্থা কিভাবে আমাদের প্রতারিত করছে। এগুলি পড়ে তবু বাস্তবে কেউ কেউ বলবেন, এ ধরনের বা আরো নানা ক্ষতিকর—এ দেশে বা বিদেশে নিষিদ্ধ—ওষুধ বা উল্লেখিত অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি তো আমরা কিছু খেয়েছি, ব্যবহার করেছি, কই কোন বিপদ তো হয় নি, বরং ব্যাথা কমেছে, কষ্টের লাঘব হয়েছে, কিছু উপকার পেয়েছি! আপাতভাবে কথাটা সত্যি।

একই ভাবে কোন সাধুবাবার ছাই ইত্যাদি খেয়ে, ঠাকুরের থানে হত্যা দিয়ে বা

মানত করে বা এই ধরনের হাবিজাবির ফলেও অনেকে উপকার পান বলে মনে করেন। এধরনের ঘটনা সত্যিই ঘটলে পেছনে থাকে মানসিক কিছু ব্যাপার বা কাকতালীয় কিছু ঘটনা। প্রয়োজনীয় ওষুধ হোক বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধই হোক অনেকের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যাপার জড়িত থাকে। তবে অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলির ক্ষেত্রে এই মানসিক ব্যাপারটা থাকে খুবই প্রকট ও প্রবল। আর বিশেষ ক্ষেত্রে ওষুধের বাস্তব রাসায়নিক ক্রিয়ায় কষ্টেরও লাঘব হয়। তবে যেসব ক্ষতির কারণে যে সব ওষুধগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেসব ওষুধের ঐ সব ক্ষতি সবার ক্ষেত্রেই প্রকট হয় না। তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ওষুধের তুলনায় এই প্রকট হওয়ার হার এদের মধ্যে অনেক বেশী—তাই এগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়, বিশেষতঃ যখন তুলনামূলকভাবে বিকল্প নিরাপদ ওষুধ জানা থাকে ও পাওয়া যায়। এছাড়া বিশেষ উন্নততর কার্যকারিতা ছাড়া নিছক ব্যবসার কারণে বেশী দামের জন্যও ওষুধ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার দরকার হয়, যখন কম দামের কিছু একইভাবে কার্যকরী ওষুধ জানা থাকে ও পাওয়া যায়।

সবমিলিয়ে কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে নানা বিপদের ঘটনা অনেকের মধ্যে ঘটেছে বলেই সেগুলিকে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আর ঐ ধরনের ওষুধ খেয়ে শারীরিক যে ক্ষতি হয় কোন কোন ক্ষেত্রে তা তীব্র ও তাৎক্ষণিক হলেই তার পেছনে ওষুধটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় যেমন সারিডন, এ্যাসপ্রো ইত্যাদি খেয়ে রক্ত বমি, কালো পায়খানা, আলসারের তীব্র ব্যথা ইত্যাদি হলে। কিন্তু প্রায়শঃই যা হয় দু'চারটি ট্যাবলেট বা অল্প মাত্রার ক্ষতিকর ওষুধ খেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না হয়ে ধীরগতির যে ক্ষতি হয় তার লক্ষণ হয় মৃদু বা অনেক দিন পরে ধরা পড়ে, তখন আর ঐ বিশেষ ওষুধকে ঐ সব কষ্টের জন্য দায়ী করা হয় না। এব্যাপারটি আরো বিপজ্জনক। হজমের দীর্ঘ স্থায়ী গণ্ডগোল, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ, হতাশাবোধ, লিভার, কিডনি ইত্যাদির রোগ—নানা ধরনের শারীরিক অস্বাভাবিকত্বের পেছনে নানাবিধ ওষুধেরক্ষতিকর ভূমিকাও থাকে, কিন্তু আসামী সনাক্ত করার উপায় হয়তো তখন আর থাকে না।

---

(১) TextBookofPreventive&SocialMedicine,Park&Park(1983)(PSM)
(২) Science & Society in Ancient India, Debi Prasad Chattopadhyay
(৩) ClinialPharmacology;D.R.Laurence&S.Bennett,1983.(Laurence)
(৪) British Journal of Acupuncture; Vol 2, No. 1, 1978
(৫) Harrison's Principle of Internal Medicine, 1983 (Harrison)
(৬) আজকাল; ৯. ৫. ৮৫.

(১)
ব্যথা কমানর ওষুধ—সারিডন, অ্যানাসিন, অ্যাসপ্রো, অ্যানালজিন ইত্যাদি

'মাথা ধরেছে ? সারিডন, অ্যানাসিন বা অ্যাসপ্রো খান।' বিখ্যাত কিছু লোকের বা সুন্দরী গৃহবধূর ছবি দিয়ে এধরনের বিজ্ঞাপন হামেশাই দেখা যায়। অ্যানাসিন খাওয়ার আগে কাতর মুখের ছবি আর অ্যানাসিন খাওয়ার পর হাসিমুখ দেখে দেখে, মাথায় বা গায়ে হাতে-পায়ে ব্যথা হলে ওষুধ দোকানে গিয়ে সারিডন-অ্যানাসিন-অ্যাসপ্রো কিনে খাওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে।

অ্যানাসিন বা অ্যাসপ্রো — মাথার বা গায়ে-হাতের ব্যথা সত্যিই কমায়। এর রাসায়নিক নাম অ্যাসিটাইল স্যালিসিলিক এ্যাসিড বা স্যালিসিলেট, জেনেরিক নাম অ্যাসপিরিন। মাইক্রোপাইরিন ও মাইক্রোপাইরিন-সি দুটি বহু পরিচিত ওষুধ যেগুলিতে অ্যাসপিরিন রয়েছে — অযৌক্তিকভাবে যথাক্রমে ক্যাফিন ও ভিটামিন-সি -এর সাথে মিশিয়ে। ব্যাথা কমানর ওষুধ (analgesic) হিসেবে অ্যাসপিরিনের কার্যকারিতা স্বীকৃত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় অ্যাসিটাইল স্যালিসিলিক এ্যাসিড অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে এর যথেচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে, খেয়ালখুশিমত ব্যবহারে, কারণ শরীরের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অজস্র তো বটেই, কখনো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। অন্য আরো নানা ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধের মত, আমাদের মত দেশে, এই সব ভয়াবহ অবস্থার কারণ যে অ্যানাসিন-অ্যাসপ্রো জাতীয় ওষুধ তা কিন্তু প্রায়শঃই ধরা পড়ে না। নিশ্চিন্তে ব্যবসা চালায় কোম্পানিগুলি। সাধারণ ক্রেতাদের সামনে, বাহারী বিজ্ঞাপনে, এইসব বিপদের সম্ভাবনার কথা তারা কিন্তু বলে না।

যেমন এ জাতীয় ওষুধ পাকস্থলীর তথা পরিপাকতন্ত্রের ভেতরের আবরণীকে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অ্যাস্পিরিন-এর একটি ছোট্ট দানা এ ধরনের আবরণীতে রাখলে আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গাটি সাদা হয়ে যায় এবং সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। পাকস্থলীর ভেতরেও এইভাবে ক্ষত হয়ে রক্তপাত হয়। এ ধরনের ওষুধ খেলে শতকরা ৫০-৭০ জনের ক্ষেত্রেই পাকস্থলীর রক্তপাত ঘটে বলে দেখা গেছে ; এই রক্ত পায়খানার সাথে বেরোয়, কারোর কারোর ক্ষেত্রে রক্তপাতের পরিমাণ প্রচণ্ড বেশী হয়, কারোর ক্ষেত্রে এধরনের ওষুধ খাওয়াই রক্তহীনতার কারণ হয়, কারোর বা স্থায়ী পেপটিক আলসার সৃষ্টি হয়। যাঁরা ব্যথার জন্য নিয়মিত এ্যাসপ্রো ইত্যাদি খান তাঁদের ক্ষেত্রে এই ধরনের রক্তহীনতার চিকিৎসার জন্য হয়তো দেওয়া হতে থাকল আয়রন টনিক — এটি পাকস্থলীর ক্ষতকে আরো বাড়িয়ে তুলে অবস্থাটা আরো বিপজ্জনক করে তোলে। দেখা গেছে পাকস্থলীর ক্ষত বা

পেপটিক আলসার থেকে প্রচণ্ড রক্তপাত নিয়ে যেসব রোগী ভর্তি হয় তাদের অর্ধেকেরই কারণ এই ধরনের ওষুধ খাওয়া। এ ওষুধ খেয়ে অম্বল, বুকজ্বালা, বমি, ওপর পেটে ব্যাথা ইত্যাদি প্রায়ই হয়। যাঁদের এ ধরনের কষ্ট বা পেটের কোন রোগ আগে থেকেই ছিল, তাঁদের কখনোই অ্যাস্পিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। আর যাঁরা খাবেন তাঁদের অবশ্যই খালি পেটে খাওয়া উচিত নয়, সঙ্গে প্রচুর জল খেতে হবে। কিন্তু এ ধরনের কোন বিপদের সম্ভাবনা, সতর্কতা, কোন নির্দেশই অ্যানাসিন অ্যাসপ্রোর বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করে না। উদ্দেশ্য একটাই—যাতে সাধারণ মানুষ মালটি যথেচ্ছ ব্যবহার করে নিজেদের সর্বনাশ ও কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে পারে। এ সর্বনাশের রাস্তা আরো চওড়া করার জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা আরো বলে "সাধারণ মাথাধরার জন্য" সাধারণ এ্যাসপ্রো আর "ভীষণ মাথাধরার জন্য" "এক্সট্রা স্ট্রেংথ অ্যাসপ্রো ৬০০"।

স্থানীয়ভাবে অভ্যন্তরীণ দেহাবরণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়া এ ধরনের ওষুধ থেকে ভয়াবহ এ্যালার্জিও হয়, যার ফলে হাঁপানি, আমবাত, নাকথেকে জলপড়া, হাতপা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। এসবও প্রায় কখনোই এ ধরনের ওষুধের কারণে হচ্ছে তা ভাবা হয় না। অথচ, "সাধারণ ওষুধের মধ্যে অ্যাসপিরিনই সর্বাধিক হাঁপানি ঘটায় এবং নাকে পলিপ (nasal polypi) রয়েছে এমন মধ্যবয়সী মহিলার মধ্যে এটি ঘটে সবচেয়ে বেশী।" (Laurence) পুরনো আমবাত এ ওষুধ খেলে মাথাচাড়া দিতে পারে। অ্যালার্জি না ঘটিয়েও স্যালিসিলেট শ্বাসকষ্ট ঘটাতে পারে, মস্তিস্কের শ্বাসকেন্দ্রকে সরাসরি উত্তেজিত করে। অতিমাত্রার স্যালিসিলেট রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা কমিয়ে অস্বাভাবিক রক্তপাতের কারণ হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এবং কোন কোন বয়স্কদের ক্ষেত্রেও স্বল্পমাত্রার স্যালিসিলেটই ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে (salicylate poisoning) (বাচ্চাদের ক্ষেত্রে acidosis, বয়স্কদের ক্ষেত্রে alkalosis)।

স্যালিসিলেটের এই বিপদের কথা মাথায় রেখে অতি সম্প্রতি, ১৯৮৬ সালের অগাষ্ট মাসে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ ডিরেকটরেট অব্ ড্রাগ্‌স্ কন্ট্রোল ১২ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য অ্যাসপিরিন বা অন্যান্য স্যালিসিলেট, এককভাবে বা অন্য ওষুধের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের ওষুধের মোড়কের বা বাক্সের গায়ে এধরনের কথাগুলি লেখাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, "চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ১২ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্য নয়।" হ্যাঁ, এ কথাগুলি ইংরেজিতে লেখা থাকে — তবে তা এত ক্ষুদে হরফে যে লেন্‌স্ ছাড়া দেখতে পাওয়া মুস্কিল। আর ইংরেজি লেখা কজনই বা বোঝে! স্থানীয় ভাষায় বড় বড় করে লেখা ও পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিলে এ ধরনের সরকারী উদ্যোগের প্রকৃত সুফল পাওয়া মুস্কিল। এখনো, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, বহু হাতুড়ে বা

ফার্মাসিষ্টরা এবং সাধারণ মানুষও এ্যাসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ (যেমন মেজোরাল) বাচ্চাদের হামেশাই দিয়ে যাচ্ছেন।

সাধারণ মাথা ধরা, গায়ে হাতে ব্যথা—এগুলো কিছু বিশ্রাম নিলেই কমে যায় ; জোর করে তড়ি ঘড়ি যথেচ্ছভাবে অ্যানাসিন, অ্যাসপ্রো জাতীয় দ্রব্য খেলে শারীরিক ক্ষতিই হয় বেশী, যা এদের কারণে হচ্ছে তা প্রায়ই বোঝা যায় না। একইভাবে আরো ভয়াবহ হচ্ছে অ্যানালজিন ও অ্যানালজিন সম্বলিত কিছু ওষুধ।

অ্যানালজিন, নোভালজিন, ব্যারালগান, প্যামাজিন, অ্যানাডেক্স, এসজিপাইরিন, প্রমালজিন, জিমালজিন-এ, আলট্রাজিন, ব্রাল, কোডোলসিক, নিওজিন ইত্যাদি নানা নামে নানা ওষুধ কোম্পানি অ্যানালজিন বাজারে ছাড়ে। এদের মধ্যে কয়েকটি অচিকিৎসক মানুষও জানেন আর গাঁটে-গায়ে-পেটে ব্যথা ইত্যাদিতে নিজেরাই দোকান থেকে কিনে খান। এদের অনেকগুলি শুধু ট্যাবলেট আকারে নয়, ইনজেকশান করেও দেওয়া হয়। এ ধরনের ওষুধের সবচেয়ে বড় বিপদ, কোন কোন ক্ষেত্রে এটি রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমিয়ে দিয়ে রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অ্যানালজিন-এর সমগোত্রীয় রাসায়নিকের অন্য নাম অ্যামাইনোপাইরিন বা অ্যামিডোপাইরিন বা পাইরামিডন (Dimethyl aminoantipyrine)। এ প্রসঙ্গে সিবা-গেইগি কোম্পানির অ্যানালজিন (অ্যামিডোপাইরিন) সম্বলিত ওষুধ সিবালজিন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। "মোজাম্বিকে কর্মরত ফ্যারল গেটস নামে এক ব্রিটিশ শিক্ষক জেইবের এক ওষুধ দোকান থেকে সিবালজিন নামের এই ব্যথাহর ওষুধটি কেনেন। চারদিন খাওয়ার পর তাঁর মাড়িতে যন্ত্রণা- দায়ক সাদা দাগ দেখা দেয়, মুখে ঘা হয়, বমি ও খুব জ্বর হতে থাকে। অবস্থাটি হল অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস, অ্যামিডোপাইরিনের এক জ্ঞাত বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সুইডেন, ব্রিটেন ও আমেরিকায় এ ওষুধটিকে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডসহ বিভিন্ন দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থারা এ ওষুধটিকে বাজার থেকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডেরই ওষুধ কোম্পানি সিবা-গেইগি ১৯৭৭ সালে মোজাম্বিকের রাজধানী মানুটোতে সিবালজিনের স্যাম্পল বিনামুল্যে বিতরণ করে।" (সানডে, ১৯৭৮১) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সিবা-গেইগি এর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার কথা স্বীকার করে ও ১৯৬৩ সালেই বৃটেনের বাজার থেকে একে তুলে নেয়। আমেরিকায় এটি ১৯৩৮ সাল থেকেই নিষিদ্ধ। কিন্তু এই একই কোম্পানি এই একই ওষুধ এই একই নামে আমাদের দেশেও এই কিছুদিন আগেও বিক্রি করত, এখন এরা তা বন্ধ করেছে। কিন্তু অন্য কোম্পানি তা করেনি, পূর্বোক্ত নানা বাজারি নামে তা এখনো চলছে। এই কিছুদিন আগে আমাদের মহান দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা জানিয়েছিলেন

অ্যানালজিন, ব্যারালগান আমাদের দেশে নিষিদ্ধ হলেও কিছু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তা এখনো চালু রাখা হয়েছে। (আজকাল ; ৯.৫.৮৫) সত্যি, কি বিচিত্র এই দেশ!

বাংলাদেশেও অ্যানালজিন যুক্ত সব ওষুধ বাতিল করা হয়েছে। যেমন হেক্সট কোম্পানির নোভালজিন ট্যাবলেট, নোভালজিন-কুইনিন ড্রাগিজ (আমাদের দেশে এই একই কোম্পানির এই একই নামের ওষুধ এখনো চলছে)। বাতিল করার কারণে বলা হয়েছে, "এটা শ্বেত কণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেয়, জ্বর, মাথাব্যথা, মাংসপেশী ও সন্ধিস্থলের ব্যথা এই ওষুধটির খারাপ উপসর্গগুলোর অন্যতম। রক্তের প্লাটেলেটের সংখ্যা কমে যায় বলে অতিরিক্ত রক্তপাত ঘটায়।" একই ভাবে ঐ দেশে বাতিল হয়েছে, ব্যারালজিন (আমাদের দেশের ব্যারালগানের মত)।

১৯৭০ সালেই মন্তব্য করা হয়েছে, ব্রিটেনে এ ধরনের ওষুধ বাস্তবত বাতিল করা হয়েছে (virtual abandonment in Britain)। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায়ও অ্যানালজিন নেই। গায়ে-হাতে-পায়ে মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণা বা জ্বর কমানর জন্য যদি নেহাতই ওষুধ খেতে হয় তবে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ তবু কিছুটা নিরাপদ (ক্রোসিন, ক্যালপল, পাইরেজেসিক, রেলিফ, ম্যালিডেন্স ইত্যাদি নানা নামে তা বাজারে চালু)। কিন্তু এরও কিছু কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যথেচ্ছ বা মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়, খালিপেটে তো নয়ই, সঙ্গে খেতে হবে প্রচুর জল। অন্য মুস্কিল হচ্ছে নামা কোম্পানি আবার চিকিৎসক ও রোগীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য প্যারাসিটামলের সাথে একাধিক পদার্থ মিশিয়ে এবং দাম বাড়িয়ে বাজারে ছাড়ে। যেমন খাণ্ডেলওয়াল কোম্পানির অ্যাভামল (প্যারাসিটামলের সাথে সিসট্রাল, অ্যাভাকান সাবস্ট্যান্স নামে মজার মালকড়ি), উইন-মেডিকেয়ার -এর বেসেরল (ক্লোরমেজানোন যোগ করে), ভিলকোর বিটাফ্লেম ট্যাবলেট (ডেক্সট্রোপ্রপক্সিফেন, অক্সিফেনবিটাজোন, ডায়াজিপাম মিশিয়ে), ইণ্ডোকোর সাইক্লোপ্যাম (সঙ্গে ডাইসাইক্লোমিন, ঘুমের ওষুধ ডায়াজিপাম), মাইক্রোল্যাব-এর ডলোপার (সাথে অ্যানালজিন, ক্যাফিন), উইনমেডিকেয়ার-এর ফর্টাজেসিক (সাথে পেনটাজোসিন), CFL ফার্মার মেটোপার (সঙ্গে মেটোক্লোপ্র্যামাইড) —তালিকা অন্তহীন। ওয়ায়েথ কোম্পানি আবার অ্যাস্পিরিনের সাথে ঘুমের ওষুধ মেপ্রোব্যামেট, এথোহেপটাজিন ইত্যাদি মালকড়ি মিশিয়ে ইকোয়াজেসিক নামে বাজারে ছেড়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের মিশ্রণ দাম বাড়ানো ও বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই না। এরফলে আহামরি উপকার পাওয়া যায় না। এই ধরনের সব মিশ্রণ বাতিল করে বাংলাদেশে মন্তব্য করা হয়েছে "বেদনানাশক ওষুধগুলোর অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ যাতে রোগীর

সুস্পষ্ট উপকার হয় না বরং কিডনিসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে। যেগুলোতে বেদনানাশকের সঙ্গে আয়রন, মিনারেল বা খনিজ পদার্থের অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য মিশ্রণ দেওয়া আছে। মিশ্রণের ফলে যেগুলোর দাম বেড়েছে অন্যায়ভাবে।" বাংলাদেশে হেক্সট-এর ব্যারালজিন এ্যামপুল, এসিয়াটিক ল্যাব-এর স্যালিসিটামল ট্যাবলেট, রেকেট অ্যাণ্ড কোলম্যান-এর ডিসপ্রিন, এ্যালবার্ট ডেভিস-এর স্যালিস্যাইল এমাইড এণ্ড ভিট-সি ইত্যাদি এইভাবেই বাতিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে এ "সব ওষুধে একটি ওষুধি উপাদানের সঙ্গে আরেকটি ওষুধ......অনাবশ্যক অবৈজ্ঞানিকভাবে মেশানো হয়েছে। মিশ্রণের ফলে এসব ওষুধ রোগীর শরীরের বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে এবং অযৌক্তিকভাবে দাম বেড়ে যায়।"

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায়, খবরের কাগজে আরেকটি বহুল বিজ্ঞাপিত সর্বজনবিদিত ব্যথা কমানোর ওষুধ হল সারিডন। বহুজাতিক কোম্পানি রোস্ (Roche) -এর ব্যবসা এটি। যদিও সব ওষুধ দোকানেই পাওয়া যায় তবু সবাই এর নাম জানে বলেই প্রায় কোন ডাক্তার এর প্রেসক্রিপশান করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ ব্যাথা বেদনার জন্য অবাধে সারিডন কিনে খান, তাই এটি পান-বিড়ির দোকানে বা অনেক ভুষিমালের দোকানেও পাওয়া যায় এ্যানাসিন-এ্যাসপ্রোর মত। এই পদার্থটি অযৌক্তিকভাবে একাধিক রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ (fixed dose combination), যা বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে উন্নত বহু দেশে নিষিদ্ধ। এর প্রতি ট্যাবলেট আছে প্যারাসিটামল (২৫০ মি.গ্রা.) এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে,—ব্যাথা কমানোর জন্য নয়, স্নায়ুকে উত্তেজিত করার জন্য, ক্যাফিন (৪৬.৭৫ মি.গ্রা) (এটি চা, কফি থেকে পাওয়া যায়)। এছাড়া আছে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অ্যামিডোইরিন-এ্যানালজিনের সমগোত্রীয় পিরিডিন (Diethyl-dioxo-tetrahydro pyridine, 50 mg.), পাইরাজোলোন(Phenyl-dimethyl-isopropyl pyrazolone ; 150mgm)। এই পাইরাজোলোন গোত্রেরই (pyrazolone derivative) ওষুধ হচ্ছে ভারত সরকারের নিষিদ্ধ করা এ্যামিডোপাইরিন ও আংশিক নিষিদ্ধ করা, অন্য কিছু দেশে নিষিদ্ধ হওয়া ফিনাইল বিউটাজোন (পরের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এগুলিও একই ভাবে রক্তের মারাত্মক ত্রুটি, লিভার ও কিডনির রোগ, ইত্যাদি সৃষ্টি করতে সক্ষম। (Phenyl dimethyl pyrazolone-এর অপর নাম antipyrine যা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য আলাদাভাবে ব্যবহারই করা হয় না)।

সারিডনের ট্যাবলেটগুলি যে বাক্সে প্যাক্ করা হয় তার গায়ে ছোট ছোট করে ইংরেজীতে লেখা আছে— "অনেকদিন ধরে বেশী পরিমাণে খেলে ক্ষতি হতে পারে ; ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া সারা দিনে ২-৩টি ট্যাবলেটের বেশী খাওয়া উচিত নয়।" অনেকটা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-এর মত ব্যাপার। কি ক্ষতি

তারও উল্লেখ নেই। কিন্তু এর বিজ্ঞাপনে বা ট্যাবলেটের মোড়কে কোথাও এটুকু সতর্কতাও নেই। তাই যারা হরদম সারিডন কিনে খান তাঁরা এর থেকে বিপদের কোন সম্ভাবনা সম্পর্কে আদৌ সচেতন থাকেন না। বাস্তবতঃ সারিডন খাওয়ার

সারিডন।
মাথা-ধরা সারানোর
স্পেশালিষ্ট।

এমন কোনও ভাল স্পেশালিষ্ট কি হাতের কাছে নেই, যার ওপর পুরো ভরসা করতে পারেন ? প্রতি বারেই ব্যথা-বেদনার সময় যার ওপর অগাধ আস্থা রাখতে পারেন ? এমন কেউ, ব্যথা-বেদনায় যে চট্‌পট্‌ আরাম দিতে পারে ?

ঠিক যেমনটি — সারিডন। সেই জন্যেই তো, সবার মতেই মাথা-ধরা সারানোর স্পেশালিষ্ট বলতে — সারিডন। যার নামযশ বিশ্বময়।

বিপজ্জনক বিজ্ঞাপন—সতর্কতা, সাবধানবাণীর সামান্য উল্লেখও নেই

জন্য কেউই প্রায় ডাক্তারের কোন পরামর্শ নেন না, সারাদিনে অন্ততঃ ৩-টি ট্যাবলেট অনেকেই খান। আর এর থেকে ক্ষতি, বিশেষত পাইরাজোলোন ও পিরিডিনের জন্য একটি ট্যাবলেট খেয়েও হতে পারে। পাকস্থলীতে ক্ষত অর্থাৎ

আলসারের সম্ভাবনা থাকায় খালিপেটে এ ধরনের ট্যাবলেট যে একেবারেই খাওয়া উচিত নয় তা আগেই বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যথা কমানোর নাম করে বহুল প্রচলিত সারিডনও নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য ক্ষতিকর আরেকটি 'ওষুধ' যার যথেচ্ছ ব্যবহার নানা বিপদ ডেকে আনে।

অন্যদেশে এইভাবে বাতিল হওয়া এই ধরনের ওষুধ আমাদের দেশে এখনো বাতিল হয়নি। কিন্তু চলছে কার স্বার্থে? সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিশ্চয়ই নয়।

(ফেনাসেটিন নামে আরেকটি উপাদান ব্যথা কমায়, কিন্তু রক্তের উপর তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া, যকৃৎ ও বৃক্কের ক্ষতি করার ক্ষমতার জন্য নিষিদ্ধ একটি ওষুধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে নানা নামে তা আমাদের দেশে বিক্রি হয়, যেমন এ পি সি ট্যাবলেট (এ্যাসপিরিন, ফেনাসেটিন ও ক্যাফিন)। তবে আগে ভেগানিন, এপিডিন, ক্যাপ্র্যামিন, কোডোপাইরিন, স্প্যাজমিগুন, কোডালজিন ইত্যাদি নানা ওষুধের একটি উপাদান ছিল ফেনাসেটিন। এখন ভারত সরকার ফেনাসেটিন নিষিদ্ধ করার পর এগুলি থেকে ফেনাসেটিন বাদ দিয়ে একই নামে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে এগুলোর প্রায় সব কটিতেই একাধিক অন্য উপাদান ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে মেশান আছে।)

বিচিত্র দেশ ও তার বিচিত্র বন্ধু!

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই আমেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশান অ্যানালজিন গোষ্ঠীর ওষুধ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছিলেন। তারপরই আমেরিকায় এই ওষুধ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ইয়োরোপের দেশগুলিতে তো বটেই এমনকি তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই অ্যানালজিন গোষ্ঠীর সব ওষুধপত্র নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ব্যতিক্রম একমাত্র ভারতবর্ষ—দেশীয় সংস্থা আই ডি পি এল পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর ওষুধ ব্যাপকভাবে উৎপাদন করতে শুরু করেছেন।......অ্যানালজিনের কাঁচামাল যে দেশ থেকে আমদানি করা হয়—সেই রাশিয়াতেও অ্যানালজিন বহুদিন যাবৎ নিষিদ্ধ।....." (আজকাল; ১. ৬. ৮৫)

(২)

বাত-ব্যথায় আরো কিছু মারাত্মক ওষুধ

এসিটাইল স্যালিসিলিক এ্যাসিড (অ্যাসিপিরিন) ও প্যারাসিটামল ছাড়া বেদনানাশক ও বাত-ব্যথার জন্য আর যেসব ওষুধকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাভুক্ত করেছেন সেগুলি হল এলোপিউরিমল (gout এর জন্য), ইবোপ্রোফেন (যা ব্রুফেন, ব্রেন, ইবুজেসিক, ইবু সিন্থ ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়), ইণ্ডোমেটাসিন (যা ইডিসিন, ইণ্ডোক্যাপ, মাইক্রোসিড ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়) এবং কোলচিসিন ও প্রোবেনসিড। এদেরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সতর্কতার সঙ্গে এদেরও ব্যবহার করা দরকার, কিন্তু এদের কার্যকারিতা ও তুলনামূলক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত। এ তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে আরো বিপজ্জনক কিছু ওষুধ—এদের মধ্যে এ্যামিডোপাইরিন, এ্যানালজিন ও ফেনাসেটিন-এর কথা আগেই বলা হয়েছে যার কিছু কিছু আমাদের দেশে এখনো বিক্রি হয়ে চলেছে (এবং এ্যামিডোপাইরিন, ফেনাসেটিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে)। একইভাবে বিক্রি হয়ে চলেছে ক্ষতিকর বলে অন্যত্র নিষিদ্ধ ফিনাইলবিটাজোন ও অক্সিফেনবিউটাজোন, ইত্যাদি সম্বলিত ওষুধও। এগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় বাত (arthritis) -এর ব্যথা কমানোর জন্য।

ফিনাইলবিউটাজোন ও অক্সিফেনবিউটাজোন পাকস্থলীতে ক্ষত (আলসার) সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আরো বিপজ্জনক হল এটি শরীরের মধ্যে শ্বেতকণিকা তৈরীর প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দিয়ে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। হাড়ের মজ্জার কাজ স্তিমিত হয়ে পড়ায় এটি ঘটে এবং ফলে ভয়াবহ জীবাণুসংক্রমণ, এ্যালার্জি ইত্যাদি হয়। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এক বিশেষ ধরনের বাতে (ankylosing spondylitis) ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একদিকে, এই বিশেষ ক্ষেত্রেও যেমন এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমান, অন্যদিকে বহু চিকিৎসকই এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা জানেনেই না, সাধারণ মানুষ তো নয়ই। ফলে যত্রতত্র এটি ব্যবহৃত হয়ে চলেছে ব্যাপকভাবে। বুটাপ্রক্সিভন (গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত, এসিটামিনোফেন ও ঘুমের ওষুধ ডায়াজিপামের সাথে মিশিয়ে,—ওকহার্ডট্ কোম্পানির), বুটাপাইরিনগা (ইংগা কোম্পানির), এসজিপাইরিন N (ক্ষতিকর এ্যানালজিনের সাথেই মিশিয়ে ; এসজি ফার্মাসিউটিক্যালস্), ফ্লামার-পি (প্যারাসিটামল, ডায়াজিপামের সাথে মিশিয়ে ; ইণ্ডোকো), ইনফ্লাভান (খাণ্ডেলওয়াল), পারভন ফোর্ট (ডায়াজিপামের সাথে মিশিয়ে) ও জাগ্রিল (জ্যাগশন পাল), কিলপেন (এ্যানালজিনের সাথে মিশিয়ে ; বিড্‌ল্ সয়্যার), ম্যাক্সিজেসিক (এ্যানালজিন ও ডায়াজিপামের সাথে মিশিয়ে ; এথিকো), অক্সালজিন (এ্যানালজিনের সাথে মিশিয়ে ; ক্যাডিলা), অক্সিট্রায়াকটিন (ফার্মেড), প্যারাজোলাণ্ডিন (প্যারাসিটামলের সাথে মিশিয়ে), জোলাণ্ডিন ও

সুগারনিল (আগে এটি টেণ্ডেরিল নামে বিক্রি হত) (এস জি ফার্মাসিউটিক্যালস), প্যারক্সি-ডি (প্যারাসিটামল ও ডায়াজিপামের সাথে মিশিয়ে; ব্লুশিল্ড), ফেনাবিড (IDPL), ফেনজিন-এ (পাস্তুর), বেপারিল (F D C), রুমাটিন (প্যারাসিটামল, ডায়াজিপামের সাথে মিশিয়ে; নোয়েল) ইত্যাদি নানা নামে নানা কিছু হাবিজাবির সাথে মিশিয়ে ফিনাইলবিউটাজোন জাতীয় ওষুধ বিক্রি হয়ে চলেছে। কখনো এর সাথে মেশান হচ্ছে ক্ষতিকর এ্যানালজিন ও ঘুমের ওষুধ, কখনো বা রোগী ও চিকিৎসককে আপাত আশ্বাস দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য অম্বলবিরোধি কিছু মালকড়ি।

বৃটেনের একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়, "১৯৬৪ — ১৯৮০ সালের মধ্যে ফিনাইলবিউটাজোনের জন্য ৫১২ জন মারা গেছে। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা হাজারের বেশী বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এই ওষুধ গ্রহীতাদের মধ্যে ৪০% জনই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হন।.....এ পর্যায়ের ওষুধগুলি হচ্ছে, বুটাজলিডিন, বুটাজলিডিন এ্যালকা, বুটাকোট ও টেনডেরিল। বৃটেনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার ফিনাইলবিউটাজোনকে ক্ষতিকারক ওষুধের তালিকায় সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন।.....তবে ওষুধটির ব্যবহার এক সপ্তাহের অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়"। (Health Action International News: August, 83) ফিনাইলবুটাজোনের গোত্রভুক্ত অক্সিফেনবিউটাজোন বৃটেনে টেনডেরিল নামে সিবাগেইগি কোম্পানি বিক্রি করত। তাদের ফাঁস হয়ে যাওয়া এক গোপন দলিল (leaked Internal Document) থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৪-১৯৮৪ সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র বৃটেনেই ১৫০০ ব্যথার রোগী এ ওষুধের কারণে মারা যায়। আমেরিকার স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির হিসেবে একই সময়ে আমেরিকায় ১০০০০-এর বেশী রোগী এই ওষুধের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। (The Pharmaceutical Journal : 10.3.84)।

আর সম্প্রতি বিদেশ ঘুরে আমাদের দেশে এসেছে বাত-ব্যথার 'নতুন-দামী' কিছু ওষুধ যেমন পাইরক্সিক্যাম, সুলিণ্ডাক, ডাইক্লোফেনাক, ডাইফ্লুনিসেল ইত্যাদি। এদের মধ্যে বিশেষ করে পাইরক্সিক্যাম ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে; পাইরক্স, মোডএ্যাক্ট, এসউইন, ফেল্ডিন, মিনিক্যাম ইত্যাদি বাণিজ্যিক নামে বিক্রি হয়। বাতের ব্যথা কমানোর প্রচলিত ওষুধের বদলে দামী এই ওষুধটি চিকিৎসকরা দিচ্ছেন রোগীকে কিছু চমক দেওয়ার জন্য, সাম্প্রতিক জ্ঞানের সাথে নিজের পরিচিতির পরিচয় হিসেবে এবং অবশ্যই নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে। রোগীরাও নতুন দামী ওষুধ পেয়ে মানসিকভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিও আদৌ বাত-নিরাময় করে না। ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে এসবের ভূমিকাও সাময়িক — মালটি যতই দামী তথা ওষুধব্যবসায়ীদের কাছে লাভজনক হোক না কেন। অন্যদিকে এর থেকে বিপদের সম্ভাবনা অন্তত ইবুপ্রোফেনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত একটি

তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে এর আঁচ পাওয়া যাবে। যেমন—

ওষুধের নাম (কোন সালে চালু হয়েছে)	প্রতি দশলক্ষে পরিপাক-তন্ত্রের ভয়াবহ জটিলতা	প্রতি দশলক্ষে সর্বমোট ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া(এবং মৃত্যু)
ইবুপ্রোফেন(১৯৬৯)	৬.৯	১৩.২(০.৭)
পাইরক্সিক্যাম(১৯৮০)	৫৮.৭	৬৮.১(৬.২)
সুলিণ্ড্যাক(১৯৭৭)	২৩.৯	৫৪.৩(৫.১)
ডাইক্লোফেনাক(১৯৭৯)	২০.৯	৩৯.৪(৩.১)
ডাইফ্লুনিসেল(১৯৭৮)	৩৩.৭	৪৭.২(৩.৫)

(Drug Disease Doctor, Vol.2, No.1 থেকে সংগৃহীত)

পাইরক্সিক্যাম থেকে অতিরিক্ত সংখ্যায় পেপটিক আলসার, আলোক সংবেদনশীলতা, এবং মৃত্যুর ব্যাপারটি আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি নানা দেশে প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকায় ১৯৮২-এর এপ্রিল থেকে ১৯৮৫-এর নভেম্বরের মধ্যে এই ওষুধ থেকে ১৮২টি মৃত্যুর ঘটনা জানা গেছে।(ঐ)

কিন্তু আমাদের দেশে বাত-ব্যথা হলে লোকে মরীয়া হয়ে বা চিকিৎসকেরা রোগীর কষ্ট কমানোর আশায় এ সব ওষুধই দিয়ে যান। অথচ উপযুক্ত শিক্ষা, ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে স্কুল থেকেই কিছু ব্যায়াম ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের ব্যবস্থা করলে এ ধরনের কষ্ট অনেকটাই কমান যায়। খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে এ ধরনের রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম—অবশ্যি যদি সাথে পুষ্টির অভাব না থাকে। শারীরিক পরিশ্রম কম যারা করে সেই মূলত মধ্যবিত্ত ও ধনীদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশী এবং ওষুধ ও তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার এরাই বেশী শিকার। আর বাত-ব্যথায় বাধ্য হয়ে ওষুধ খেতেই হলে কার্যকরী ও তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বিকল্প ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়—যার উদাহরণ প্রথমেই দেওয়া হয়েছে।

(৩)

আমাশার ওষুধে পঙ্গু

এণ্টেরোকুইনল, এণ্টেরোভায়োফর্ম, মেক্সাফর্ম ইত্যাদি যে আমাশার ওষুধ তা কে না জানেন! প্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে মুড়ি মুড়কির মত এ সব ওষুধ অনেকেই খান। কিন্তু এ- ওষুধ থেকে বহু মানুষ অন্ধ বা সারাজীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছেন—এ খবরটা হয়ত অনেকের জানা নেই।

ওষুধ প্রায়শঃই কৃত্রিমভাবে তৈরী রাসায়নিক পদার্থ। যেমন আমাশার পরজীবী মারার এ ধরনের ওষুধে থাকে ক্লিওকুইনল (আওডোক্লোরো হাইড্রক্সিকুইনোলিন বা ভায়োফর্ম ; ডাই আয়োডো ক্লোরো হাইড্রক্সিকুইনোলিন বা ডাওয়োডোকুইন)। এসবে থাকে প্রায় ৪০ — ৬০% আয়াডিন।

ষাটের দশকে জাপানে এ-ধরনের ওষুধ খেয়ে পঙ্গু হওয়ার ব্যাপারটা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমে দেখা দিয়েছিল পায়ের অসাড়তা, নার্ভের রোগ, তলপেটে ব্যথা, সাথে একটু পাতলা পায়খানা। এঁরা সবাই ক্লিওকুইনল যুক্ত আমাশার পূর্বোক্ত ওষুধ খেয়েছিলেন। কিন্তু তখনো অব্দি জানা যায়নি উপসর্গগুলির স্বরূপ কি। জাপানের আইহারা শহরে বিশেষ বিভাগ খুলে এদের চিকিৎসা করা হল আবার ওই আমাশার ওষুধগুলি দিয়েই। ফল হল মারাত্মক। তাঁদের কষ্টগুলো তীব্রভাবে বেড়ে গেল। অনুসন্ধানে জানা গেল এঁদের সবাই আক্রান্ত হয়েছেন মাংসপেশী ও স্নায়ুর এক দুরারোগ্য রোগে, যাতে চোখের নার্ভও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। রোগটির পোষাকি নাম Subacute myelo-optic neuropathy (SMON)। নাম যাই-ই হোক রোগটি কিন্তু সবার কাছেই ছিল মর্মান্তিক। আক্রান্তদের অর্ধেকই দু'বছরের মধ্যেও আর তাঁদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন নি। শতকরা ৭ জন মারা যান, শতকরা ১০-১৫ জন সারাজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যান।

এঁদেরই এক জন ৫৯ বছর বয়সের মিসিকো কিনোসিতা, ১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন। ডাক্তার দেন এণ্টেরোভায়োফর্ম। মে মাসে তিনি পায়ের অসাড়তা অনুভব করেন। ক্রমশঃ চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যায়, হাঁটা চলার ক্ষমতা লোপ পায়— সারাজীবনের জন্যই তিনি পঙ্গু হয়ে যান। ১৯৭২ সালে তিনি ওষুধটির প্রস্তুতকারক, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি সিবা-গেইগির বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং ৭ বছর পরে আদালতের বাইরে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়। তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ১৮৪৮৮০ ডলার, এছাড়াও কোম্পানি তাঁকে মাসিক ১৮৪ ডলার ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনি আরেক জন, ৩৫ বছর বয়সের কেইকো ইমামাগুসি। ইনিও ডায়ারিয়ার জন্য একই ধরনের ওষুধ খেয়ে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন, সুখী পারিবারিক জীবন আর চাকরি থেকে বহু দূরে গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে কাটছে তাঁর জীবন। ইনিও ১৯৭২ সালে মামলা করলে সিবা-গেইগি ১৯৯২৬৩ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় এবং মাসোহারা বাবদ

৬১৭ ডলার করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এধরনের উদাহরণ রয়েছে অজস্র। এঁদের নিয়ে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সুইজারল্যাণ্ডে সিবা-গেইগির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সাংবাদিক সম্মেলন হয়। এই সুইজারল্যাণ্ডেই রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, কয়েকটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির অফিস।

এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশিত হয় যে ক্লিওকুইনল যুক্ত আমাশার ওষুধ খেয়েই এই পঙ্গুত্ব, অন্ধত্ব। এই ক্লিওকুইনল আবিস্কৃত হয় ১৯৩১ সালে। কিন্তু প্রথমে ব্যবহৃত হত ক্ষতস্থানে প্রয়োগের জন্য পাউডার হিসেবে। পরে পরজীবী অ্যামিবা (Entamoeba histolytica)-র কারণে ডায়ারিয়া বা আমাশার জন্যও প্রয়োগ করা হতে থাকে। অন্ত্রের আমাশায় এটিকে কিছুটা কার্যকরী বলেও জানা যায়, তবে অন্ত্রের বাইরে অন্য কোথাও এই পরজীবীর আক্রমণ ঘটলে (যেমন যকৃতে) এটি খুব একটা কার্যকরী নয়। কিন্তু ওষুধ কোম্পানিগুলি প্রচারের জোরে, মুনাফার মোহে সাধারণভাবে এমন ধারণার সৃষ্টি করে যে, আমাশা হলেই এধরনের ওষুধ খাওয়া দরকার, এমনকি আমাশা প্রতিরোধেও এটি নাকি কার্যকরী। ফলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা গড়ে ওঠে, বিশেষতঃ আমাদের মত দেশের মানুষের পকেট কেটে, যেখানে আমাশয় রোগটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ওষুধটি আমাদের দেশে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়াও ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, সব বড় সরকারী হাসপাতালে — স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মুড়ি মুড়কির মত বিতরিতও হয়। এন্টেরোকুইনল, এন্টেরোভায়োফর্ম, মেক্সাফর্ম, ডিপেণ্ডাল, এন্ট্রোজিভিট, ডিসেনক্লোর, ইনটেস্টোপেন, এমিক্লিন প্লাস, ক্লোরাম্বিন, ডিসফার প্লাস, সারিল, এন্টেরোলাইট, এনট্রোজাইম ইত্যাদি অজস্র নামে ঐ ক্ষতিকর উপাদান যুক্ত ওষুধ আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা The Selection of Essential Drugs বইতে প্রয়োজনীয় ওষুধের যে তালিকা বের করেছে তাতে ক্লিওকুইনল ধরনের ওষুধের উল্লেখ নেই। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে "যেহেতু বিকল্প ওষুধ রয়েছে, তাই এর সন্দেহজনক কার্যকারিতার পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য একে বাতিল করা হল।" আমেরিকা থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত Current Medical Diagnosis & Treatment বইতে এসব ওষুধকে "ডায়ারিয়া প্রতিরোধে ও ফলপ্রসু চিকিৎসায় শুধু অক্ষমই নয়, বরঞ্চ ক্ষতিকর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল এটিকে নকল বড়ি বা placebo হিসেবে বর্ণনা করেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা ল্যান্সেট এ ওষুধকে অনিশ্চিত ভাবে কার্যকরী বা ছেঁড়াকাঁথার সাথে তুলনা করেছে (nebulous ragbag)। ১৯৭০ সালে জাপানে এ ধরনের ওষুধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং তারপর এর ক্ষতিকর প্রভাবজনিত রোগ (SMON) আর ওখানে দেখা যায় নি।[১]

কিন্তু না, আমাদের দেশে এ ওষুধ এখনো নিষিদ্ধ হয় নি। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে যে কয়েকটি ওষুধকে এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে এটি থাকলেও তা না থাকারই মত। বলা হয়েছে —ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি ও চামড়ার রোগে একে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু অন্যত্র নিষিদ্ধ।[২] রহস্যময়ভাবে স্ববিরোধি কথার ধোঁয়াশায় এভাবেই ওষুধটি আমাদের দেশে চলছে। ১৯৮২ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকারেরই কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এধরনের ওষুধের তৈরী ও বিক্রি বন্ধ করার আদেশ জারী করেছিলেন কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে এক বছর পরেই পাল্টে গেল মতটা।

ভারতীয় ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ সমিতিও দেখেছে, "এখনো প্রতিটি ভারতীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ওষুধটি সংরক্ষিত থাকে।" এখানে এই 'মধ্যবিত্ত' কথাটি উল্লেখযোগ্য। সত্যি কথা বলতে কি আমাশার জন্য তুলনামূলক নিরাপদ ওষুধ হল মেট্রোনিডাজল জাতীয় ওষুধ (যা মেট্রোজিল, ফ্লাজিল, ফ্লুন্ট ইত্যাদি নানা ব্যবসায়িক নামে পাওয়া যায়)। কিন্তু এর দাম তুলনামূলকভাবে বেশী। তাই আমাদের দেশের সরকারী হাসপাতালে এটিকে প্রায় দেওয়াই হয় না, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় কম দামের কিন্তু ক্ষতিকর ক্লিওকুইনলযুক্ত পূর্বোক্ত ওষুধই। অবশ্যি আমাদের দেশে কম দামের এন্টেরোকুইনলাও কোন কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকে না।

দারিদ্রের দোহাই দিয়ে, মানুষকে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' জাতীয় গোঁজামিল দিয়ে ক্ষতিকর ওষুধ খাওয়ানর ব্যাপারটা সবারই জানা উচিত। এই সাফাই গেয়ে অনেক চিকিৎসকও বলেন, এ গরীব দেশে দামী মেট্রোনিডাজেল কিভাবে সাধারণ মানুষ পাবে, আর দু-চারটে এন্টেরোকুইনল —মেক্সাফর্ম খেলে কিছু হবে না, দীর্ঘদিন প্রচুর পরিমাণে খেলেই কেউ পঙ্গু হলেও হতে পারে। আসলে ওষুধ কোম্পানিগুলি এই ভাবেই বুঝিয়ে সাফাই গাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করে। জাপানের ক্ষেত্রে সিবাগেইগি ঠিক এই কথাই বলেছিল ; আরো বলেছিল "আপনারা কেমন করে ভাবেন যে একটি বৃহৎ বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি জেনেশুনেও ক্ষতিকর ওষুধ চালাবে?" এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে New Scientist পত্রিকার ডাঃ ওলি হ্যানসন তাই সঠিক ভাবেই বলেছিলেন "আমাদের সময়ের সব চাইতে বড় ওষুধ কেলেংকারি সম্পর্কে এটা হচ্ছে সিবা গেইগির সাফাই।" চিকিৎসাবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বই Harrison's Principles of Internal Medicine (Asian Edition, 1983) -এও ক্লিওকুইনল যুক্ত ওষুধের প্রেসক্রিপশান দেওয়া হয়েছে। সাথে বলা হয়েছে বেশিদিন খেলে

১। মাসিক গণস্বাস্থ্য (ঢাকা), আষাঢ় ১৩৮৯।

২ Ministry of Health & Family Welfare Notification 23. 7. 85. No × 11—11014/1/83—DMS & PFA

SMON রোগ হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, একদিনের ডোজেও কেউ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। যেমন হয়েছিল একজন ব্রিটিশ নার্সের। মোজাম্বিকে গিয়ে ডায়ারিয়ার জন্য ইনি মাত্র একদিন মেক্সাফর্ম খান। এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে স্নায়বিক অসাড়তার কারণে ভদ্রমহিলা পঙ্গু হয়ে যান। মামলা করলে সিবা গেইগি কোম্পানি তাঁকে ২৫০০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটি সামাল দেয়। জাপানের SMON-আক্রান্ত রোগীদের উপর পরীক্ষা করে অধ্যাপক পি কে টমাসও মন্তব্য করেছেন, "কেবলমাত্র নির্ধারিত মাত্রার অধিক ক্লিওকুইনল খেলেই যে স্নায়ু অবশ ও পঙ্গু হয়ে যাবে, তা সবক্ষেত্রে সত্যি নয়। অনেক সময় কেবলমাত্র একদিনের ডোজেও শরীর পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।" (১) এবং হিসেব করে দেখা গেছে সারাদিনে তিনটি ট্যাবলেট দু'সপ্তাহের কম সময় খেলে শতকরা ১ জন স্নায়বিক অসাড়তায় আক্রান্ত হয়। দু'সপ্তাহের বেশী খেলে শতকরা ৩৫ জনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানা আছে মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে বহু রোগীকে সারাদিনে ৬টি করে এন্টেরোকুইনল ৭-১০ দিনের জন্য হামেশাই দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে আমাশার এ ধরনের ওষুধের জন্য কতজন কিভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই, বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ তথ্য সংগ্রহেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এ ওষুধের কারণে পুরোপুরি পঙ্গু না হয়ে, কতজন মৃদুভাবে বা মাঝারিভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তারও কোন হিসাব নেই। স্পষ্টতঃই এদের অন্য কোন রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তার জন্য চলে ভিন্নতর ওষুধ কিংবা বিনা ওষুধে কিছু অসুস্থতা নিয়ে জীবন কাটায় রোগী। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার মূল কারণও এই মেক্সাফর্ম, এন্টেরোভায়োফর্ম ওষুধই হতে পারে। এছাড়া সারা শরীরে খোস পাঁচড়ার মত ফোঁড়ার বিস্তার (Idoine toxicoderma), মাথাধরা, বমিভাব, কাঁপুনি, মাঝে মাঝে জ্বর, মলদ্বারে চুলকুনি, নানা চর্মরোগ, অহেতুক কোষ্ঠকাঠিন্য, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বেড়ে যাওয়া বা তার ক্ষমতা কমে যাওয়া, চুল উঠে যাওয়া, স্মৃতি বিভ্রম, শ্বেতকণিকা কমে গিয়ে জীবাণু আক্রমণ ইত্যাদি নানা লক্ষণ এ ধরনের ওষুধ থেকে হতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ও যাদের লিভার ও কিডনির কোন রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে এ ওষুধটি বিশেষভাবে ক্ষতিকর। আর এসব কারণেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় এ জাতীয় ওষুধকে বাতিল করা হয়েছে। উন্নত বা ধনী দেশগুলিতে এ ওষুধের ব্যবহার অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশেও ১৯৮২ সালে জাতীয় ওষুধ নীতি চালু হবার পর এ ধরনের সব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেমন স্কুইব কোম্পানির কুইক্সালিন ট্যাবলেট এবং ক্লিওকুইনল ভায়োফর্ম যুক্ত সব ওষুধগুলিই। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে "এগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ।" "পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত এই

ওষুধগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকর, মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত। আমাদের দেশে এগুলো যত্রতত্র কিনতে পাওয়া যায় এবং যথেষ্ট অপব্যবহারও দেখা যায়।'' ইত্যাদি।[৩]

আমাদের দেশে আমাশা রোগীর সংখ্যা বিপুল। সারা বিশ্বে যেখানে শতকরা ১০ জন এ্যামিবিয়াসিসে ভোগে সেখানে আমাদের দেশের কোন কোন জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী লোক এতে আক্রান্ত। (যেমন বোম্বাইতে শতকরা ৫৮ জন ; তবে কলকাতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মাত্র শতকরা ৮.৮। পরিসংখ্যানটি কতটা নির্ভরযোগ্য তা সন্দেহের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে যে পদ্ধতিতে হিসাব করা হয় তার জন্যও পরিসংখ্যানে বিরাট হেরফের ঘটে।)[৪]

আর আমাশা একটি সামাজিক রোগ। পরিশ্রুত পানীয়জলের অবশ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমেই একে প্রায় নির্মূল করা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ একটি এলাকার লোক স্থায়ীভাবে আমাশামুক্ত থাকতে পারে না। তাই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার পাশাপাশি এর স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্যাপক সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন যা সরকারী আন্তরিকতার মাধ্যমে সম্ভব। আর এ ব্যাপারে মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন আমাদেরই সচেতনতা। এই সচেতনতার পাশাপাশি তার ওষুধ সম্পর্কে সচেতনতাও প্রয়োজন। আমাশারোগীদের বিপুল অংশ গরীব থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত। এদের জন্য কম দামের বিপজ্জনক ওষুধ (এন্টেরোকুইনল ইত্যাদি) আর মুষ্টিমেয়দের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দামী ওষুধ (মেট্রোনিডাজল) চালু রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার।

খবর : সিবা-গেইগি কোম্পানি ক্লিওকুইনল যুক্ত তাদের যাবতীয় ওষুধ গত ৩১শে মার্চ, ১৯৮৫ থেকে বাজার থেকে তুলে নিয়েছে। বাণিজ্যিক নামে বাজারে চালু তাদের এ ওষুধগুলি হল—মেক্সাফর্ম, ও এন্টেরোভায়োফর্ম

সংযোজন

চাপে পড়ে বিক্রেতা ওষুধ কোম্পানি এর উৎপাদন বন্ধ করেছে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা একে তাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে, বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু আমাদেরই মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের কিছু বিশেষজ্ঞ এসব সত্ত্বেও এন্টেরোকুইনলের ব্যবহারের সুপারিশ করে থাকেন। গত ১৭ই নভেম্বর — ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৫ তারিখের কলকাতার 'প্রতিক্ষণ' পাক্ষিকে

(৩) বাংলাদেশের দারিদ্র ও ওষুধ, ডায়না মেলরোজ, ঢাকা।
(৪) PSM, Park.

'ওষুধের নিরাপত্তা' শিরোনামার একটি প্রতিবেদনের লেখক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্স-এর ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিষ্ণু প্রসাদ মুখার্জি এঁদের একজন। ১৭ই সেপ্টেম্বর—১লা অক্টোবর, ১৯৮৫-এর 'প্রতিক্ষণে' প্রকাশিত (পঃ বঃ ড্রাগ এ্যাকশান ফোরাম-এর) ডাঃ সুজিত কুমার দাসের "নিষিদ্ধ ওষুধের কাহিনী" শিরোনামার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "সরকারি ছাড়পত্র পাওয়া প্রচলিত ওষুধ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে, যেসব বহুল প্রচলিত ওষুধ যেমন এণ্টেরোকুইনল, এনটেরোস্ট্রেপ ইত্যাদি এভাবে প্রচলিত আছে, তাদের কার্যকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা বা নিরাপত্তা বহুদিনের ব্যবহার ও প্রকাশিত দলিল দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত। বহু তথ্যের ভিত্তিতেই ওষুধগুলির প্রচলন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এতে কোনো কাল্পনিক ভীতির স্থান নেই। সাধারণ মানুষকে অহেতুক ভীতিগ্রস্ত করায় সামাজিক কোনই মঙ্গল নেই।" আই এম এ (পঃ বঃ)-এর প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ মনীশ প্রধানও সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, ক্লিওকুইনল থেকে বিপদ নিছক জেনেটিক কারণে ঘটেছে—ভারতের মানুষের কাছে তা নিরাপদ। (আনন্দ বাজার পত্রিকা ; ৩. ৪. ৮৮) শ্রদ্ধেয় ডাঃ মুখার্জি বা ডাঃ প্রধান অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মত মানুষেও যখন জলজ্যান্ত সত্যিগুলিকে 'কাল্পনিক' বা 'অহেতুক' বা 'জেনেটিক' বলে মন্তব্য করেন তখন দুঃখ হয়, ক্রোধ হয় ; —কিভাবে ওষুধ নয়, ওষুধ ব্যবসা এবং প্রচলিত শাসন-শোষণ ব্যবস্থার সাফাই গাওয়ার প্রবণতা আমাদের বিশেষজ্ঞদের মজ্জায় মিশে গেছে, তা দেখে আতঙ্ক হয়। এইভাবে ঈশ্বর ভজনা বা গুরুবাবাভক্তি, জ্যোতিষে বিশ্বাস বা রত্ন ধারণ অনেক তথাকথিত বিজ্ঞানীদের মনেও গেড়ে বসে আছে।

একই প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুখার্জির আরও কিছু মন্তব্যের ব্যাপারে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা যায়, যদিও তা আমাশার ওষুধ সম্পর্কে নয়। মুনাফাভিত্তিক ব্র্যাণ্ড (বাণিজ্যিক) নামের বদলে জেনেরিক নাম ব্যবহারের জন্য সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ মুখার্জি মন্তব্য করেছেন, "বাণিজ্যিক নাম দেওয়া হলেও সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের বৈজ্ঞানিক নামও (generic name) সমভাবে ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই বাণিজ্যিক নামের ওষুধেও চিকিৎসকেরা সব সময়ে এর বৈজ্ঞানিক নাম পেয়ে যান, এতে কোন অসুবিধাই হয় না।" ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে এ বইতে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। ডাঃ মুখার্জি দেশের Drug Price Control Order এর "কঠোর নিয়ন্ত্রণ", "ভেষজ পঞ্জি (pharmacopoea)" ও "আমাদের ভেষজ সংস্থা" ইত্যাদি যে "সমাজের হিতার্থে প্রয়োজনীয় ও নিরাপদ ওষুধই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বাজারে প্রচলিত রেখেছেন" তার সপক্ষে ওকালতি করেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

শ্রীজয়চন্দ্র সিং-এর বক্তব্যই ডাঃ মুখার্জির এই সব বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলো। দেশে-বিদেশে এই ধরনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সরকারিভাবে তিনি ঐ সময় মন্তব্য করেছিলেন আগামী দু, মাসের মধ্যে একটি কার্যকরী (Workable) জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষণা করা হবে অর্থাৎ বর্তমান ওষুধ নীতি যে কার্যকরী নয় তা স্বীকার করলেন।* তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, ওষুধের গায়ে জেনেরিক নাম ও ব্র্যাণ্ড নাম দুটোই থাকবে এবং জেনেরিক নাম ব্র্যাণ্ড নামের দু'গুণ সাইজে ছাপা হবে— এ ধরনের সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেট অনুমোদন করেছেন। (স্টেটসম্যান ; ৪. ১. ৮৬) অর্থাৎ বাণিজ্যিক নামের মত জেনেরিক নামও "সমভাবে ও স্পষ্টভাবে" জানিয়ে দেওয়া হয় বলে ডাঃ মুখার্জি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা যে ঠিক নয় তা শ্রী সিং-এর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। অবশ্যি এ বোঝার জন্য শ্রী সিং-এর বক্তব্য না জানলেও চলে, যে কেউ কোন কোম্পানির ওষুধ দেখে নিতে পারেন, প্রায় সর্বত্রই জেনেরিক নাম থাকে অতি ক্ষুদ্র হরফে আর ব্র্যাণ্ডনামথাকেবিরাটঅক্ষরেছাপা।(সম্প্রতিএছবিটাধীরেধীরেপাল্টাচ্ছে)

* অবশ্যি ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে বহু প্রতীক্ষিত যে ওষুধ নীতি ঘোষিত হয় সেটিও দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থকে ততটা রক্ষা করে নয়, ওষুধ কোম্পানির, বিশেষতঃ বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করেই করা হয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে নানা আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলা হয়েছে, তবু মূল ছবিগুলি পাল্টায়নি বললেই চলে।

(৪)

কাশির ওষুধে মাতাল

হ্যাঁ, কাশির জন্যে বাজারে যে হরেক রকমের সিরাপ-ট্যাবলেট পাওয়া যায় — যার অনেকগুলোরই নাম আমরা অনেকেই জানি আর ডাক্তারের নির্দেশে কিংবা নিজের ডাক্তারিতে কিনে খাই— সেগুলির প্রায় সবকটিই নেশার সৃষ্টি করে, অপ্রয়োজনীয় এবং শারীরিক নানা ক্ষতিও করে। যদিও এগুলি অনেক সময় সাময়িক কিছু আরামও দেয় কিন্তু সেগুলির এই কার্যকারিতার পিছনে মাদকতা সৃষ্টি ও রোগীর আসক্ত হয়ে পড়ার ব্যাপারটা বিরাট অংশে জুড়ে থাকে।

কাশি দু'ধরনের—শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। আমাদের শ্বাসতন্ত্রের মধ্যস্থ অবাঞ্ছিত কোন ক্ষতিকর পদার্থকে বের করে দেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতায় যে কাশি হয় তা শরীরের নিজস্ব আত্মরক্ষা-মূলক প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। এই কাশি শরীরের পক্ষে দরকারি। এ কাশিতে কিছু কিছু কফ (Mucus) বেরোয়— কোন জীবাণু আক্রমণ জনিত প্রদাহ না ঘটলে এ কফের রঙ হয় সাদা। এধরনের কাশিকে বন্ধ করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যদিকে ক্রমাগত শুকনো কাশি হয়ে যাওয়াটাকে বন্ধ করা দরকার—এ কাশি শরীরের কাজে লাগে না। প্রথম ধরনের কাশির কোন চিকিৎসার প্রয়োজন না থাকলেও জীবাণু আক্রমণের কারণে হলুদ রঙের কফ বেরুতে থাকলে জীবাণু ধ্বংস করার ওষুধ (antibiotic) দেওয়ার দরকার হতে পারে, কিন্তু কাশির সিরাপ নয়। যক্ষ্মা, প্লুরিসিতেও দীর্ঘস্থায়ী কাশি হয়। এক্ষেত্রেও চিকিৎসা সুনির্দিষ্ট ওষুধ, কাশির সিরাপ আদৌ নয়; এরা জোর করে কাশি সাময়িক-ভাবে একটু কমিয়ে রোগ নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং আরও বিপজ্জনক অবস্থা ঘটায়। আর কফ যদি পরিমাণে অল্প ও আঠাল হয়, কিংবা কষ্টকর শুকনো কাশি হয়, তবে তার আদর্শ চিকিৎসা হচ্ছে ফুটন্ত জল থেকে গরম ভাপ শ্বাসের সঙ্গে নেওয়া (steam inhalation)। এ জলে দু চার ফোঁটা বেনজোইন দিয়ে দেওয়া যায়, না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। তবে সবচেয়ে বেশী দরকার কাশির কারণটি জানা। জীবাণু বা প্রদাহ ছাড়া, ধুলো-ধোঁয়া-ধূমপান ইত্যাদির কারণে কিংবা কোন ক্ষতিকর গ্যাস শ্বাসের সাথে নিলেও কাশি হতে পারে। স্পষ্টতঃই এগুলির চিকিৎসা কোন ওষুধ নয়, কারণটিকে পরিহার করা। খুব গরম বা ঠাণ্ডা হাওয়া শ্বাসের সাথে নিলেও কাশি হতে পারে। এছাড়া শ্বাসতন্ত্রের কোন স্থানে চাপ পড়ে (mechanical cause) কাশি হতে পারে, যেমন কোন টিউমার, ক্যানসার, ফুসফুসে জল বা পুঁজ জমা ইত্যাদি। এছাড়া হাঁপানিতেও শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে কাশি হতে পারে। দেখা গেছে কোন কোন হাঁপানি রোগীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দীর্ঘস্থায়ী কাশিই একমাত্র বাহ্যিক কষ্ট হিসাবে থাকে। এদেরও আসল চিকিৎসা কাশির প্রচলিত সিরাপ ইত্যাদি নয়।

ব্যাপক প্রচারের জোরে যে অজস্র কাশির ওষুধের রমরমা ব্যবসা চলছে,

প্রকৃতপক্ষে সেগুলির প্রয়োজনীতা ততটা নেই। এইসব ওষুধে একটি বড় উপাদান থাকে আফিম বা মরফিনের সমগোত্রীয় কোডিন, ফোলকোডিন, হাইড্রোকোডোন,ইথাইল মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড, নোসকাপন, ডেক্সট্রোমেথোরফেন। এগুলি নেশা বা আসক্তি তথা মাদকতার সৃষ্টি করে তবে আফিমের চেয়ে একটু কম ("relatively non-addicting")। এগুলি আমাদের মস্তিষ্কের কাশি-নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রকে স্তিমিত করে, সাথে সাথে মস্তিষ্কের অন্যান্য কাজকেও কিছুটা প্রভাবিত করে। আরও মুস্কিল হল এ ওষুধগুলি কফকে শুকিয়ে দেয়, ফলে কাশির সাথে যে কফ উঠছিল — যা শরীরের আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়ার অংশ, তা বন্ধ হয়ে গিয়ে কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং যে ক্ষতিকর পদার্থগুলি (যেমন ধুলো, ধোঁয়া বা কার্বন গুঁড়ো ইত্যাদি), বের করানোর জন্য কফ উঠছিল সেগুলি বুকেই জমতে থাকে, সৃষ্টি হয় ভয়াবহ আরও বিপজ্জনক অবস্থা। অথচ কাশির ওষুধ হিসাবে বিক্রি করা মে অ্যাণ্ড বেকার কোম্পানির ফেনসেডিল-এর এক চামচে (৫ মি.লি) কোডিন থাকে ৯ মি.গ্রা, ম্যানারস্ কোম্পানির ড্রিস্টান এক্সপেকটোরেণ্ট-এ থাকে ৭.৫ মি.গ্রা, ফাইজার-এর কোরেক্স, সারাভাই কোম্পানির টোসেক্স (ইমপ্রুভড), ও এসোসিয়েটেড কোম্পানির ভেসোফ্রেক্স-এ থাকে ১০ মি.গ্রা. করে, খাণ্ডেলওয়াল-এর এক্সসিপলন-এ ১২ মি.গ্রা। ইথাইল মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড মে অ্যাণ্ড বেকার কোম্পানির জেফ্রল নামের কাশির ওষুধে এক চামচে থাকে ১ মি.গ্রা, মার্ক-এর কোসোম-এ থাকে ২ মি.গ্রা। ফোলকোডিন নামে আর একটি মাদক দ্রব্য মে অ্যাণ্ড বেকার-এর টিক্সিলিক্স-এ আছে ১.৫ মি.গ্রা। এটি আবার বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্যে বিশেষভাবে বলা হয়। গ্রিফন কোম্পানির টুক্সিন ট্যাবলেটে নোসকাপিন থাকে ১৫ মি.গ্রা, আই.ডি.পি.এল-এর ডিক্স-এন-এর এক চামচেও থাকে ১৫ মি.গ্রা, বুটস-এর প্রোটুসা-র একচামচে রয়েছে ৫ মি.গ্রা., বায়োলজিক্যাল ইভানস-এর কোস্কোপিন লিনটাস-এর এক চামচে থাকে ৭ মি.গ্রা আর কোসকোট্যাবস ট্যাবলেটে থাকে ২৫ মি.গ্রা। এরা আবার বাচ্চাদের জন্যে কাশির ড্রপও বের করেছে, এতে প্রতি ফোঁটায় (০.৬ মি.লি.) নোসকাপিন রয়েছে ১.১ মি.গ্রা।

কফ-কাশির ওষুধে এধরনের মাদক দ্রব্য থাকার ফলে— এগুলি খেলে একটি "তৃপ্তিদায়ক নেশার আমেজ আসে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে রোগী সহজে নেশাখোরে পরিণত হয়।"(মাসিক গণস্বাস্থ্য, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) তবে শুধু 'দীর্ঘদিন' নয়— মরফিন বা এই জাতীয় পদার্থের উপর নির্ভরতা ২ — ৩ দিন খেলেও অনেক সময় সৃষ্টি হয় ; হ্যাঁ, ডাক্তারের বলে দেওয়া ডোজে খেলেই। ১ — ২ সপ্তাহ খেলে তো কথাই নেই।

কাশির সিরাপে থাকা এ্যালকোহল বা মদ ব্যাপারটিকে সহজতর করে তোলে। যেমন পার্ক ডেভিসের বেনাড্রিল এক্সপেকটোরেণ্টের এক চামচে এ্যালকোহল

থাকে ০.২৬২৫ মি লি, সার্লের ড্যাসলিনে থাকে ০.২৬ মি লি, এ্যালেম্বিক-এর জীট এক্সপেক্টোরেন্ট-এ থাকে ০.১৫৬ মি লি ইত্যাদি। বীয়ারে থাকা এ্যালকোহলের মাত্রার থেকেও এই পরিমাণ বেশী। (পরে 'টনিক' অংশটি দ্রষ্টব্য।) সব মিলিয়ে বাচ্চা থেকে বুড়ো—সবার পকেট কেটে ওষুধের নামে যা করা হয়; তা হল মদ আর আফিম খাইয়ে মাদকতার সৃষ্টি করে আপাত ভাল লাগার ব্যাপারটা সৃষ্টি করা। আর কিছুদিন এভাবে 'ওষুধ' খাওয়ার পর রোগীর শারীরিক-মানসিক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। এই ভাললাগা আর নির্ভরতার জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে কাশির সিরাপের বিক্রি বাড়ে।

কাশির সিরাপে আরেকটি পদার্থ থাকে যা এ্যালার্জির বিরুদ্ধে কাজ করে। এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব কাশির ওষুধেই নানা ধরনের অ্যালার্জিবিরোধি পদার্থ (যেগুলি 'এন্টিহিস্টামিন' নামেও অভিহিত করা হয়) বিভিন্ন মাত্রায় দেওয়া থাকে এবং সবাই—ডাক্তারও, রোগীদের বোঝায় সর্দি কাশি হলে ওষুধটি অব্যর্থ কাজ দেবে ("for the symptomatic relief of coughs and colds of various types")। কিন্তু ফার্মাকোলজির বইতে এই পদার্থটি সর্দি-কাশির ক্ষেত্রে যে কার্যকরী নয় তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "যদিও সাধারণ সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগায় (Common cold) 'এন্টিহিস্টামিন'-এর কার্যকারিতা কখনোই প্রমাণিত হয়নি তথাপি এর বি

র্ধমান হার থেকে এটাই অনুমান করা চলে ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্রে বা কোন ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই জনসাধারণ যে হারে ওষুধটি ব্যবহারের জন্য কিনছে সে ব্যবহারের পেছনে ঔষধ বিশেষজ্ঞের চেয়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থা সমূহের অবদানই বেশী।" (রিভিউ অফ মেডিক্যাল ফার্মাকোলজি ; মায়ারস, জাভেটজ ও গোল্ড ফিয়েন ৬ষ্ঠ সংস্করণ পৃঃ ৯০। মাসিক গণস্বাস্থ্য ; বর্ষ ১, সংখ্যা ১১ থেকে গৃহীত।) আরও বলা হয়েছে, "সাধারণ ঠাণ্ডা লাগায় এন্টিহিস্টামিনের সাহায্যে কোন উপকার আদৌ পেলে তা ঘটে সর্দি বা কফের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে এবং জীবাণু আক্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট সামান্য কোন এলার্জির ঘটনা আদৌ থাকলে সম্ভবতঃ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এন্টিহিস্টামিনের সাহায্যে সাধারণ সর্দি ভাল হয়েছে— এধরনের কথাবার্তার উৎস এটিই। এছাড়া এলার্জি-জনিত নাকের প্রদাহ (allergic rhinitis)-এর রোগীকে আলাদা করে চিহ্নিত না করা এবং রোগীর উপর ডাক্তারের স্তোক বাক্যের মানসিক প্রভাবের ব্যাপারটাও কাজ করেছে। পর্যবেক্ষণের পক্ষপাতমূলক ঝোঁক, নিছক মন রাখার জন্য দেওয়া ওষুধের প্রভাব, চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক রোগ নির্ধারণের গুরুত্বকে উপলব্ধি না করা এবং চিকিৎসার ফলাফলকে ভুলভাবে উপস্থিত করা—এগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাও এ থেকে লাভ করা যায়।" (Laurence) কথাগুলি ভাল করে লক্ষ্য করে সাধারণ সর্দির ক্ষেত্রে এ্যান্টিহিস্টামিনের অসারতা ভাল করে বোঝা যায়। অথচ প্রচারের জোরে সর্দিহলেইএধরনেরওযুধখাওয়ারপ্রবণতাভয়াবহ

আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এধরনের ওষুধ খেলে কফ (mucus) শুকিয়ে যায়। এ ব্যাপারটি যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তা আগেই বলা হয়েছে। আরও বিপজ্জনক হল এই ওষুধের ফলে ঘুম ঘুম পাওয়া, অবসাদ বোধ, মাথা ঘোরা, হাত কাঁপা, নিদ্রাহীনতা, ভয় পাওয়া ইত্যাদি ঘটে—আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্রের উপর এর প্রভাবে। ফলে এধরনের ওষুধ খেয়ে গাড়ি চালান, আগুনের বা জলাশয়ের ধারে কাজ করা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু এ ধরনের কোন সাবধান বাণী কোন কোম্পানিই সাধারণ মানুষকে জানায় না। এ্যান্টিহিস্টা-মিনের প্রভাবে চামড়ার রোগ (dermatitis) ও রক্তের শ্বেত কণিকা কমে গিয়ে প্রাণঘাতি অবস্থার (agranulocytosis) সৃষ্টি হতে পারে। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এগুলি কম বেশী ঘটে। কিন্তু সচেতন না থাকার ফলে আমরা প্রায় কেউই এব্যাপারে গা ঘামাই না।

কাশির সিরাপে এফিড্রিন নামে আর একটি পদার্থ থাকে যা শ্বাস প্রশ্বাস সহজ করে তোলে। হাঁপানির চিকিৎসায় এককভাবে এর ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধের মত এরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং সাধারণ সর্দি-কাশির চিকিৎসায় এই বিরূপতার ঝুঁকি অবশ্যই বিপজ্জনক। অথচ অ্যাকটিলেক্স, কোরেক্স, এক্সিপলন, কোসোম, ফেনসেডিল, জেফরল ইত্যাদি অজস্র, মূলত কাশির জন্যে ব্যবহৃত ওষুধে এফিড্রিন দেওয়া থাকে। এবং অবধারিত ভাবে সঙ্গে মেশান থাকে এ্যান্টিহিস্টামিন ও অন্যান্য হাবিজাবি পদার্থ। আবারো বলা দরকার সুনিশ্চিতভাবে হাঁপানি থাকলে তার জন্য এফিড্রিন এককভাবেই দেওয়া যায়, অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে তাকে সাধারণ সর্দি-কাশিতেও জুড়ে দেওয়া ক্ষতিকরই।

কাশির সিরাপে কফ বের করানোর জন্যে (expectorant) নানা পদার্থ থাকে যেমন এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম আয়োডাইড, ভোলাটাইল অয়েল ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোও আদৌ কার্যকরী কিনা সে ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে "শ্বাসরোধকারী জমাট কফ সহজে বের করে আনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু কফ উৎক্ষেপক হিসাবে এসব উপাদানের কার্যকারিতার প্রমাণ প্রায় নেই বললেই চলে।" (The Extra Pharmacopoea 27th Edn, Martindale; গণস্বাস্থ্য ; ১ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা থেকে গৃহীত) এগুলির কোনটি পাকস্থলির প্রদাহ ঘটিয়ে, কোনটি বা স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিয়ে কফ বের করানোর ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ভূমিকা নেয়— কিন্তু এসবে উপকারের চেয়ে অপকারের মাত্রাটাই বেশী। গুয়াইয়াকল, ক্রিয়োজোট, ভোলাটাইল অয়েল জাতীয় পদার্থগুলি এককভাবে তবু মন্দের ভাল কারণ এগুলি শ্বাসনালীর কফ নিঃসারক গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে কাজ করে। তবে জমাট বাঁধা শক্ত কফ নরম করে বের করানোর সবচেয়ে কার্যকরী ও নিরাপদ উপায় হল, গরম জলের ভাপ শ্বাসের সাথে নেওয়া—যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় কাশির ওষুধ হিসাবে

একমাত্র কোডিন-এর উল্লেখ করা হয়েছে—তথাকথিত এক্সপেকটোরেন্ট বা অন্য কিছুর নাম নেই। কোডিন যে একটি মাদক দ্রব্য তা স্মরণ রেখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কোডিন সম্পর্কে এও বলেছে যে এটি "সিঙ্গল কনভেনশান অন্ নারকোটিক ড্রাগস্ (১৯৬১) ও কনভেনশান অন্ সাইকোট্রোপিক সাবস্টেনসেস (১৯৭১)-এর অধীনে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ ওষুধ।" কিছুদিন আগে, ৭ ৬. ৮২ তারিখে, প্রতিবেশী বাংলা দেশ তাদের জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বহু অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও নিছক লাভের জন্য বানানো অজস্র ওষুধ বাতিল হয়েছে। এর অন্যতম বহু কাশির সিরাপ। উদাহরণ না বাড়িয়ে বাতিল হওয়া ডাইমাইরিল ওষুধটির (ফাইসন্স-এর তৈরী) কথা বলা যায়। বাতিল করার কারণ হিসাবে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "কাশির তথাকথিত ওষুধ। একান্তই অপ্রয়োজনীয়, গরীব জনগণকে ফাঁকি দিয়ে পয়সা আদায়ের চেষ্টা। কাশির অসুখে কাজ করে বলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি, ক্রেতা ও ডাক্তারদের এতকাল ধরে ভুল বুঝিয়েছে। অর্থের অপচয়, কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়।" আমাদের দেশে কবে এ কথা বলা হবে? বহু প্রতীক্ষার পর, ১৯৮৬-এর শেষের দিকে, ভারতে যে তথাকথিত ওষুধ নীতি ঘোষণা করা হয়, সেটি এসবের ধারকাছ দিয়েও যায়নি।

সব মিলিয়ে আমাদের দেশের সর্দি-কাশির চিকিৎসায় তথাকথিত সর্দি-কাশির সিরাপ বা ট্যাবলেটগুলি অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, ক্ষতিকরও বটে। অথচ ওষুধ কোম্পানিগুলি অমানবিকভাবে মুনাফা লোটার জন্য মিথ্যা বা অর্ধসত্য কথা বলে, সত্য কথা চেপে গিয়ে ডাক্তারদেরতো বটেই খবরের কাগজ-রেডিও-টেলিভিশানের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকেও প্রতারিত করে, মানসিকভাবে প্রভাবিত করেও এসব ওষুধ ব্যবহারে বাধ্য করে। ওষুধ কোম্পানিগুলির মিথ্যাচারের উদাহরণ বেশী না বাড়িয়ে মে অ্যাণ্ড বেকারের উদাহরণ দেওয়া যায়। এরা তাদের প্রচারপত্রে আমাদের দেশের বাচ্চা কি বয়স্ক সকলের জন্য ফেনসেডিল ও টিক্সিলিক্স নামক ওষুধকে কাশি সর্দির চিকিৎসায় ব্যবহারের কথা বলেছে ("Symptomatic relief of coughs & colds")। কিন্তু এরা নিজেদের মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডে এই একই ওষুধ সম্পর্কে এধরনের মিথ্যে কথা বলতে পারেনি—অবশ্যিই সেখানকার আইনকানুন ও মানুষের সচেতনতার চাপে। এদুটি ওষুধে থাকে প্রমেথাজিন নামে এ্যান্টিহিস্টামিন—যা আচ্ছা করে আমাদের নিস্তেজ করে দেয়, কোডিন বা ফোলকোডিন — যা আসলে নেশার সৃষ্টি করে, এফেড্রিন বা ফিনাইল প্রপানোলাজিন—যা হাঁপানির জন্যে কার্যকরী, সর্দিতে আদৌ নয়। অবশ্য অন্য কোম্পানিগুলিও এমন কিছু সাধুপুরুষ নয়।

এই ধরনের নির্লজ্জ মিথ্যাচারেই এরা ব্যবসা চালাচ্ছে। আর আমরা কাশির ওষুধে নেশা করে আর সাময়িক আরাম পেয়ে ভাবছি, বুঝি ভাল আছি। কিছু চিকিৎসকও এধরনের আরাম দিয়ে রোগীর মন জয় করেন।

(৫)

স্টেরয়েডের বিপদ

এক ভদ্রলোক ভুগছিলেন শ্বাসকষ্টে। অতিউৎসাহী এক চিকিৎসক শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য স্টেরয়েড খেয়ে যেতে বল্লেন। রোগী ফল পেলেন নাটকীয়ভাবে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্বাসকষ্ট উধাও। ডাক্তারের জয়জয়কার— এমন 'বিধান রায়' আর হয় না। এক সপ্তাহ পরে রোগীর বুকে ব্যথা ও প্রচণ্ড জ্বর শুরু হল। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে, কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে এক্সরে করে দেখা গেল দুটি ফুসফুস যক্ষ্মায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। বহু টানা হ্যাঁচড়া করে কোনক্রমে প্রাণে বাঁচলেন ভদ্রলোক। 'অস্ত্রোপচার সফল কিন্তু রোগী মারা গেছে' জাতীয় এধরনের ব্যাপার স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে হামেশাই দেখা যায়।

কিন্তু এর অর্থ অবশ্যাই এ নয় যে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেলে এধরনের ভয়াবহ অবস্থা হবে। অনেক সময় স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের জীবনদায়ী ভূমিকাও রয়েছে। বিশেষ কিছু রোগেও এটি অত্যাবশ্যক। আমাদের শরীরে কিডনির উপরে থাকা এড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ডের কর্টেক্স নামক অংশ থেকে শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই ধরনের হরমোন বের হয় — যেগুলি রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে কাছাকাছি হলেও কিছু পার্থক্য রয়েছে ও তিন ধরনের হয়। সাধারণভাবে এদের স্টেরয়েড বলা হয়। শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়া ও যৌন কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা বিরাট। পাশাপাশি এদের রয়েছে প্রদাহ বিরোধী ভূমিকা— মূলত এই কারণে স্টেরয়েড ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কৃত্রিমভাবে অনেক কম দামে এ ওষুধ পাওয়া যায়, জরুরী ক্ষেত্রে প্রদাহ বিরোধী ভূমিকার জন্য স্টেরয়েড জীবনদায়ী ও তীব্র রোগকষ্ট কমানয় ভূমিকা রাখলেও, আবার এই কারণেই এর অপরিণামদর্শী বেহিসেবী ব্যবহারও হয়— যার ফলে প্রথমোক্ত উদাহরণের মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, ঘটে দীর্ঘস্থায়ী নানা প্রতিক্রিয়া।

হার্ট এ্যাটাক, শক্ অবস্থা, এড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডের কাজ প্রচণ্ড কমে যাওয়া, তীব্র শ্বাসকষ্ট, লিউকিমিয়ার কিছুধরনের রোগী, মারাত্মক এ্যালার্জির অবস্থা, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, তীব্রভাবে দেখা দেওয়া আরও কিছু রোগ (যেমন severe Systemic Lupus Erythematosus, severe Exfoliative Dermatitis and Pemphigus) ইত্যাদি কিছু ক্ষেত্রে স্টেরয়েডের জীবনদায়ী ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া সহজে না কমা যকৃতের প্রদাহ তথা জণ্ডিস, রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস (এক ধরনের বাত)-এর তীব্র কষ্ট, আলসারেটিভ কোলাইটিস, লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যাওয়ার প্রবণতা-র মত কিছু ক্ষেত্রেও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ কাজ করে। কিন্তু পাশাপাশি স্টেরয়েডের যথেচ্ছ ব্যবহার অনেক রোগীর সর্বনাশ ডেকে আনে। তড়িঘড়ি প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে এ ধরনের ওষুধ যেহেতু দ্রুত আরাম দিতে পারে, তাই অনেক চিকিৎসকই রোগীকে মানসিক শান্তি দেওয়ার ও নিজের

আপাত সুনাম অর্জনের জন্য সামান্য প্রয়োজনেও এর ব্যবহার করেন। অনেক রোগীও এভাবে চিকিৎসকদের দবারা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সামান্য কষ্ট পেলেই স্টেরয়েড খেতে শুরু করেন, হয়ত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই। আপত্তিটা এসব ক্ষেত্রেই। বিশেষ করে হাঁপানি, কিছু ধরনের বাতের রোগীরা এভাবে স্টেরয়েডের অন্তহীন চাকায় বাঁধা পড়ে যান। অনেক চিকিৎসকও জ্বর কমানোর বা অন্য কোন কষ্টকে সঠিকভাবে বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে, স্টেরয়েড দিয়ে রোগটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ক্ষতি হয় এতেও।

প্রদাহ আমাদের শরীরে একটি অতি প্রয়োজনীয়, আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া। এ্যালার্জি, জীবাণু আক্রমণ, কোন আঘাত ইত্যাদি নানা কারণে যে প্রদাহ (inflammation) সৃষ্টি হয় তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আক্রান্ত স্থানটিকে বিপদ মুক্ত করা। সংশ্লিষ্ট স্থানে রক্ত সঞ্চালন তথা প্রয়োজনীয় শ্বেতকণিকার সরবরাহ বৃদ্ধি পায়,— স্থানটি কিছুটা ফুলে ওঠে, লাল ও গরম হয়ে যায়, তার কাজও কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, ব্যথা অনুভূত হয়।

কিন্তু স্টেরয়েড এই প্রদাহ কৃত্রিমভাবে বা জোর করে কমিয়ে দেয়,— শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়েই। বেশ কিছুদিন ধরে স্টেরয়েড খেলে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ক্রমবর্ধমান পরিমাণের স্টেরয়েডের উপর শরীর নির্ভরশীল হতে থাকে— যার ফলে সামান্য জীবাণু আক্রমণই মৃত্যু ঘটাতে পারে, যক্ষ্মা বা অন্য ধরনের কোন রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে পারে। প্রদাহ হলে স্টেরয়েডের ফলে তা জোর করে কমানোর পর ঐ রোগ নির্ণয়ও কষ্টকর হয়ে যায়।

কিন্তু বিশেষতঃ অনেক হাঁপানি ও বাতের রোগী মুড়ি মুড়কির মত স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খান বা তাদের খাওয়ানো হয়। হাঁপানিতে স্টেরয়েডের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি রোগ সারায় না, কিন্তু যখন হাঁপানির জন্য সব ধরনের ওষুধ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং রোগী ঘন ঘন তীব্র শ্বাসকষ্ট (status asthmaticus)-এ আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না, একমাত্র তখনই একে রোগীর কষ্ট কমানোর জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যত দ্রুত সম্ভব তার ডোজ কমান বা বন্ধ করা দরকার। যদি চালাতেই হয় তবে বড়জোর দিনে এক মি গ্রা পরিমাণ খেতে হবে। দু'মাসের বেশী স্টেরয়েড খাওয়ার পর স্টেরয়েডের পরিমাণ কমান আরও বিপদজ্জনক— মারাত্মকভাবে রোগটি ফিরে আসতে পারে (Catastrophic relapse)। বিশেষ ধরনের বাত (rheumatoid arthritis)-এ স্টেরয়েডের ব্যবহার হাঁপানির মতই কখনোই রোগটি সারায় না (in no way curative)। ব্যথা কমানর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কেবলমাত্র সাময়িক এবং অনির্দিষ্ট কাল খেয়ে যেতে হয়। অনেক রোগী কিছুদিন পরে স্টেরয়েডে আর উপকার পান না, ফলে আরো বেশী ডোজে দেওয়া হয়,

বিপদ আরো বাড়ে! যখন অন্য সব ধরনের ওষুধ ব্যর্থ হয়েছে কেবলমাত্র তখনই স্টেরয়েড দেওয়া যায়, তবে সম্ভব হলে দু'মাসের মধ্যেই তা বন্ধ করা দরকার। কিন্তু এ ধরনের রোগীরা একবার স্টেরয়েড ব্যবহার করলে তার উপর এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যে, তাকে বন্ধ করলে কষ্ট তীব্রভাবে বেড়ে যায়। গাঁটের স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে গেলে স্টেরয়েড কোন কাজ করে না।

অনেক চিকিৎসক আবার গাঁটের ভিতর স্টেরয়েড ইনজেকশান করে দেন। কিন্তু এটিও দু'সপ্তাহের বেশী কষ্ট কমিয়ে রাখতে পারে না। যখন কোন গাঁট বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় বা গ্যাসট্রিক আলসার, যক্ষ্মা, গর্ভাবস্থা, ডায়াবিটিস ইত্যাদির কারণে স্টেরয়েড খাওয়া নিষিদ্ধ তখন খুব প্রয়োজন হলে এভাবে গাঁটে স্টেরয়েড ইনজেকশান করা যায়। তবে এটি দেখা গেছে যে, এ ধরনের ইনজেকশানের ফলে আসল চিকিৎসার পরিবর্তে রোগীর উপর মানসিক প্রভাবের কারণে (placebo-effect) কষ্ট কম মনে হওয়ার ব্যাপারটি বেশী ঘটে। এছাড়া কোমর, হাঁটু , গোড়ালি ইত্যাদির মত যে সব গাঁট শরীরের ওজন বহন করে সেখানে এ ধরনের ইনজেকশান করলেও স্থায়ীভাবে গাঁটের ক্ষতি হয়ে যায় কারণ মূল রোগটি না কমলেও ব্যথা কম মনে হওয়ার কারণে রোগী বেশী হাঁটাচলা করতে শুরু করেন।

কিছুদিন ধরে স্টেরয়েড খেলে ওষুধের কারণে ভিন্নতর রোগের সৃষ্টি হয়। মুখ হয়ে যায় গোলগাল (চাঁদপানা ! moonface), মুখে ও সারা গায়ে যত্রতত্র লোম গজায় ও চর্বি জমে, রক্তচাপ বেড়ে যায়, চুলকুনি ও ব্রণ দেখা দেয়, মাংসপেশী ও হাড়ের ক্ষয় হয়— যার ফলে সামান্য কারণে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে (বিশেষতঃ, পাঁজরা ও মেরুদণ্ডের হাড়)। স্টেরয়েডের কারণে মানসিক হতাশা ও মনোবৈকল্য দেখা দেখা, যা এক সময়ে আত্মহত্যার ভয়াবহ প্রবণতার সৃষ্টি করতে পারে। ডায়াবিটিস দেখা দিতে পারে এবং এর থেকে আবার অন্যান্য শারীরিক কষ্ট শুরু হয়। বদ হজম, অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ, গ্যাসট্রিক আলসার, পেটের মধ্যে রক্তক্ষরণ এমনকি পাকস্থলি ফুটো হয়ে যেতেও পারে— যা প্রায়শই প্রাণঘাতী। চোখে ছানি পড়া, চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যাওয়া ও তার থেকে অন্ধত্ব, ঘন ঘন জ্বর, হার্টফেলিওর, মস্তিস্কে অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যাওয়া ও খিঁচুনি, যত্রতত্র রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার প্রবণতা, মেয়েদের মাসিকের গণ্ডগোল, ঘা দেরীতে শুকোন ইত্যাদি আরও অজস্র বিপদও স্টেরয়েড ডেকে আনতে পারে। যক্ষ্মা বা অন্য কোন সুপ্ত রোগ প্রাণঘাতী আকারে মাথাচাড়া দিতে পারে। এছাড়া গর্ভাবস্থায় স্টেরয়েড খেলে বিকলাঙ্গ ঠোঁট কাটা শিশু প্রসবের সম্ভাবনা আছে বলে সন্দেহ করা হয়। স্টেরয়েডের ফলে কোন কোন ক্যানসারের বৃদ্ধি ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া ব্যাপারটা ঘটা সম্ভব বলেও মনে হয়।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড শারীরিক বিকাশ ও হাড়ের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

ক্রমবর্ধমান হারে তার শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে, যার ফলে হাঁপানি বা অন্য কোন রোগে ভোগা বাচ্চাকে স্টেরয়েড দিলে, রোগের কারণে নয়—স্টেরয়েডের জন্যও তার শরীরের গঠন বয়স অনুপাতী হয় না, সারাজীবনের জন্যই সে দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে যায়।

সব মিলিয়ে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ একদিকে কিছু ক্ষেত্রে জীবনদায়ী ভূমিকা রাখলেও, অন্যদিকে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে মারাত্মক এক অস্ত্র, সৃষ্টি করেছে রোগ না সারিয়ে রোগীর কষ্ট তড়িঘড়ি কমিয়ে দেওয়ার সুবিধাবাদী ও ব্যবসায়িক কৌশল অবলম্বনের মানসিকতা— যা মূলতঃ রোগীর স্থায়ী ক্ষতিই করে।

স্টেরয়েড শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিকশিত না করে, তাকে নষ্টই করে দেয় (immuno-suppressive)। স্টেরয়েড এমন এক ধরনের ওষুধ যার যথেচ্ছ ব্যবহার ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবসায়ীর উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি হাঁপানি, বাত, এ্যালার্জি ইত্যাদির জন্য ব্যবহার যোগ্য হিসাবে প্রচার করে নানা নামের স্টেরয়েড বাজারে ছেড়েছে। বেটনেল্যান, বেটনেসল, ডেলটাকর্ট্রিল, হোষ্টাকর্টিন-এইচ, লেডারকর্ট, ওয়ালাকর্ট, ওয়াইমেসন, ওয়াইসোলোন ইত্যাদি নামে এগুলি পাওয়া যায়। আরও বিপজ্জনক হল, অত্যন্ত ক্ষতিকরভাবে অন্য উপাদানের সাথে স্টেরয়েড মিশিয়ে বাজারে ছাড়া! এগুলি অবাধে বিক্রিও হয়। এ্যাজমাপ্লন উইথ প্রেডনিসোলেন, কর্টাসমিল, হিস্টাপ্রেড, ওরিকিওর, ওটেক, ট্রেড্রাল-সি, কর্টোপ্যারাক্সিন সফ্লিক্যাপস, পেরিডেকা, কর্টিনা, এলোকর্ট ইত্যাদি অজস্র ওষুধে এধরনের মিশ্রণ করা রয়েছে। একবার জেনে যাওয়ার পর একটু কষ্ট হলেই হাঁপানি বা বাতে ভোগা অনেকে এগুলি কিনে খেতে শুরু করেন। এসব ওষুধের মূল উপাদান ডেক্সামেথাসোন, হাইড্রোকর্টিসোন বা প্রেডনিসলোন। এগুলি প্রয়োজনীয় ওষুধ ঠিকই, কিন্তু এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত করা দরকার, চূড়ান্তভাবে বাধ্য না হলে তা ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সাথে দরকার চরম সাবধানতা। আরও জরুরী হল, রোগীকে স্টেরয়েডের বিপদ সম্পর্কে যত দূর সম্ভব অবহিত করা, অল্পস্বল্প কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা গড়ে তুলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ বিপদ এড়াবার জন্য তার মনের জোর বাড়ান, যাতে রোগীই ঠিক করতে পারেন সামান্য প্রয়োজনে তিনি স্টেরয়েড খাবেন কিনা।

(সাহায্যকারী সূত্র—Harrison, Laurence)

(৬)

মহিলার পুরুষে রূপান্তর — আসামী এনাবলিক স্টেরয়েড

না, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় এনাবলিক স্টেরয়েড নামের কোন ওষুধের উল্লেখ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে এগুলি বেশ ভাল ভাবেই চালু রয়েছে। অর্গানন নামক হল্যাণ্ডের যে ওষুধ কোম্পানি এখন নাম পাল্টে 'ইনফার (ইণ্ডিয়া)' হয়েছে তারা ডুরাবলিন (মূল উপাদান ন্যানড্রোলোন ফিনাইলপ্রপিওনেট), ওরাবলিন (উপাদান — ইথাইল ইস্ট্রেনল) নামে এগুলি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে। শুধু এরাই নয়, ভিটামিন মিশিয়ে সিপলা কোম্পানি দিচ্ছে এনাবলেক্স বি-১২, ইউনিকেম দিচ্ছে ট্রাইনার্জিক (দুটিতেই মিথেনডাইনোন নামে এনাবলিক স্টেরয়েড রয়েছে) নামের ওষুধ ! জ্যাগসন পাল কোম্পানির ন্যানড্রোলোন ওয়ালা মেটাবল রয়েছে, কনসেপ্ট কোম্পানির ইভাবলিন রয়েছে, রয়েছে ইউনিকেম-এর ইউনাবল, ক্যাডিলা কোম্পানি আবার এর সাথে ভিটামিন মিশিয়ে বানিয়েছে নিউরাবল এইচ। আছে পার্ক-ডেভিস কোম্পানির এ্যাড্রয়েড (অক্সিমিথোলেন) আর উইন-মেডিকেয়ার-এর স্ট্রোম্বা (স্ট্যানোজোলোল) নামের ওষুধও।

এই এনাবলিক স্টেরয়েড (anabolic steroid) জাতীয় ওষুধগুলি আমাদের শরীরে প্রোটিন জাতীয় পদার্থের তৈরী করায় ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এ কাজটি শরীরের পক্ষে এই ধরনের ওষুধের সাহায্যে করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তবু এরই উপর ভিত্তি করে এধরনের পদার্থের অপ্রয়োজনীয় অপব্যবহার ঘটে।

এমনই একটি ভয়াবহ অপব্যবহার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বাচ্চা রোগা রোগা হয়ে থাকলে বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আর এ ধরনের বাচ্চাকে ডাক্তার দেখালে বহু ডাক্তারই তড়িঘড়ি তাকে মোটা করে চমক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য অপরিণামদর্শীর মত এনাবলিক স্টেরয়েড দিয়ে দেন।

তথাকথিত বহু ডিগ্রীধারী অনেক শিশুবিশেষজ্ঞও এর ব্যতিক্রম নন। এ ধরনের একটি শিশু কিছুদিন আগে ১৯৭৯ সালে সংবাদে শিরোনাম হয়েছিল। ব্রিটেনে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের সেমিনারে লীলা নামে প্রবাসী ভারতীয় দম্পতির এই মেয়েকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর আলোচনা সভা বসে। লীলাকে রোগা,

---

* এই শিরোনাম গ্রহণে মাসিক গণস্বাস্থ্য (৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

দুবলা দেখে মা তাকে নিয়ে গেছিলেন এক ডাক্তারের কাছে। তিনি তাকে এনাবলিক স্টেরয়েড খেতে দিলেন। বাবা-মা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করলেন কয়েকদিনের মধ্যেই লীলা বেশ নাদুস-নুদুস হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ আনন্দ আরও কিছুদিন পরে মিলিয়ে গেল। লীলার মা একদিন তার জাঙ্গিয়া পাল্টানোর সময় দেখলেন মেয়েটির প্রস্রাবদ্বারের উপরে ছেলেদের লিঙ্গের মত অঙ্গ দেখা যাচ্ছে— দিনের পর দিন তা বেড়েই যেতে থাকল। ভীত-সন্ত্রস্ত বাবা-মা ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে লীলাকে ভর্তি করালেন। খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে জানা গেল লীলা বেশ কিছুদিন ধরে এনাবলিক স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেয়েছে। পরিষ্কার হয়ে গেল কেন মেয়েটি ধীরে ধীরে কৃত্রিমভাবে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যাওয়া এক ভারতীয় তরুণ চিকিৎসক বললেন, ভারতে তো এ ধরনের বাচ্চাদের জন্য ওরাবলিন ড্রপস্ জাতীয় এনাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এ ধরনের ঘটনা তো ঘটেনি। অন্যরা চেপে ধরলেন— ভারতে ওষুধ আর ডাক্তারের কারণে রোগীর বিপদ বা মৃত্যু হলে কত ক্ষেত্রে তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয়, ডাক্তারের শাস্তি বা মামলা হয়! সত্যিই তাই। ভারতে এ ধরনের হাজার হাজার শিশু এনাবলিক স্টেরয়েড খেয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের কতজনের ক্ষেত্রে এধরনের বা অন্যান্য ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার অনুসন্ধানও হয় না। অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রেও তাই। চিকিৎসা তথা ওষুধের কারণে কিছু বিপদ ঘটলে তাকে ভিন্নতর কোন রোগ ভেবে আবার ডাক্তার দেখান হয়, ডাক্তারও হয়ত নিজের দোষ ঢাকার জন্য নানা কিছু বুঝিয়ে বাড়ির লোককে শান্ত করেন।

আমাদের দেশে ওষুধ কোম্পানিগুলিও শোষণের জন্য ভয়াবহভাবে মিথ্যা বা অর্ধসত্য কথা বলে চিকিৎসক ও রোগীদের বিভ্রান্ত করেন। যেমন এই অর্গানন কোম্পানির কথা ধরা যাক। নিজেদের দেশে বা সচেতন জনমানস যে সব দেশে রয়েছে সেখানে তারা তাদের ওষুধের প্রচারে এধরনের মিথ্যাচার করতে সাহস করে না। ব্রিটেনে ডাক্তারদের দেওয়া ওরাবলিন-এর প্রচার পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এটি শিশুদের জন্য নয় ("not recommended for children"), এর থেকে লিভারের টিউমার হতে পারে ও তার কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং প্রাণঘাতী কোন অবস্থা ছাড়া কাউকে বিশেষত তরুণদের দেওয়া উচিত নয়। ("These compounds may induce or enhance the devolopment of hepatic tumours.....and this should be considered when the use of this product is proposed, especially in young people, who are not suffering from life threatening disorders") কিন্তু আমাদের দেশে ওরাবলিন কিসে ব্যবহার করা যাবে তার তালিকায় এক সময় হাড় ক্ষয়ে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা (debility), পুড়ে যাওয়া, বড় অস্ত্রোপচারের

পরে খিদে কমে যাওয়া ইত্যাদি ছিল। (১) ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা, ক্ষিদে কমে যাওয়া— এগুলি আর যাই হোক প্রাণঘাতী অবস্থা নয়। অবশ্য সম্প্রতি আমাদের দেশে সুর কিছুটা পাল্টেছে। ওরাবলিনের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে শুধুদীর্ঘস্থায়ীদুর্বলতাবিশেষতযাখাবারদাবারদিয়েওদূরকরাযাচ্ছেনা।(২)

বাংলা দেশে ডাক্তারদের বিলি করা প্রচারপত্রে আবার স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছিল লিভারের কোন ক্ষতি করে না ("free from harmful effects on liver"), এবং আরও ভয়াবহ হল "বাচ্চাদের-ব্যবহারের জন্য নয়" -এটাতো বলা নেইই বরং, বাচ্চাদের জন্য মিষ্টি-গন্ধ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করে-দেওয়া হয়েছে ("The raspberry flavoured liquid administered in drops is especaily meant for younger children and infants")। ভারতবর্ষে অবশ্যি সম্প্রতি বলা হচ্ছে বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখতে (Keep this medicine out of the reach of children)। ওষুধ সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত MIMS India, Nov-84-তে একথা বলা হয়েছে, কিন্তু ঠিক এক বছর আগের সংস্করণে (Nov '83) এধরনের কথার কোন উল্লেখ ছিল না। CIMS(Jan-Apr,1988) অনুযায়ী ওরাবলিন ট্যাবলেট বাচ্চাদের দিতে বারণ করা আছে। কিন্তু তাদের জন্য একই জিনিস রয়েছে ড্রপ হিসাবে— ওরাবলিন ড্রপস।

অর্গানন (ইনফার-ইণ্ডিয়া) ডুরাবোলিনকেও বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্য রেখেছে—প্রতি সপ্তাহে ৫-১৫ মি.গ্রা. এবং সেখানেও দুর্বলতায় ব্যবহারের কথা বলেছে।

সিপলা কোম্পানি আরো একধাপ এগিয়ে মিথেনডাইনোন নামক এনাবলিক স্টেরয়েড যুক্ত তাদের এনাবলেক্স বি-১২-কে বৃদ্ধির গণ্ডগোল, ক্ষুধামন্দ্য, রক্তহীনতার সাথে ওজন কমে যাওয়া (Loss of appetite, weight loss with anaemia, growth disorders in children) — এ সবের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা বলেছে। হ্যাঁ, এখনও (CIMS, Jan-Apr, 1988) ইউনিকেম কোম্পানি আবার এই একই উপাদান যুক্ত তাদের ওষুধ ট্রাইনার্জিককে অপুষ্টির জন্যও ব্যবহারের কথা প্রচার করে ("malnutrition and under nutrition")! পেটপুরে দু'বেলা সুষম খাবার খেয়ে নয়, — ওষুধ কোম্পানির এই ট্যাবলেট খাইয়েই যেন দেশের পুষ্টি সমস্যা সমাধান করা যাবে। শিশুদের বাড় ঠিকমত না হলেও সেই ওষুধ।

ইয়োরোপ-আমেরিকার মত বহু দেশে কিন্তু এনাবলিক স্টেরয়েড-এর ব্যবহার এই মিথ্যা প্রচারের উপর দাঁড়িয়ে নেই। সেখানে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় বিশেষ কিছু রোগে একে ব্যবহার করা হয়, যেমন বিশেষতঃ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ভাবে হাড় ক্ষয়ে যাওয়া (osteoporosis), শরীরে রক্তকণিকা তৈরী করার অক্ষমতা

(১) MIMS India (Nov'84) (P. 115)
(২) CIMS; Jan-April'88

জনিত রক্তহীনতা (aplastic anaemia), কিডনির কাজ নষ্ট হয়ে যাওয়া ও এই কারণে রক্তহীনতা (Chronic Kidney failure), এবং শেষ চিকিৎসা হিসেবে, যে সব শিশুদের অণ্ডকোষ বিশেষ পুং হরমোন (এণ্ড্রোজেন) উৎপাদন করতে পারে না সেই বিরল ক্ষেত্রে (hypogonadal child)। অবশ্যি এসব ক্ষেত্রেও এ্যানাবলিক স্টেরয়েড আদৌ কাজ করে কিনা সেব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। "ব্রিটিশ জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিশের ভাষায় 'with varying degree of success'। গুডম্যান-গিলম্যানের 'দি ফার্মাকোলজিক্যাল বেসিস অব্ থেরাপিউটিক্স-এর ভাষায় 'probably of little or no benefit in severe anaemia', বয়সের তুলনায় শিশুর বৃদ্ধি না হলে এবং dwarfism নামক রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হলে, বিশেষ হরমোন (growth hormone) ব্যবহার করা দরকার, এনাবলিক স্টেরয়েড নয়। হাইপোগোনাডাল শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে এনাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহারে সামান্য কিছু উন্নতি হলেও তা স্থায়ী নয়। বরঞ্চ এর ব্যবহারে শিশুদের অনেক বেশী ক্ষতি হতে পারে। বয়সের সাথে সাথে হাড়ের যে অংশটা বাড়ে (epiphysis) এনাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহারে হাড়ের সেই অংশের অকাল সংযুক্তি (premature epiphysial fusion) ঘটায়, শিশু খর্বকায় হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বে বিত্তমান বাড়ির অনেক শিশুর খর্বকায় হবার অন্যতম কারণ শৈশবে এনাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহার। উন্নত দেশ সমূহে শিশুদের ক্ষেত্রে এনাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহার গর্হিত অপরাধ।"(৩)

আর এসব কারণে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এধরনের ওষুধকে প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা থেকে যে বাতিল করেছে তা শুরুতেই বলা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশে মূলতঃ ওই বিদেশী ওষুধ কোম্পানি-গুলিই কিভাবে শিশুদের বৃদ্ধির জন্য, ক্ষুধা কমে যাওয়া বা অপুষ্টির জন্য এসব ওষুধ চালু রেখেছে (অবশ্যই স্বাধীন দেশে সরকারী আইনকানুন অনুযায়ী) তাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এনাবলিক স্টেরয়েড শারীরিক ক্ষিপ্রতা বা শক্তি আদৌ বৃদ্ধি করে না, হৃৎপিণ্ড-লিভার-কিডনির ক্ষতি করতে পারে, মহিলাদের স্তন ক্যানসার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে, মহিলা ও বালিকাদের পুরুষালী ভাব এনে দেয়, মেয়েদের মাসিকের গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। এগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য হলেও কথাগুলি ওষুধ কোম্পানি-গুলিরও —আমেরিকা বৃটেনে তারাই তাদের এনাবলিক স্টেরয়েড সম্পর্কে এ সমস্ত সাবধান বাণী ডাক্তারদের বলে। কিন্তু ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশে ওই একই ওষুধ সম্পর্কে এতসব সাবধান বাণীর অনেকগুলি চেপে যায়। যেমন অর্গাননন (ইনফার ইণ্ডিয়া) তাদের ডুরাবোলিন ও ওরাবোলিনকে শুধু গর্ভাবস্থা, প্রস্টেট ক্যানসার, পুরুষদের স্তন ক্যানসার, লিভারের খুব বেশী গণ্ডগোলে ব্যবহার না করার কথা বলেছে আর ইউনিকেম-এর ট্রাইনার্জিক বা সিপলার এনাবলেক্স বি-১২ সম্পর্কে এধরনের কোন কথাই উল্লেখিত নেই (অন্তত CIMS Jan-Apr, 1988 -এ)।

(৩) মাসিক গণস্বাস্থ্য; ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

(৭)

টনিক, না ওষুধ – ব্যবসায়ীর 'পাদোদক' !

"Tonics are placebos" টনিক হচ্ছে কার্যকারিতাহীন **ওষুধ যা** রোগীকে মানসিকভাবে শুধু আশ্বাস দেয়। কথাগুলি লণ্ডন ইউনিভারসিটির ফার্মাকোলজির অধ্যাপক ডি. আর লরেন্স-এর। তাঁর লেখা ঔষধ সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকে (Clinical Pharmacology) মোটা হরফে কথাগুলি লেখা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্ল্যাসেবো (placebo) সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেওয়া দরকার। এটি এক ধরনের ওষুধই—তবে এটি শরীরে ওষধিগত কোন কাজ (Pharmacological action) করে না, শুধু রোগীর উপর মানসিক প্রভাব ফেলে। যেমন কেউ হয়ত মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। তাকে ব্যথা কমানর কোন ওষুধ না দিয়ে ক্ষতিকর নয় অন্য কোন কিছু (যেমন হয়ত গ্লুকোজ দিয়ে বানান) দেওয়া হল কিন্তু বলা হল যে এটি ব্যথা কমানরই খুব ভাল ওষুধ। এ ধরনের ওষুধকেই প্ল্যাসেবো (placebo) বলা হয় এবং দেখা যায় অনেক রোগীই এই বিশ্বাসের জোরেই সুস্থ বোধ করেন। অনিদ্রায় ঘুমের ওষুধ না দিয়ে প্ল্যাসেবো দিয়ে এভাবে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া যায়। ক্যানসারের তীব্র যন্ত্রণা থেকে শুরু করে অজস্র রোগেও এইভাবে প্ল্যাসেবোকে কাজে লাগান হয়। আমাদের মস্তিষ্কের কাজের ফল যে আমাদের মন, তার সাথে শারীরিক নানা সুবিধা-অসুবিধার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এভাবে বোঝা যায়। বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসী-অবতারদের দেওয়া নানা পদার্থ বা আশীর্বাদ, স্তোকবাক্য, ঠাকুরের পাদোদক-প্রসাদ, নানা অলৌকিক-স্বপ্নাদ্য 'ওষুধ' ইত্যাদির সাহায্যে সরলবিশ্বাসী কারোর রোগকষ্ট লাঘবের কিছু উদাহরণের পেছনে এই প্ল্যাসেবোর ব্যাপারটিই কাজ করে। টনিকও যেন 'পুঁজিবাদের পাদোদক'-ই!

ওষুধ নামে বাজারে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য রংচঙে টনিকগুলি কাজ করে এইভাবেই। টনিকের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় "এরা সেই সব পদার্থ যাদের সম্পর্কে আশা করা হয় যে তারা শরীরের জোর বাড়াবে,—কোন রোগ, দুঃখ, অতিরিক্ত কাজ বা খেলাধুলা, শারীরিক বা মানসিক অপ্রতুলতা ইত্যাদির কারণে যে জোর কমে গেছে এবং যার ফলে কেউ প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েন সামাল দিতে পারছে না। এই ধরনের জোর কমে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিশেষ কোন ত্রুটির কারণে এটি ঘটছে না, যে ত্রুটির জন্য বিশেষ চিকিৎসা রয়েছে।....(টনিক থেকে এ সব ক্ষেত্রে) উপকার পাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে প্ল্যাসেবো ধরনে এবং আশ্বাস, মানসিক সাহস বা স্তোকবাক্য-র বদলে ডাক্তার 'ওষুধের বোতল' ব্যবহার করছেন। বহু মানুষই কোন রোগভোগের পর (বা 'শরীর খারাপ'-এর জন্য) ডাক্তারের কাছ থেকে টনিকের আশা করেন এবং তাদের যদি বলা হয় যে এ টনিক খেয়ে যে উপকার তারা অনুভব করেন তা প্রকৃত পক্ষে এর কোন ওষধি কাজের জন্য আদৌ নয়, তবে তাঁরা এ ধরনের কথায় সন্দেহ প্রকাশ তো

করবেনই, এমনকি মানসিক আঘাতও পাবেন।"(Laurence)

এবং এইভাবেই মন্তব্য করা হয়েছে, "বিভিন্ন কোম্পানী অসংখ্য তথাকথিত টনিক বাজারে ছেড়েছে, যাদের মধ্যে সক্রিয় ওষুধও রয়েছে (highly active drugs)। এ গুলিকে পরিহার করা দরকার। টনিকের নামে ভিটামিনের অপরিণামদর্শী ব্যবহার সম্পর্কে প্রচার ওষুধ কোম্পানিগুলি ব্যাপকভাবেই করে এবং সরল বিশ্বাসী (gullible)-রা তা বিশ্বাস করে রোগীদের লিখেও দেন। কিন্তু ভিটামিন এ ও ডি (এভাবে দিলে) ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে (serious toxic effects)।" চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে এসব কথা লেখা থাকলেও কে তার পরোয়া করে? আর এর মূল নায়ক ওষুধ কোম্পানিগুলি। ব্যাপক প্রচারের জোরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও টনিকের উপর অচলাভক্তি ও আস্থা জন্মে গেছে। অনেকে চিকিৎসককেই নির্দেশ দেন টনিক লিখে দিতে। ব্যবসা বাড়ে ব্যবসায়ীর।

টনিক নামে বাজারে যেসব পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলিতে থাকে লৌহ ঘটিত ও অন্যান্য কিছু লবণ, নানা ভিটামিন, এলকোহল এবং আরো কিছু মালপত্র। এদের সম্পর্কে যে প্রথম কথা বলা যায় তা হল চরমভাবে এদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সস্তার সাধারণ খাবার-দাবার থেকেই তথাকথিত টনিকের উপাদানগুলি পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, প্রয়োজনহীন ব্যবহারে শারীরিক ক্ষতি ও ভিন্নতর উপসর্গ দেখা দেয়।

অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের প্রসঙ্গে আসে ভিটামিনগুলির কথা। শরীরের প্রয়োজনে যেসব খাদ্য আমাদের লাগে তা ৬ ধরনের:—প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, লবণ ও জল। এই শেষোক্ত তিনটির হজম করার দরকার হয় না, খাবার-দাবার থেকেই সরাসরি রক্তে মেশে। ভিটামিন আবার কয়েক ধরনের—এ, বি, সি, ডি, ই ও কে (A, B, C, D, ও K)। এদের মধ্যে ভিটামিন বি আবার নানা ধরনের—থায়ামিন (B-1), রাইবোফ্লোবিন (B-2), নায়াসিন, পিরিডক্সিন (B-6), প্যান্টোথেনিক এ্যাসিড, ফোলিক এ্যাসিড, সায়ানোকোবালামিন (B-12)। এ সবগুলিই শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তবে শাকসব্জি, ভাত, গম, মাছ, ডিম ইত্যাদি থেকে যথেষ্টই পাওয়া যায়,—যারা পেট পুরে ভাত-রুটি-শাকসব্জি খেতে পায় তাদের শরীরে ভিটামিনের অভাব ঘটে না। কিছু ভিটামিন-বি আমাদের শরীরে, অন্ত্রের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে তৈরী হয়। ভিটামিন-ডি আমাদের চামড়াতেই তৈরী হয় সূর্যালোকের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে। বাস্তবতঃ, কম ক্ষেত্রেই ভিটামিনের চূড়ান্ত অভাব ঘটে নানা রোগ হয়। তবু এ সব রোগের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিশেষ ভিটামিনের অবশ্য প্রয়োজন হয়, যেমন ভিটামিন-এ অভাব হয়ে রাত কানা রোগ, ভিটামিন ডি-এর অভাব হয়ে রিকেট, ভিটামিন-সি-এর অভাব হয়ে স্কার্ভি ইত্যাদিতে। কিন্তু তথাকথিত অজস্র

টনিকে একাধিক ভিটামিন জগাখিচুড়ি করে মেশান থাকে।

যেমন ভিটামিন-ই-এর অভাব মানুষের শরীরে আলাদাভাবে দেখা যায়নি। পরীক্ষাগারে নিছক গবেষণার স্বার্থে শুধু জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে করা পরীক্ষায় দেখা গেছে এর অভাবে গর্ভপাত বা শুক্রাশয়ের অপরিণতি ইত্যাদি ঘটে। তবু গ্ল্যাক্সো-র বেকাডেক্সামিন, ক্লুশিল্ড-এর হেম্‌প্রো, ট্যাবলেট্‌স-এর এ্যাস্টিমিন ফোর্ট ইত্যাদি নানা তথাকথিত টনিকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ভিটামিন-ই দেওয়া রয়েছে এবং বিনা প্রয়োজনে তার দামও খদ্দেরকে দিতে হচ্ছে পকেট থেকে। অন্যদিকে এই ভিটামিনের কারণে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। "আমেরিকার ৩৮ জন শিশুর মৃত্যু এবং আরো ৪৩ জন অপরিণত শিশুর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার জন্য চিকিৎসকেরা ই-ফেরল ভিটামিনকে দায়ী করেছেন। ই-ফেরল ভিটামিন-ই-এর ভিন্নতর রূপ।" (Script, World Pharmaceuticals News, 30th May, 1984)।

একইভাবে প্যান্টোথেনিক এ্যাসিড নামক ভিটামিনের অভাবও কোন মানুষের শরীরে এখনো অব্দি ঘটেনি। কারণ সব খাবারেই তা রয়েছে। তবু ফসফোমিন, রুব্রাপ্লেক্স, বেকাডেক্সামিন, নেও-ফেরিলেক্স, লিভোজেন, টেনোফস, সিক্সঅ্যাপ, অরহেপ্‌টোল, পারাপ্লেক্স ইত্যাদি অজস্র টনিকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে এটি দেওয়া থাকে। উদ্দেশ্য কি হতে পারে? নিছকই দাম এবং টনিকের 'গুণাবলীর' তালিকা বাড়ান। এই ধরনেরই আরেকটি বহুল ব্যবহৃত অপ্রয়োজনীয় ভিটামিন হল সায়ানোকোবালমিন (ভিটামিন বি-১২)। বর্তমানে জানা গেছে যে অতি বিরল ক্ষেত্রে এর অভাব ঘটে এবং আদৌ এটি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যার অংশ নয়।

ভিটামিন ছাড়া টনিকে রক্তাল্পতা দূর করার ভরসা দিয়ে লৌহ ঘটিত লবণ ও অন্যান্য নানা লবণ যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস বা ফসফেট, ইত্যাদি দেওয়া থাকে। ভিটামিন এ ও ডি-এর অভাবের মত রক্তাল্পতাও আমাদের মত দেশের, বিশেষতঃ গরীবদের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। কিন্তু এর সমাধান টনিক নয়, দুবেলা পেটপুরে সাধারণ খাবার-দাবার যেমন সবুজ শাক-সব্জি, ডাল, শস্যদানা, ফলমূল, গুড়, বাদাম, খেজুর ইত্যাদি। লোহার কড়াইতে রান্না করেও যথেষ্ট লৌহ জাতীয় লবণ পাওয়া যেতে পারে। আর রক্তাল্পতার অন্যতম বড় কারণ হুকওয়ার্ম ও নানা পেটের রোগ, মেয়েদের অতিরিক্ত মাসিক ঋতুস্রাব ইত্যাদি। কারণ নির্ধারণ না করে টনিক খাওয়ালে ফুটো কলসিতে জল ঢালার শামিল হবে—ফুটো দিয়ে পকেটের পয়সাই বেরিয়ে যাবে, শরীরের কাজে লাগবে না, মাঝখানে পয়সা লুটবে ওষুধ কোম্পানি। একইভাবে অজস্র টনিকে থাকে ফসফরাস—ফসফেট, গ্লিসারোফসফেট হিসেবে। এগুলিও কোন কাজে লাগে না। এর অভাবও অতি বিরল—এতই বিরল যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও খাদ্য-কৃষি সংস্থা (FAO) ফসফরাসের প্রয়োজনীয় মাত্রাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। আর যাঁরা অপুষ্টির

শিকার, দারিদ্র্যের কারণে খাদ্যহীনতার শিকার, তাদের ক্ষেত্রেও টনিক খাওয়াটা আরো বিপত্তিকর। টনিকের পয়সায় সাধারণ খাবারদাবার খেলেই কম দামে অনেক খাদ্যগুণ পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রচারের জোরে টনিকের মহিমা এমনই প্রতিষ্ঠিত যে, গরীব রিক্সাওয়ালা থেকে দিনমজুর অব্দি—টনিক খেতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

টনিকের একটি বোতল কিনতে যা দাম লাগে তার মধ্যে বোতল, লেবেল, রঙচঙে মোড়ক আর প্রচারের দামটাই সিংহভাগ। আসল মালের দাম অতি নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে সব ওষুধ দোকানই দোকানের অলঙ্কার হিসেবে রঙচঙে টনিকের বোতলগুলি সামনে সাজিয়ে রাখে। ইনসুলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন বা এই ধরনের আরো নানা জীবনদায়ী ওষুধ বাজারে না পাওয়া গেলেও—টনিক ঠিকই পাওয়া যাবে। কারণ এতে ওষুধ কোম্পানির লাভের হার সীমাহীন, ওষুধ দোকানগুলির কমিশনের হারও চড়া। আর এই কারণেই ১৯৭৯-৮৪ এই পাঁচ বছরে ভারতে আস্তানাগাড়া ১১টি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি প্রয়োজনীয় এ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন বাড়িয়েছে মাত্র ৫%, কিন্তু এই সময় অপ্রয়োজনীয় টনিকের উৎপাদন বাড়িয়েছে ৫০%। (India Today; 15.6.85)। ৫-৭ দিন খাওয়ার জন্যে ১০-১৫ টাকা দিয়ে টনিকের একটি বোতল হয়ত কেনা হল। এই টাকায় শাক-সব্জি, ফলমূল কিনলে ঐ বোতলে যা মাল রয়েছে তার বহু গুণ পুষ্টি পাওয়া সম্ভব। শুধু এই টাকায় যদি ঢেঁকিছাঁটা চালও ৩ কিলো কেনা যায়, তাহলেও একজন অন্তত এক সপ্তাহ পেটপুরে খেতে পারবেন সঙ্গে পাবেন ২৩২ গ্রাম প্রোটিন, ৪৫০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১১ গ্রাম ফসফরাস, ১০৫ মি.গ্রা. নায়াসিন ভিটামিন ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট। আর সঙ্গে তো একটু ডাল বা শাকসব্জি খাওয়াই হচ্ছে।

টনিকের মধ্যে ভিটামিন বা অন্যান্য যে সব অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকে, তার কিছু কিছু শরীরের পক্ষে সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনীয় হলেও টনিকে থাকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। উদাহরণ না বাড়িয়ে সায়ানোকোবালামিন ভিটামিনটির কথা শুধু বলা যায়। সারাভাই কোম্পানির বাজার চলতি ফসফোমিন আয়রণ নামক টনিকটি যদি সারাদিনে তিন চামচও খাওয়া হয় তবে তার থেকে পাওয়া যাবে ১৫ মাইক্রোগ্রাম সায়ানোকোবালামিন। অথচ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR, 1981) নির্ধারিত প্রয়োজনীয় মাত্রা হল ১ মাইক্রোগ্রাম, —হ্যাঁ, মাত্র ১ মাইক্রোগ্রাম, বয়স্ক নারীপুরুষ, গর্ভবতী মহিলা সবার ক্ষেত্রেই; বাচ্চাদের আরো কম, মাত্র ০.২ মাইক্রোগ্রাম। অন্য সব কিছুর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি প্রায় এই রকমই। বিনা প্রয়োজনে খেতে বাধ্য হওয়া এই সব দ্রব্যেরই দাম কিন্তু আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টনিকে যেসব মালকড়ি থাকে তাদের অনেকগুলি অপ্রয়োজনীয় হওয়ায়

প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ পেচ্ছাপ করে বের করে দেওয়ার জন্য পয়সা খরচ করা হচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, মনের ফূর্তিতে পয়সা লুটছে দুচার জন ব্যবসায়ী। ভিটামিন, নানা ধরনের লবণ এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু এদের কিছু কিছু এবং আরো নানা পদার্থও শরীরে বেশী গেলে শারীরিক ক্ষতিই হয়। মলিবডেনাম নামক ধাতুটি অতি নগণ্য মাত্রায় শরীরের পক্ষে প্রয়োজন। এর মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ হাড়ের বিকৃতি ঘটায়। অথচ ওয়ার্ণার কোম্পানি তাদের রেডিফ্লেক্স-এ সোডিয়াম মলিবডেট রেখেছে প্রতি ট্যাবলেটে ৬.মি.গ্রা। সাধারণ ভিটামিন এ বা ডি প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করলে নানা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। মাথার যন্ত্রণা, বমি, ক্ষুধামন্দ্য, বিরক্তভাব (ভিটামিন-এ বেশী হলে) থেকে শুরু করে হৃৎপিণ্ড ও কিডনির কাজ নষ্ট হওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি (ভিটামিন-ডি বেশী হলে) হতে পারে। বিশেষতঃ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন-ডি অতিরিক্ত পরিমাণ আরো বিপজ্জনক। এমনিতেই চামড়ায় ভিটামিন-ডি তৈরী হয়, তাছাড়া মাছ ও মাছের তেল, ডিম, মাখন ইত্যাদিতেও এটি পাওয়া যায়। এর প্রয়োজন বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্র ১০০ ইউনিট, গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে ৪০০ ইউনিট। এর অনেকটাই সূর্যালোক আর খাবারের সাহায্যে মিটে যায় এবং হিসাব করে খেলে এর অভাবও খুব একটা ঘটে না। অথচ ফ্রাংকো-ইণ্ডিয়ানের অমিল ক্যাল-এফ বা স্যাণ্ডোজ-এর অষ্টোক্যালসিয়াম সিরাপের প্রতি চামচে ভিটামিন-ডি রয়েছে ২০০ ইউনিট। সারাদিনে অন্ততঃ তিন চামচ খেলেও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ শরীরে ঢুকছে। একই ছবি ভিটামিন-এ-র ক্ষেত্রেও। অথচ এই মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণের কারণে মাথার যন্ত্রণা, ক্ষুধামন্দ্য বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি দেখা দিলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে টনিক খাওয়াকে প্রায় কোন রোগী বা চিকিৎসকই দায়ী করেন না, বরং এসবের জন্যে আবার টনিক খাওয়া চলে। লৌহ-ঘটিত লবণ যুক্ত টনিক খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটের নানা রোগ, এমনকি পেপটিক আলসার পর্যন্ত হয়ে যায়। সুনির্দিষ্টভাবে রক্তহীনতা প্রমাণিত হলে এবং জরুরীভাবে প্রয়োজন মনে করলে তবেই, এর ব্যবহার উপযুক্ত সর্তকতার সঙ্গে করা দরকার। অথচ এ ধরনের বহু টনিকই অনেকে নিজেরাই কিনে খান বা ডাক্তাররাও 'অধিকন্তু ন দোষায়' মনে করে নির্বিবাদে একটা লিখে দেন।

প্রায় সব টনিকে আর একটি ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, এলকোহল বা মদ। এর কারণেই আপাত ভাল লাগার কিছু ব্যাপার ঘটে বলে মনে হয়। কিন্তু এটি মৃদু নেশার সৃষ্টি করে এবং মূলত এর কারণেই সাধারণ মানুষ এই নির্দোষ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্মত নেশায় আসক্ত হয়ে টনিকের উপর বেশী বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। লিভারের রোগ ও পেটের—বিশেষ করে পাকস্থলীর রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এলকোহল বা মদের ভূমিকা রয়েছে। অধিকাংশ টনিকেই যে মদ থাকে তা বীয়ার-এর থেকে অনেক বেশী, প্রায় কড়া হুইস্কি, রাম, জিন, ব্রাণ্ডির

কাছাকাছি। বীয়ার-এ শতকরা মাত্র ৫-৬ ভাগ এলকোহল থাকে। অথচ সারাভাই-এর ফসফোমিন আয়রনে বা স্যাণ্ডোজ-এর স্যাণ্টেভিনিতে এলকোহল থাকে শতকরা ১১ ভাগ (by volume)। র‍্যানবেক্সি-র র‍্যানবেক্সিজ টনিক-এ আরো বেশী, শতকরা ১২ ভাগ (by volume)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস-এর ক্যালরন-এ থাকে একটু কম ৯.৫% —তবে স্পষ্টতঃই বীয়ারের থেকেও বেশী। এসকেল্যাব-এর নিউরোফসফেট সিরাপেও থাকে প্রায় ১০%,—এর প্রতি ৫ মিলি-এ ৯৫% এলকোহল থাকে ০.৫ মিলি। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। অন্যান্য সব টনিকেই মদ কম-বেশী থাকে। যাঁরা মদ্যপানকে ক্ষতিকর ও উচ্ছন্নে যাওয়ার অন্যতম উপায় বলে মনে করেন, তাঁরা টনিক খেয়েই উচ্ছন্নে যেতে পারেন।

টনিক নামে প্রচলিত এই সব জগাখিচুড়ির বিপদ সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইতেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। বলা হয়েছে, "লৌহ-ঘটিত লবণ, ফোলিক এ্যাসিড, সায়ানোকোবালামিন ও অন্যান্য ভিটামিন, লিভার ও পাকস্থলীর নির্যাস ইত্যাদি যে সব পদার্থ রক্ত তৈরীর জন্য কোন না কোন কাজে লাগে তাদের এক সাথে মিশিয়ে মুখে খাওয়ানর ওষুধ তৈরী করে বাজারে ছাড়া হয়। সাধারণতঃ এই সব পদার্থ যে পরিমাণে থাকে তা রক্তাল্পতা সারাতে পারে না, কিন্তু রোগ নির্ণয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ('infficient to cure anaemias, but sufficient to interfere w'th diagnosis')।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের পাশাপাশি এরা মারাত্মক বিপদও ডেকে আনে যা নিচের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। এক রক্তাল্পতার রোগিণীকে লৌহ-ঘটিত লবণ যুক্ত ওষুধ দেওয়া হয়েছিল যাতে এনিউরিন, ফলিক এ্যাসিড ও যকৃতের নির্যাস মেশান ছিল। 'রোগিণীর শরীর খুব ভাল হল, খিদে স্বাভাবিক হয়ে গেল ও ওজন বাড়ল। কিন্তু তাঁর দু'পা দ্রুত অসাড় হতে থাকল...একবার আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন এবং রক্ত জমে বিষিয়ে যাওয়ার জন্য (infected hematoma) হাসপাতালে ভর্তি হলেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় ১০ দিনের পর দেখা গেল রোগিণী হাঁটতে বা উঠতে পারছেন না... তাঁর দু'পায়ের প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছিল... পরীক্ষা করে পাকস্থলী থেকে এ্যাসিড ক্ষরণনাহওয়াররোগ (histamine fast achlorhydria) ধরা পড়ল।' মাঝারি রক্তাল্পতা ছিল (moderate macrocytic amaemia)।....সৌভাগ্যক্রমে ভিটামিন-বি-১২* দিয়ে রোগিণীর অবস্থা ভাল হল। কিন্তু এ ধরনের দুর্ঘটনা আদৌ ঘটার কোন প্রয়োজন ছিল না।" (Laurence's Pharmacology; মূল সূত্র British Medical Journal) ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য এ ধরনের টনিক বা ট্যাবলেটগুলি বেশ রঙচঙে,

* যার অভাবে subacute combined degeneration of the spinal cord হয়। এ ধরনের রোগীদের পাকস্থলী থেকে ভিটামিন বি-১২ শোষিত হয়ে শরীরের কাজে লাগতে পারে না, তাই এর অভাব দেখা দেয়।

আকর্ষণীয় করে ছাড়া হয়—যা বাচ্চাদেরও আকৃষ্ট করে ও এর থেকেও বিপদ ঘটে। এছাড়া বাচ্চাদের হাতের মধ্যে এই ধরনের বিপজ্জনক পদার্থ থাকলে এমনিতেও তারা তা খেয়ে ফেলতে পারে। এভাবে এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা থেকে এ ধরনের বিপদের আঁচ পাওয়া যেতে পারে। "....১৯ মাস বয়সের একটি বাচ্চা মেয়ে ১৫-১৬টা লৌহ ঘটিত লবণ যুক্ত (ferrous sulphate) ট্যাবলেট খেয়ে বমি করতে শুরু করেছিল। হাসপাতালে নিয়ে যেতে নুন-জল দেওয়ায় সে আবার বমি করে। হাসপাতালে বেড খালি না থাকায় ফেরত পাঠিয়ে অন্য হাসপাতালে যেতে বলা হল। এখানে বাচ্চার মাকে বলা হল যে ট্যাবলেটগুলি বিষাক্ত কিছু নয়, বাচ্চাদের কোন ক্ষতিই হবে না। বাচ্চাটির হেঁচকি উঠছিল কিন্তু বমি ছিল না। মাকে বলা হল বাচ্চাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ও দুধ খাওয়াতে। মা এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বাড়ি ফেরার পথে আরেক ডাক্তারের কাছে গেলেন। তিনি বাচ্চাকে কম লেবুর রস খেতে দিয়ে বললেন—বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে। মা তখন বাচ্চাটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন, বিছানায় শুইয়ে গেলেন কমলালেবুর রস বানাতে। ফিরে এসে দেখলেন বাচ্চাটি মারা গেছে—ট্যাবলেট খাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যে এই মৃত্যু ঘটল।" (সূত্রঃ ঐ) (এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে পাকস্থলী শোধন করে ডেসফেরিঅক্সামিন নামে একটি ওষুধ দেওয়া যায়। পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।)

সব মিলিয়ে টনিক খাওয়ার প্রবণতাটি অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, ক্ষতিকরও। এর থেকে বড় যে ক্ষতি হয় তা হল অর্থ ব্যয়, যে অর্থে সত্যিকারের পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যেত। অন্য ক্ষতি হল উপাদানগুলির মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণের জন্য—যদিও প্রায়শঃই সেটিকে টনিকের কারণে হচ্ছে বলে বোঝা যায় না। আর অল্প পরিমাণ খেলে পেচ্ছাপ-পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েও শরীরকে কিছুটা বাঁচায়। প্রচারের জোরে ওষুধ কোম্পানিগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষতঃ আমাদের মত গরীব দেশে, টনিক সম্পর্কে মোহের সৃষ্টি করেছে। গুডম্যান-গিলম্যান-এর বইতে (The Pharmacological Basis of Therapeutics) তাই মন্তব্য করা হয়েছে "ভিটামিনের মত অন্য কোন ওষুধ যথা সম্ভব আর নেই যাকে নিয়ে এত হাতুড়েগিরি, এত ভুল বোঝা ও বোঝান আর অপব্যবহার চলে ....।" অন্যদিকে ভারতের মত গরীব দেশে দারিদ্র্যের কারণে ভিটামিন ইত্যাদির অভাব তুলনামূলক-ভাবে বেশী, তাই সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝান আর প্রতারণা করার সুযোগও এখানে বেশী। যেমন ৬ বছরের কম বয়সী ভারতীয় বাচ্চাদের মধ্যে ভিটামিন-এ-এর অভাব শতকরা ১০ জনের ক্ষেত্রে ; গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে বিশেষতঃ গরীব পরিবারের মায়েদের শতকরা ৫০-৬০ ভাগই রক্তহীনতার

* Indian Council of Medical Research, 1977 (Techon.Rep.Ser. No.26 ও Bulletin., Dec. 1977)

শিকার।* ভিটামিন বা লৌহ ঘটিত লবণ নিষিদ্ধ কিছু নয়। ঐ ধরনের ক্ষেত্রে যেখানে এদের অভাবের কারণে রোগকষ্ট হচ্ছে বলে প্রমাণিত, সেখানে এগুলিকে অবশ্যই দিতে হবে, যেমন মুখে ঘা (থায়ামিন), রিকেট (ভিটামিন-ডি), স্কার্ভি (সি), রক্তহীনতা (hypochromic anaemia) (লৌহ ঘটিত লবণ), সুষুম্নাকাণ্ডের বিশেষ রোগ (ভিটামিন বি-১২) ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত সমাধান টনিক নয়, প্রয়োজন আর্থিক ও সার্বিক স্বচ্ছলতা, উপযুক্ত খাদ্য, শিক্ষা ও সচেতনতা। আশু সমাধান হিসেবে সাধারণ কম দামী খাবার-দাবার থেকেই কিভাবে ভিটামিন ইত্যাদির অভাব এড়ানো যায় তার ব্যাপক প্রচার করা যায়। তা না করে সরকারী অনুমোদন নিয়ে টনিক খাওয়ানর অর্থ চক্রবৃদ্ধি হারে শোষণ ও প্রতারণাকে বাড়িয়ে তোলা।

প্রতারণা স্পষ্ট হয় ওষুধ কোম্পানির মিথ্যা কথা বলায়। সব টনিক সম্পর্কে বলা হয় তা শরীর ভাল করে, ক্ষুধা বাড়ায়, অপুষ্টিজনিত রোগ সারায়, বৃদ্ধ-গর্ভবতী-মহিলা-শিশুদের পক্ষে উপকারী, দুর্বল বা অস্ত্রোপচারের পরে সেবনীয় ইত্যাদি। কিন্তু এর পেছনে বিজ্ঞান সম্মত কোন তথ্য নেই। যেমন থায়ামিন বা ভিটামিন বি-১ সম্পর্কে বলা হয়েছে, * "কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত থায়ামিনকে (অর্থাৎ টনিকে যা মেশান হয়) আলাদাভাবে বা অন্য ভিটামিনের সঙ্গে সাধারণ টনিক বা ক্ষুধা বাড়াবার জন্য দেওয়া হয়, কিন্তু এর পেছনে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই এবং এখন বাতিল করা হয়েছে। নার্ভের রোগে (যেমন polyneuropathy) প্রায়শঃই ভিটামিন দেওয়া হয়, কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে ভিটামিন বি-১, বি-১২ বা অন্য কোন জানা ভিটামিনের অভাবে নার্ভের রোগ হয় না। এদের সাহায্যে চিকিৎসার মানসিক সান্ত্বনাদায়ী (placebo) ভূমিকা ছাড়া সম্ভবত অন্য কোন ভূমিকা নেই, তবু ব্যাপারটিকে নিন্দিত করা যায় না... ।" সত্যিকারের কোন কাজ বা বিজ্ঞানসম্মত কোন ভূমিকা না থাকলেও তবু নার্ভের রোগে এই ধরনের ভিটামিন বা টনিককে মিথ্যাপ্রচারের মাধ্যমে মহিমান্বিত করা হয়, বহু চিকিৎসকই তা অনুসরণও করেন। চিকিৎসক ও রোগীদের প্রতারিত করার জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলি আবার এ ধরনের মালের নামের আগে বা পরে নার্ভ বা মস্তিষ্কের সমার্থক 'নিউরো' বা 'এনকেফা' ইত্যাদি কথা জুড়ে দেয়, যেমন এ্যালেম্বিক-এর নার্ভিটোন, এসকেল্যাব-এর নিউরোফসফেট, জার্মান রিমেডি-র নিউরোট্রাট, মার্ক-এর নিউরোবায়ন বা এনকেফাবল, খাণ্ডেলওয়াল-এর নিউরোপলন-১২ ইত্যাদি। নার্ভ বা মস্তিষ্কের উপর কাজ করবে বলে আরো মিথ্যা কথা বলা হয় যে এরা স্মৃতিশক্তি বাড়াবে, নার্ভের ক্ষমতা বাড়াবে ইত্যাদি।

* Human Nutrition & Dietetics (Davidson et al) Churchill Livingstone, London.

এ ধরনের চরম প্রতারণার ব্যবসায়িক আরেকটি নাম ব্রেনোলিয়া। ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি বাড়ান ও শরীর সুস্থ রাখার প্রলোভন দেখিয়ে এ ধরনের পদার্থ প্রচারের জোরে বিক্রি করা হয়। তাই বিশেষতঃ পরীক্ষার আগে এদের বিক্রি বেড়ে যায়—এই নির্বোধ আশায় যে, এ সব খেলে স্মৃতিশক্তি বেড়ে যাবে, শরীরও ভাল থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এ সব মালকড়িতে স্মৃতিশক্তি আদৌ বাড়ে না, বড় জোর মানসিক কিছু 'শক্তি' পাওয়া যায়। সাধারণভাবে উপযুক্ত খাবার- দাবার, নিরুপদ্রব পরিবেশ আর শরীর রোগ মুক্ত থাকলে স্মৃতিশক্তিও বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকই থাকে। বিরল যে সব রোগে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তাদের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করা দরকার। আর কিছু ক্ষেত্রে নার্ভকোষে পরিবর্তনের জন্য স্মৃতিশক্তি কমে যেতে থাকে (Alzeimers' disease)। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ব্যাপার ঘটে। এর কোন ওষুধ এখনও জানা নেই। তবে এটি জানা গেছে যে তথাকথিত কোন নার্ভ টনিক, ভিটামিন, হরমোন ইত্যাদি স্মৃতিশক্তি লোপ বা ক্রমক্ষয়মান কোষের উন্নতির জন্য আদৌ কার্যকরী নয়। ("Nerve tonics, vitamins and hormones are of no value in checking the course of dementia or in regenerating decayed tissue"— Harrison's Principles of Internal Medicine)

বাংলাদেশেও সম্প্রতি টনিকের নামে এ ধরনের ধোঁকাবাজি মাল, ভিটামিন-মিনারেল ইত্যাদির জগাখিচুড়ি বাতিল করা হয়েছে। যেমন ফাইজার-এর বিকোসুল ক্যাপসুল বাতিল করে বলা হয়েছে "ভিটামিনের মিশ্রণ। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, অর্থের অপচয়।" গ্ল্যাক্সোর হেলিব অরেঞ্জ সিরাপ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে "অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়।" এদেরই বেকাডেক্স ড্রপস, ক্যালসি অস্টেলিন ইত্যাদি সম্পর্কেও বলা হয়েছে, "ভিটা-মিনের অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ। বেশী দাম নেওয়ার ফন্দি। খাদ্যের ভিটামিনই যথেষ্ট। অতিরিক্ত ভিটামিন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়", ইত্যাদি। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ ধরনের অপচয়, ক্ষতি আমাদের দেশে তো চলছেই—মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ীর স্বার্থে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আর মানুষের অসচেতনতার ফলে।

অপ্রয়োজনীয়, কখনো বা ক্ষতিকর, এই সব টনিকগুলি কিভাবে তৈরী হয়, কিভাবে তাদের চড়া দাম করা হয় আর কিভাবে তা নিয়ে ব্যবসা ও প্রতারণা চলে তা প্রয়াত সোমনাথ লাহিড়ীর একটি পুরনো গল্প 'ফাউ'-তে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সব শেষে সেটির মূল অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ সামলান গেল না। (শুধু টনিক নয়,— হরলিক্স, বেবীফুড, প্রসাধনী দ্রব্য, চুল ও চামড়ার জন্য নানাবিধ ওষুধ ইত্যাদি ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই গল্পটি প্রযোজ্য।)

"ঔষধ প্রস্তুতের বিরাট প্রতিষ্ঠান। অধিকারী ডাঃ রমাকান্ত বসু, এম, বি (ওয়াশিংটন) আর্য্যুবেদশাস্ত্রী, ভিষগরত্ন ইত্যাদি। পাশ্চাত্য রসায়ন এবং আর্য্যুবেদ—উভয় শাস্ত্রেই ইঁহার সমান ব্যুৎপত্তি। দেশী ফল ফুলের দ্রব্যগুণের সহিত বিদেশী ঔষধের জরাহরণ ক্ষমতা সংযুক্ত করিয়া তিনি সম্প্রতি এক মূল্যবান সঞ্জীবনী সুধা প্রস্তুত করিয়াছেন। আধুনিক রুচি অনুসারে নাম দিয়েছেন Elixir de Vine.

রবি তাঁহার কস্টিং ক্লার্ক। নতুন লোক বলিয়া রমাকান্ত বাবু নিজেই তাহাকে লইয়া কষ্টিং করিতে বসিয়াছেন। এলিক্সার ডি ভাইনের দাম ঠিক করার জন্য তাহার পড়তা হিসাব ঠিক করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে এইরূপ :

—দেখ রবি, কস্টিং ঠিক ক'রে নিলে দাম ধার্য করতে সুবিধা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাম সম্বন্ধে আগে থেকেই একটা আন্দাজ থাকা দরকার। জিনিসটার জন্যে খরিদ্দার কত দূর পর্যন্ত দাম দিতে পারে এই হল আসল কথা। খরিদ্দারের ইচ্ছাই সব, তার উপর কোন কথা চলে না, বুঝেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কলেজে অর্থনীতির বইতেও তাই পড়েছি—The Consumer is sovereign.

—Exactly ! বেশ, তা হলে এক বোতল এলিক্সার কত দামে বিক্রি হতে পারে মনে কর ?

—আমার পক্ষে বলা শক্ত, আমি তো এ বিষয়ে কিছু জানি না।

—তা হোক, আন্দাজেই বলো না !

—২ টাকা হতে পারে কি ? না খুব বেশী বললাম ?

—দূর ! একি হাতুড়ে বদ্যির সালসা যে ২ টাকায় ছাড়তে হবে ! Elixir de Vine is Elixir Divine — ৬ টাকায় বেচলেও পড়তে পাবে না। এইটা মনে রেখে কস্টিং শুরু করো।

—আচ্ছা স্যর। প্রথমে কি ধরব ? ক্ষয়ক্ষতি ভাড়া ?

—ধরতে পারো, তবে ওগুলো বেশী নয়। Elixir তৈরীতে যন্ত্রপাতি বিশেষ লাগে না তো—ক্ষয়ক্ষতি এক আনা ধরলেই যথেষ্ট। আর ভাড়াটা অন্যসব মালের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাবে—ওটাও এক আনাই ধর। তার সঙ্গে transport-ও ধরো এক আনা।

—তাই ধরলাম। তারপর ? Production Cost-এর বড়ো item-গুলোই না হয় প্রথমে বলুন স্যর।

—বলছি। প্রথম ধরো বিজ্ঞাপন।

—একেবারে প্রথম ?

—নিশ্চয় ! বিজ্ঞাপন না থাকলে তোমার জিনিস বিক্রিই হবে না যে। ভালো

জিনিস চিনিয়ে দিলে তবেই না consumer তার sovereign will প্রকাশ করতে পারবে! তাই advertisement-ই first charge.

—Charge-টা কত পড়বে ?

—বাৎসরিক turnover যদি লাখ টাকা ধরি, তা হলে হাজার কুড়ি তো বিজ্ঞাপনে যাবেই। মানে ২০ পার্সেন্ট of sale price।

—এত ?

—হ্যাঁ, তাই। advertisement-এর দর কি রকম চড়ছে দেখছ না? ২০ percent না হলে কোন Publicity-ই হবে না।

—তার মানে ১ টাকা তিন আনা, কেমন ? তাই লিখলাম স্যার। আর কী বড়ো আইটেম আছে ?

—বড়ো আইটেম ? ধরো.............বোতল।

—বোতল !

—হ্যাঁ ! 'আগু দর্শনধারী, পিছু গুণ বিচারি'—খরিদ্দার মনস্তত্ত্বের এই হল গোড়ার কথা। Phial-টা দেখলেই যেন কিনতে ইচ্ছে করে। ওর পড়তা বার আনা।

—এত দাম ?

—হবে না ? স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরী করাচ্ছি বোহেমিয়া থেকে। আমার নিজের ডিজাইন।

—কি রকম দেখতে একটু বলুন না স্যার, খুব interesting মনে হচ্ছে।

—শ্যাম্পেন গ্লাস দেখেছো ? অনেকটা সেই রকম। Circular base-এর ওপর একটা slender stem —সেখান থেকে ধীরে ধীরে spread out করছে — যেন ডাঁটির উপর ফুল। Colourless, ভেতরে sparkling golden liquid—দেখলেই মনে হবে অমৃত, drink for the gods. না কিনে উপায় থাকবে ?

—শুনেই আমার লোভ হচ্ছে স্যার।...... আচ্ছা phial লিখলাম বার আনা। তারপর কি স্যার ? প্যাকিং কাগজ ?

—না, কাগজ টাগজ থাকবে না। শুধু একটা ছোট্ট, wonderful লেব্‌ল—the best of paper and best of printing. ওর জন্যেও বোহেমিয়াতেই অর্ডার দিয়েছি। কস্ট্‌ পড়বে তিন আনা।

—আর বাক্স ?

—বাক্স দিয়ে কি সৌন্দর্য ঢেকে দেব ? বাক্স ফাক্স কিছু না। ঐ লেব্‌ল, ঐ পাত্র আর ভেতরে ঐ তরল সোনা—সবে মিলে it 'll be a song। হুঁ লেব্‌ল খরচ একটু বেশী পড়ছে সত্যি—কিন্তু সস্তা জিনিস দিয়ে খরিদ্দার ঠকানো ঠিক নয়—make him pay, but give him quality.

— কস্টিং-এর আর কি বাকী রইল স্যার ?

—লেবার আর এস্ট্যাবলিশমেন্ট তো ধরা হয়নি। ক'জনই বা লোক খাটে, তবু

মোটা টাকা বেরিয়ে যায় এই আইটেমে। ওটা আমার হিসাব করা আছে— মাইনা ইত্যাদি চার আনাই লেখো।

—লিখেছি। আর কিছু নেই তো?

—বাঃ কমিশন কোথায় যাবে? আমাদের মালের demand বেশী বলে আমরা অবিশ্যি কমিশন কম দিই। তাহলেও ছয় আনা লাগবেই।

—আচ্ছা, ছয় আনা কমিশন।

—ব্যস, এইবার সব আইটেম যোগ করো, দেখি কস্টিং কত দাঁড়ায়।

—একটু চেক ক'রে নিন স্যার : ক্ষয়ক্ষতি এক আনা, ভাড়া ও যানবাহন দুই আনা, কমিশন ছয় আনা, মাইনা ইত্যাদি চার আনা, লেব্‌ল তিন আনা, বোতল বার আনা, বিজ্ঞাপন এক টাকা তিন আনা। যোগ করলে মোট দাঁড়াচ্ছে দুই টাকা পনর আনা।

—Excellent! ৬ টাকা দরে লাভ থাকবে ১০০ পার্সেন্ট —খুব কমও নয়, খুব বেশীও নয়—fairly reasonable profit. তুমি তা হলে যাও, price list-এ ঐ দামই ছাপতে বলো।

কাগজপত্র গুটাইয়া চলিতে চলিতে রবি কিন্তু হঠাৎ থামিয়া পড়িল।

—কি হে, আবার দাঁড়ালে কেন?

—আসল জিনিসের খরচাই যে ধরা হয়নি!

—কেন, কি বাদ পড়ল?

—Raw Materials স্যার। যে মাল মশলা থেকে আপনার এলিক্সার তৈরী হবে সে সবের খরচাই তো কস্টিংয়ে আসে নি।

—ওঃ, এই কথা! ওতে কিছু আসে যায় না। Raw Materials আর কি? দু পয়সার ভেলি গুড় আর একটুখানি তাড়ির গাদ—ব্যস! কস্টিংয়ে না ধরলেও বিশেষ তফাৎ হবে না।

—কিন্তু elixir de vine-এর vine-টা?

—আধখানা মনাক্কা—per bottle, ওটা খরিদ্দারকে ফাউ দিলাম। আচ্ছা, এবার তুমি যাও।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

দামী 'টনিক' না খেয়ে সাধারণ খাবার খান।
কয়েকটি সাধারণ খাবারে কয়েকটি পুষ্টি মানের পরিমান :-

খাবারের নাম (১০০ গ্রামে)	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	লোহা (মি.গ্রা)	ক্যারোটিন (ভি.-এ) (মাইক্রো গ্রা.)	থায়ামিন (বি-১)(মি.গ্রা.)	ভিটামিন-সি (মি.গ্রা)
আটা	১২১	৪৮	১১.৫	২৯	০.৪৯	০
কলমি শাক	২.৯	১১০	৩.৯	১৯৮০	০.০৫	৩৭
মূলা শাক	৩.৮	২৬৫	৩.৬	৫২৯৫	০.১৮	৮১
ওল	১.২	৫০	০.৬	২৬০	০.০৬	০
ট্যাড়শ	১.৯	৬৬	১.৫	৫২	০.০৭	১৩
বেগুন	১.৪	১৮	০.৯	৭৪	০.০৪	১২
উচ্ছে	২১	২৩	২	১২৬	০.০৭	৯৬
পেয়ারা	০.৯	১০	১.৪	০	০.০৩	২১২
পাকা পেঁপে	০.৬	১৭	০.৫	৬৬৬	০.০৪	৫৭
পুঁটি মাছ	১৮.১	১১০	১	০	০	১৫
মৌরলা মাছ	১৮	৫৫০	০.৯	০	০	৫
মুসুর ডাল	২৫.১	৬৯	৪.৮	২৭০	০.৪৫	০
পাঁঠার মাংস	২১.৪	১২	০	০	০	০
ইত্যাদি।						

(০ = জানা নেই বা অনির্ধারিত)

স্পষ্টতঃই এ ধরনের সাধারণ পাঁচমেশালি খাবার-দাবার থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টি যথেষ্টই পাওয়া সম্ভব। বেশী দামী টনিক তো নয়ই, এমনকি বেশী দামী খাবারেরও খুব একটা প্রয়োজন নেই।

(৮)

লিভার টনিক

এ আরেক ধাপ্পা। লিভার বা যকৃৎ নিঃসন্দেহে শরীরের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। চর্বি জাতীয় খাদ্য শরীরের কাজে লাগান, চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে-এর শোষণ, নানা দুষিত পদার্থের শোধন প্রভৃতি অজস্র কাজ লিভার করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে লিভার সম্পর্কে প্রায়শঃই ভুল ধারণা রয়েছে। এই সুযোগে কিছু ওষুধ কোম্পানি লিভার টনিক খাইয়ে কল্পনাতীত অর্থোপার্জন করে। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে মনে হয় হিমালয়ান ড্রাগ কোং-এর লিভ-৫২। এছাড়া আছে স্ট্যাডমেড কোম্পানির টোনোলিভার, বহুজাতিক সংস্থা ফ্র্যাংকো ইণ্ডিয়ানের স্টিমুলিভ ইত্যাদি।

নানা গাছগাছড়ার নির্যাস বানিয়ে এসব দ্রব্য তৈরী। কৃত্রিম নানা রাসায়নিক পদার্থের বদলে, ভারতের ঐতিহ্যশালী আয়ুর্বেদের প্রতি সাধারণ মানুষের সম্ভ্রমকে কাজে লাগিয়ে বেশ দু'পয়সা কামান চলে। লিভ-৫২ বা এই জাতীয় তথাকথিত ওষুধের গুণাবলীতে কিনা বলা হয়—এ খিদে বাড়ায়, মদ্যপানজনিত যকৃতের ক্ষতি রোধ করে, অপুষ্টি ও না-বাড়া বাচ্চাদের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়, যকৃতের প্রদাহে যকৃৎকে রক্ষা করে, বমি-বমিভাব ও চুলকানি বন্ধ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা শব্দাবলীকে ব্যবহার করে এর ব্যাপক প্রচার চলে। প্রতীকী হিসেবে লিভ-৫২-এর কথাই বলা যায়। বলা হয়েছে এটি "normalises the appetite—satiety rhythm", "Alcohol harms, Liv-52 helps", "Liv-52 proves a valuable adjuvant for treating malnourished children", "assures sustained growth in underweight and malnourished children", "in infective hepatitis many forms of therapy (including) steriods have proved ineffective, but Liv-52 succeeds", "stops nausea, vomiting, pruritus etc.", ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন নাম করা চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানীকে হাত করে তাঁদের দিয়ে Liv-52-এর ওপর 'গবেষণা' করান হয়, আর এই তথাকথিত গবেষণার (অবশ্যই তা Liv-52-এর সপক্ষে) তথ্যগুলিকে ব্যাপক প্রচার করা হয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির উল্লেখসহ আপাত দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক কারণে বিশ্বাসযোগ্য নানা তথ্যাবলী দিয়ে এই মালের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এই সব প্রচার অনুযায়ী Liv-52-এর কাজ ততটা প্রয়োজনীয় আদৌ নয়, যার জন্য পয়সা খরচ করে একে কিনতে হবে ও খেতে হবে। ব্যবসার খাতিরে কোম্পানিটি জঘন্য প্রচার করে যে, এলকোহল বা মদ খাওয়ার অপকারিতাটা এর সাহায্যে কেটে যাবে। ব্যাপারটা এমনই, মদ যতখুশি খান কিন্তু সাথে Liv-52-টা খান, তাহলে আর বিপদ হবে না। মদ্যপদের মধ্যে বিক্রি বাড়ান এবং যাঁরা মদের অপকারিতার ভয়ে মদ খান না, কিন্তু ছুঁকছুঁক

করেন, তাঁদের মদ্যপ করে তোলার এমন হীন প্রচেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। প্রচারের বহর দেখে মদ কোম্পানিগুলির সাথে যোগসাজসের ব্যাপারটায়ও সন্দেহ জাগে। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকৃত বইতে মদ্যপানজনিত লিভারের ক্ষতির জন্য (alcoholic hepatitis) সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে চিকিৎসার কথা বলা হয়, তা হল মদ্যপান বন্ধ করা ; চরম অবস্থা না হলে (absence of hepatic coma), প্রোটিনযুক্ত পুষ্টিকর খাবার দাবার, দৈনিক ২০০০-৩০০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য এবং বড়জোর কিছু ভিটামিন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে "রোগীর স্পষ্টভাবে এটি বোঝা উচিত যে পুষ্টিকর খাবার বা অতিরিক্ত ভিটামিন, কোনটিই পুনরায় মদ্যপানজনিত লিভারের ক্ষতিকে রোধ করতে পারে না। তাই মদ সম্পূর্ণ বন্ধ করাই দরকার (absolutely forbidden)"। কোথাও লিভ-৫২ বা এই ধরনের অন্য কোন ওষুধ, কোন গাছগাছড়ার নির্যাস—কোন কিছুরই উল্লেখ নেই। (১) Liv-52 উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করলেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আরো নানা ওষুধও কিন্তু নানা কোম্পানি বাজারে ছেড়েছে। এদের দুটির কথা আগে বলা হয়েছে। এছাড়া আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার লিভোটোন, গ্রিফন-এর সর্বিলিন, সায়ানামিড-এর ডেলফিকল, স্ট্যাণ্ডার্ড-এর লিভার্জেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। লিভ-৫২, স্টিমুলিভ, লিভার্জেন, লিভোট্রিট, মায়োলিভ, টেফ্রোলি ইত্যাদি নানা ওষুধেই উপাদান হিসাবে থাকে নানা গাছগাছড়ার নির্যাস। যেমন কাল মেঘ, ভৃঙ্গরাজ, কুলেখাড়া, হলদি, দারুহরিদ্রা, আমলা, বহেড়া, জোয়ান, মেথি, বেল, রাধুনি, বেনারমূল ইত্যাদি সব এক সাথে জগাখিচুড়ি করে মেশান। **অতি অল্প মাত্রায় এই ধরনের ভেষজ শরীরে কিছু উপকার হয়ত করে, বিশেষতঃ পেটের নানা উৎসেচক (enzyme) ক্ষরণকে উত্তেজিত করে হজমের কিছু সাহায্য করে। কিন্তু এগুলির কোনটিই যকৃতের স্বাস্থ্য ভাল করে তার কোন প্রমাণ নেই।**

ক্ষিদে বাড়ানর জন্য খাওয়ার আগে তেতো খাবার (bitters) খাওয়ার কথা বলা হয়। লিভারের এই সব তথাকথিত টনিকগুলিও নাকি খিদে বাড়ায় এবং এগুলিতে ঐসব পদার্থ থাকে। কিন্তু ভেষজ বিজ্ঞানের বইতে মন্তব্য করা আছে এদের ওপর বিজ্ঞানসম্মত কোন পরীক্ষাই হয়নি ("not been scientifically investigated")। (Laurence's Pharmacoloov)।

লিভার থেকে বেরোয় পিত্ত (bile)—এতে থাকে বাইল সল্ট ও বাইল এ্যাসিড। লিভার টনিক নামে বাজারে ছাড়া পদার্থগুলিতে এগুলিও মেশান থাকে। বাইল সল্ট শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক। লিভার থেকে কোন বাধার কারণে (পাথর, টিউমার বা ফিসচুলা হয়ে) যখন পিত্ত অন্ত্রের মধ্যে আসে না, একমাত্র তখনই বাইল সল্ট মুখ দিয়ে দেওয়া যায় ; যখন তখন নয়। কারণ এর ফলে রক্তে বাইল সল্টের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ভিন্নতর ক্ষতিসাধন করে। অনেক 'ওষুধে' আবার

(১) Harrison's Principles of Internal Medicine.

বাইল এ্যাসিডও মেশান থাকে। কিন্তু এটি হজমের কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না ("does not materially help digestion"—Laurence)। চিকিৎসার কাজে এর কার্যকারিতাও প্রমাণিত নয় (ঐ)। পিত্তনালী বন্ধ হয়ে থাকলে এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন ও গ্লুকোজ তথা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য কিছুটা প্রয়োজন। হাবিজাবি অন্যান্য পদার্থ নয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রয়োজনীয় ওষুধের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন তাতে লিভারের টনিক বা লিভারের জন্য বিশেষ কোন ওষুধ নেই। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে জাতীয় ওষুধ নীতি চালু হবার পর অজস্র টনিক, কাশির ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে অন্যান্য ওষুধের ক্ষতিকর মিশ্রণ ইত্যাদি বাতিল করার সাথে সাথে তথাকথিত লিভারের টনিকগুলিও বাতিল করা হয়েছে। যেমন বাতিল করা হয়েছে ফাইসন্স কোম্পানির ফিক্সাপ্লেক্স ইনজেকশান ও লিভার উইথ ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ইনজেকশান। এদের বাতিল করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে "লিভার এক্সট্রাক্ট বাদ দিয়ে নতুন ফরমুলা না করলে ইনজেকশানটি বাতিল থাকবে।" একইভাবে বাতিল হয়েছে ভিভ লিভার, লিভারজিন, বাইলস কম্পাউণ্ড, হেপাটন, লিভাপ্লেক্স, হেপডায়না ইত্যাদি। বাংলাদেশের বাতিল হওয়া এইসব তথাকথিত ওষুধগুলিই, ভারতে এখনো চালু লিভ-৫২, স্টিমুলিভ, লিভার্জেন ইত্যাদি তথাকথিত ওষুধগুলির মত দাবী করত, তারা খিদে বাড়াবে, পুষ্টি বাড়াবে, অপুষ্টি সংশোধন করবে, লিভারের কাজ ভাল করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানসম্মত যে যুক্তি দিয়ে এদের বাতিল করা হয়েছে তা হল "যেসব ওষুধের উপকারিতার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই এবং যেসব ওষুধ প্রচারের কল্যাণে এবং ডাক্তার ও ক্রেতাদের অজ্ঞতার সুযোগে টনিক, এনজাইম মিক্সচার, স্বাস্থ্য ও শক্তিবর্দ্ধক ইত্যাদি নামে অবাধে বিক্রি হয়, যেসব ওষুধ কালক্রমে রোগীর অভ্যাসে পরিণত হয়, রোগী ওষুধটির ওপর মারাত্মক ও ক্ষতিকরভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, দীর্ঘদিন ব্যবহারে যেসব ওষুধ শরীরের স্থায়ী ও অপূরণীয় ক্ষতি সাধনে সক্ষম, অথচ দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলি সমানে তৈরী করছে, এমনকি বাইরে থেকেও আমদানি করা হচ্ছে।" এগুলি থেকে মূল যে ব্যাপার স্পষ্ট তা হল তথাকথিত লিভার এক্সট্রাক্ট এবং লিভার ভাল করার পদার্থগুলি অপ্রয়োজনীয়, উপকারিতার বৈজ্ঞানিক প্রমাণহীন আর নিছকই লোক ঠকিয়ে মুনাফা আদায়ের চেষ্টা।

আমাদের যকৃতের কাজকে সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত ও নিয়মিত আহার, অতিরিক্ত তেল মশলা না খাওয়া, মদ্যপান একেবারে না করা ইত্যাদিই যথেষ্ট। যকৃতের রোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হলে পরিমিত প্রোটিন, গ্লুকোজ ও ভিটামিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় যদিও এদের ভূমিকাতেও সম্প্রতি সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত লিভারের রোগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রোটিন ক্ষতিই করে।

বিশেষ রোগে অন্য বিশেষ কিছু ওষুধ দেওয়া যায়—কিন্তু তথাকথিত লিভার টনিক মোটেই না।

তবু বাস্তবে অনেকে বলবে স্টিমুলিভ, লিভ-৫২ ইত্যাদি খেয়ে তো অনেক সময়ই খিদে বাড়ে, হজম ভাল হয়। সত্যি অনেকের ক্ষেত্রে তা হয়ও। এর অন্যতম প্রধান কারণ মানসিক। খিদে কমা বা বাড়া, হজমের গণ্ডগোল হওয়া বা উন্নতি হওয়া, অম্বল ইত্যাদি মূলত রোগীর মানসিক দিকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। নানা পরিস্থিতিতে নানা সময়ে এসব কষ্ট বাড়ে কমে। লিভার টনিকের তথা চিকিৎসকের নির্দেশের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থার কারণে যে মানসিক স্বস্তি আসে তার ফলেও মনে হতে পারে যেন খিদেটা বাড়ল, হজমটা ভাল হল। রোগী আন্তরিকভাবে চায় বলে অনেক চিকিৎসক পসার রাখার জন্য অর্থাৎ খদ্দেরের মন পাওয়ার জন্য টনিক, এনজাইম ইত্যাদির মত লিভার টনিকও দিয়ে যান (যেমন করে জ্যোতিষীরা, খদ্দেরকে সন্তুষ্ট রাখতে নানা মন ভোলান কথা, কিছু সতর্কতা, কিছু সাবধানতার কথা বলে)। সাথে সাথে চিকিৎসক তেল-মশলা না খাওয়া ও খাবার দাবারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের কথাও বলে দেন। এর ফলেও এই উন্নতি অনুভব করা যায়। এছাড়া, এসব পদার্থে গাছগাছড়ার যেসব নির্যাস থাকে তা পাকস্থলী ইত্যাদির মধ্যে উৎসেচকক্ষরণকে কিছুটা উত্তেজিত করেও কাজ করে। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্ষতিই করে, রোগী এসবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, সারাজীবনে আর হজম বা খিদে স্বাভাবিক হয় না। এধরনের পদার্থের প্রায় কটিতেই এলকোহল অর্থাৎ মদও থাকে। যেমন স্ট্যাডমেড-এর টেনোলিভার-এ এলকোহল থাকে ১০%। অন্যগুলিও এর ব্যতিক্রম নয় কারণ গাছগাছড়ার নির্যাস এই এলকোহলের মধ্যে দ্রবীভূত করেই তৈরী করতে হয়। এই এলকোহলও কৃত্রিমভাবে ক্ষিদে বাড়ায়। কিন্তু এলকোহল যে লিভারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর তা আগেই বলা হয়েছে ও সর্বজনবিদিত। যাদের লিভার আগে থেকেই কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের মধ্যে এধরনের পদার্থ এইভাবে আপাতভাবে ক্ষিদে ইত্যাদি সাময়িকভাবে কিছুটা বাড়িয়ে, কিছু চনমনে ভাব বা ভাল লাগার ব্যাপার ঘটিয়ে (এলকোহল ও অন্যান্য উত্তেজক নির্যাসের জন্য) ভেতরে ভেতরে সর্বনাশই ঘটিয়ে চলে। এধরনের 'ওষুধের' প্রতি আসক্তি কাশির সিরাপ, টনিক ইত্যাদির মত এদের মধ্যেকার মদ ও অন্যান্য উত্তেজক পদার্থের জন্যও ঘটে।

(৯)

এনজাইমের ধোঁকা

লিভার ভাল করার ‘ওষুধের’ পাশাপাশি বা তার মিশাল দিয়ে নানা এনজাইমও বাজারে চালু। বদহজম, পেটফাঁপা, অম্বল, গ্যাস ইত্যাদি পেটের অনির্দিষ্ট নানা রোগে এই ধরনের অজস্র পদার্থ ওষুধের নামে বিক্রি হয়।

আমাদের খাবারের প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট অংশের হজমের জন্য পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ইত্যাদি থেকে পেপসিন, লাইপেজ, ট্রিপসিন, ইরেপসিন, ডায়াস্টেজ, সুক্রেজ, মলটেজ ইত্যাদি অনেক উৎসেচক বা এনজাইম বেরোয়। এগুলি জটিল খাদ্য অণুকে সরলীকৃত করে, তারপর এই সরলীকৃত খাদ্যঅণু অন্ত্র থেকে রক্তে শোষিত হয়—সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পরিমিত আহার, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও সুস্থ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের এনজাইমের স্বাভাবিক কাজ বজায় থাকে। বিশেষ কোন রোগে এই ধরনের এনজাইমের অভাব ঘটতে পারে, কিন্তু এ রোগগুলি খুবই দুর্লভ এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের মধ্যে ঘটে। সাথে সাথে এসব রোগের অন্যান্য লক্ষণও প্রকট থাকে। সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের শরীরে এনজাইমের অভাব ঘটেনা। তবু প্রচারের জোরে এমন ধারণা চালু করা হয়েছে যে, বদহজম, পেটফাঁপা ইত্যাদি হলেই এনজাইম খেতে হবে—অবশ্যই পয়সা খরচ করে ওষুধ কোম্পানির ওষুধ।

আমাদের দেশের বাজারে এধরনের অজস্র ‘ওষুধ’ পাওয়া যায়। যেমন, কার্মোজাইম, অ্যামিনোজাইম, বেস্টোজাইম, কম্বিজাইম, ডাইজেনজাইম, ডাইজিপ্লেক্স, ডিসপেপটাল, ডিসপেপটেজ, ডাইজিটোন, এনজার, ফেস্টাল, এনজাইমেক্স-এফ পি এস, লুপিজাইম, মার্কেনজাইম, মেরিজাইম, মোলজাইম, নর্মোজাইম, অরিজাইম, প্যানজিনর্ম, পেপসিনোজাইম, র‍্যালক্রিজাইম, অ্যানজাইম, টাকাজাইম, টাকা-ডায়োস্টেজ, ইউনি এনজাইম, ভিলকো এনজাইম, ভিটাজাইম, ভিজিল্যাক জাইমেক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। কি বিচিত্র, ‘বহুরূপে সম্মুখে’ রয়েছে আমাদের। মার্ক, বরিঙ্গার-নল, ইউনিকেম, হেক্সট, এথনর ইত্যাদির মত বহুজাতিক বিদেশী ওষুধ কোম্পানির পাশাপাশি স্ট্যাডমেড, ইষ্টইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল, বেঙ্গল কেমিক্যালস, ইত্যাদি নানা দেশী ওষুধ কোম্পানিগুলিও এধরনের মালকড়ি তৈরী করে।

এগুলোর প্রায় সবগুলিতেই অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ভাবে, কখনো বা ক্ষতিকরভাবে মেশান থাকে নানা ভিটামিন ও খনিজ লবণ—বলা হয় এরাও হজম ও ক্ষিদে বাড়াবে। পাশাপাশি থাকে নানা এনজাইম—কৃত্রিমভাবে তৈরী বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত,—যেমন প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট, ডায়াস্টেজ, লাইপেজ, প্রোটিয়েজ, এ্যামাইলেজ, হেমি সেলুলেজ, সেলুলেজ, প্যাপেন,

প্যানক্রিয়াটিন ইত্যাদি। কেউ আবার হিং, জোয়ান, কাঠকয়লা (activated wood charcoal) -ও মেশায় (যেমন FDC কোম্পানির মোলজাইম, ইউনিকেম-এর ইউনি এনজাইম, স্ট্যাডমেড-এর পেপসিনোজাইম ইত্যাদি)।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি চিকিৎসা বিজ্ঞানেই এদের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা হয় বা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এই সব এনজাইম প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে—অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াসের কাজ যদি সুনিশ্চিতভাবে কম হয় তবে প্যানক্রিয়াটিনের কিছু ভূমিকা রয়েছে, তবে দরকার অনেক বেশী পরিমাণে। প্যানক্রিয়াসের গণ্ডগোলের কারণে রোগ হলে (steatorrhoea—চর্বি জাতীয় খাদ্য হজম না হয়ে পায়খানায় বেরোলে) প্যানক্রিয়াটিন গ্রহণ করলে ঘন ঘন পায়খানা হওয়াটা কমতে পারে, কিন্তু এর ফলে পায়খানায় চর্বির পরিমাণ আদৌ কমে কিনা সন্দেহ রয়েছে। পেপসিন উৎসেচকটির চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা তা সন্দেহজনক। মাংস নরম করার জন্য পেঁপে থেকে পাওয়া প্যাপেন ব্যবহার করা যায় (অর্থাৎ মানুষের শরীরে এটি স্বাভাবিকভাবে থাকেই না এবং মুখে খেয়ে তার কোন উপযোগিতা নেই)। তবু ইউনিএনজাইম-এর একটি উপাদান এই প্যাপেন। বহু কোম্পানির ওষুধে ডায়াস্টেজ মেশান থাকে, কিন্তু এর কোন চিকিৎসাগত সুফল দেখা যায়নি (no demonstrated therapeutic effect)। বাইল এ্যাসিড বাস্তবত হজমে সাহায্য করে না (does not materially help digestion)। কাঠকয়লা (charcoal) কখনো কখনো পেট ফাঁপাতে কাজ করতে পারে, কিন্তু এ কিভাবে কাজ করে তা মোটেই প্রমাণিত হয়নি (the theory of action is unproved) ইত্যাদি। (Laurence-এর Clinical Pharmacology)

প্যাপেন-এর মত সেলুলেজ বা হেমিসেলুলেজ নামক উৎসেচক মানুষের শরীরে এমনিতেই থাকে না। গরু, ছাগল ইত্যাদি যে সব প্রাণী ঘাস, খড় খায় তাদের পেটে এসব খাবারের সেলুলোজ হজম করার জন্য, এই উৎসেচকটি থাকে। স্পষ্টতঃই মানুষের শরীরে এর আদৌ দরকার নেই, কারণ মানুষ তৃণভোজী প্রাণী নয় এবং মানুষের পেটের ভেতর খাবারের হজম না হওয়া সেলুলোজ অংশটি মলের স্বাভাবিকতা রক্ষায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিওফার্মা কোম্পানির কোম্বিজাইম, বোরিংগার নল-এর ডিসপেপটাল, হেক্সট কোম্পানির ফেসট্যাল ইত্যাদিতে এই উৎসেচকটি দেওয়া থাকে। এসব ওষুধ কোম্পানি কি ভারতীয়দের তৃণভোজী প্রাণী মনে করে, নাকি ভারতের যে হাজার হাজার হতদরিদ্র মানুষ আকালের সময় ঘাস-পাতা-ঘাসের বীজ খেতে বাধ্য হয় তাদের হজম ভাল করার জন্য এসব ওষুধ বানিয়েছে? নিছক লাভের জন্য হাবিজাবি মেশানর প্রতিযোগিতার কি নির্মম পরিণতি!

তথাকথিত এই সব হজমের ওষুধগুলিতে এনজাইম ছাড়াও ভিটামিন, বিভিন্ন ধরনের লবণ, উত্তেজক বা নিস্তেজকারী পদার্থ, ইত্যাদি নানা হাবিজাবি এই

ভাবেই মেশান হয়। এদের তালিকা বিরাট। শুধু উদাহরণ হিসাবে কয়েকটির নাম করা যায় যেমন ইনোসিটল, নায়াসিনামাইড, মিথাইল পলিসিলোক্সোন, ক্লোরোফর্ম, হোমাট্রোপিন , প্যান্থেনল, সর্বিটল, এলকোহল, বেলাডোনা, ব্যাটেন, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, গ্লিসারিন, লাইসিন, গাছের উৎসেচক (vegetable enzymes) ইত্যাদি ইত্যাদি। সাথে কেউ মেশায় কুলেখাড়া, কালমেঘ, খেতপাপড়া, দারুহরিদ্রা, আমলা, মেথি, বহেড়া, জোয়ান, বেল, রাধুনি ইত্যাদি নানা গাছগাছড়ার রস। যে যা পারে খেয়াল খুশিমত মিশিয়ে গেছে। সুবিধা হচ্ছে, টনিকের মতই স্বল্প মাত্রায় খেলে এগুলো খুব একটা ক্ষতি করে না—বড়জোর একটু বিস্বাদ ভাব হয় বা বিশ্রি ঢেঁকুর ওঠে। কেউ ভিন্নতর কারণে এবং প্রায়শঃই মানসিক কারণে কিছু আরামও পায়। কিন্তু বেশী খেলে পেটের স্বাভাবিক উৎসেচক ক্ষরণ বিপর্যস্ত হয়ে শারীরিক ক্ষতি শুরু হয়। তা সত্ত্বেও যা-খুশি-মেশানর প্রতিযোগিতা অব্যাহত। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর হলেও এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, হজমের ওষুধ অনায়াসে কিনে খায় সুস্থ মানুষও, কিংবা সামান্য পেটের গোলমালে ভোগা কেউ। এ গোলমাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক শ্রম, খাদ্যাভাসের সামান্য পরিবর্তনেই হয়ত সংশোধন করা যায়।

হজমের তথাকথিত এসব ওষুধ বা এনজাইমগুলোর সবগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বোধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। কোন উন্নত দেশে এগুলো এলোপাথাড়ি এভাবে ব্যবহৃত হয় না। বাংলাদেশেও জাতীয় ওষুধনীতি চালু হওয়ার পর বাজার থেকে এসব ওষুধ বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাতিল হওয়া এধরনের ওষুধের নাম আমাদের এখানকার মতই। যেমন বাতিল হয়েছে বিদেশী ফাইনস কোম্পানির ডিজিপ্লেক্স। বাতিল করার কারণ হিসেবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—এটি ভিটামিন বি-১২ সহ বি কমপ্লেক্স ও ডায়াস্টেজ এনজাইমের একান্ত অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ। বিজ্ঞাপনের অপপ্রচারের ফলে চালু ওষুধ। ক্রেতা ও ডাক্তারকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়। তরল অবস্থায় ডায়াস্টেজের স্থায়ীত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চ্যালেঞ্জ করার পর ডায়াস্টেজকে ট্যাবলেট আকারে দেওয়া শুরু হয়। সেই ট্যাবলেটটিও প্রায়শঃই নষ্ট অবস্থায় থাকে। মুনাফা লোটার অন্যতম পণ্য। বিজ্ঞাপনে যেসব দাবী করা হয় তার কোনটাতেই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। ফাইসন্সের নিজের দেশে অচল। নিয়মিত ব্যবহারে ক্ষতিকর।" বক্তব্য স্পষ্ট।

বাংলাদেশে বাতিল করা হয়েছে ভারতে এখনো চালু হেক্সট-এর ফেস্ট্যালও। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে "অপ্রয়োজনীয় হজমি দাওয়াই। এনজাইমের মিশ্রণ। শারীরিক স্বাভাবিক পরিপাক-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং ওষুধটির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ায় এবং শরীরকে পঙ্গু করে। শুধু পেনক্রিয়াটিন দিয়ে নতুন ফর্মুলা জমা দিতে বলা হয়েছে।" প্যানক্রিয়াসের রোগ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত

হলে তবেই এই পেনক্রিয়াটিন তবু ব্যবহার করা যায়। বাতিল হয়েছে গ্লাক্সো-র প্রেক্সান,প্রবেরন, ফাইজার-এর হেপচুনা প্লাস ক্যাপসুল ইত্যাদি। সবগুলি থেকেই তথাকথিত লিভার এক্সট্রাক্ট্ বাদ দিতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে বাতিল হয়েছে নানা কোম্পানির এনজাইম-যুক্ত ওষুধগুলিও যেমন বিটাজাইম, ভিটাজাইম, সাইট্রোজাইম, সুপারজাইম, ফার্মাজাইম, কোয়াড্রি-জাইম, ইউনিজাইম, বায়োপ্লাজাইম, সেবাজাইম, স্টমাজাইম ইত্যাদি গালভরা নামের ওষুধগুলি। যে কেউই বুঝতে পারবেন এই ধরনের নামের ওষুধগুলি আমাদের দেশে এখনো চলছে বা চালান হচ্ছে।

ক্ষিদে বাড়ানর ওষুধ হিসেবে **সাইপ্রোহেপটাডিন** নামের একটি ওষুধও আমাদের দেশে প্রচুর চালান হয়। বহু ডাক্তারই তা 'রোগীদের' দেন। আমাদের দেশে সিপ্লাকটিন, পেরিএ্যাকটিন, পেরিটল ইত্যাদি নামে তা বিক্রি হয়। এটিও ক্ষতিকর বলে বাংলাদেশে বাতিল। বলা হয়েছে, "সাইপ্রোহেপটাডিন নামক উপাদানটি আনাকাংক্ষিত ক্ষুধা উত্তেজক। স্বীকৃত ও প্রমাণিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া-গুলোর মধ্যে মাথাব্যথা, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, দৃষ্টিভ্রম, বিভ্রান্তি, অস্থিরতা, আলোকসংবেদনশীলতা, ঝাপসা দৃষ্টি অন্যতম। রক্তের প্ল্যাটেলেটের সংখ্যা কমে যায় বলে অত্যধিক রক্তপাতের কারণ হতে পারে। আলসার, হাঁপানি, পুরাতন রোগী, শিশু ও মায়েদের জন্য আরো বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।" চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুধামন্দ্য-এ এর ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সুফল অতি নগণ্য (marginal effectiveness)। (Harrison's) ক্ষুধামন্দ্যের চিকিৎসায় খাবারের অভ্যাস পাল্টান, শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম, মানসিক ব্যাপারগুলিকে নজর দেওয়া, ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, কোন ওষুধ নয়। সাইপ্রোহেপটাডিন আসলে এক ধরনের অ্যালার্জি বিরোধি ওষুধ। (প্রকৃতপক্ষে সিপ্লাকটিনকে এই জন্যই ব্যবহার করা হয়)। কিন্তু এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ ধরনের আরো কিছু ওষুধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, এদের ব্যবহার না করাই ভাল, বড়জোর নামটা জেনে রাখা যায়, কারণ এ ধরনের অসংখ্য ওষুধই রয়েছে (Laurence)।

সব মিলিয়ে হজম ভাল করা, ক্ষিদে বাড়ান ইত্যাদির নাম করে যে অজস্র ওষুধ গেলান হয় তা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর—আরো নানা ওষুধের মত নিছকই ধোঁকা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে ব্যবসা করার ধান্দা।

(১০)
পায়খানা পরিষ্কার ও পকেট পরিষ্কার

পায়খানা পরিষ্কার না হওয়ার অসন্তুষ্টিটা অনেকের মধ্যেই তীব্র আকারে রয়েছে। কারোর হয়ত সারাদিনে এক-দু'বার পায়খানা করার পরও মনে হল ঠিক যেন পরিষ্কার হল না, আরো কিছু থেকে গেছে। কারোর বা পায়খানা করার সময় বেশ বেগ দিতে হয়, পায়খানা খুব শক্ত বা দু'এক দিন পর পর হয় অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। আর অনেকেরই এর সঙ্গে থাকে 'গ্যাসের গণ্ডগোল', বদহজম, অম্বল ইত্যাদি। পায়খানা সম্পর্কিত এ ধরনের অনির্দিষ্ট নানা কাল্পনিক কষ্টের জন্য অনেকেই সাধারণ বিজ্ঞাপনে ভুলে বা নানা ওষুধ কোম্পানির প্রচারে বিভ্রান্ত চিকিৎসকদের মাধ্যমে নানা ধরনের পদার্থ ওষুধের নামে খেয়ে তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন।

পায়খানা পরিস্কার না হওয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতার এসব ব্যাপারগুলি অনেকের মধ্যেই কিছু মন গড়া ধারণার ওপর গড়ে ওঠে। 'পায়খানা ঠিক পরিস্কার হল না' জাতীয় ঘটনার জন্য অহেতুক দুশ্চিন্তা না করলে দু'চারদিনের মধ্যে 'কষ্ট' চলে যেতে পারে। আর কোষ্ঠবদ্ধতা সত্যিই থাকলে তার সৃষ্টির পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব কিছু অভ্যাস। তার চিকিৎসার জন্যও প্রয়োজন এই সব অভ্যাসের পরিবর্তন ও প্রচুর জল খাওয়া—কোন ওষুধপত্র নয়।

পায়খানা 'ঠিকমত' হওয়ার জন্য মূলতঃ প্রয়োজন দু'টি দিক—পায়খানার পরিমাণ ও আমাদের অন্ত্রের সুষ্ঠু সঞ্চালন। প্রথমটির জন্য খাদ্যাভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খাবারের আঁশ বা সেলুলোজ জাতীয় খাবার উপযুক্ত পরিমাণে থাকলে তা হজম না হয়ে পায়খানার সাথে বেরোয় এবং পায়খানার পরিমাণ ও গঠন ঠিক রাখে। ফলমূল, শাকসব্জি, রুটি, ঢেঁকিছাটা চাল ইত্যাদি থেকে এ ধরনের পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এ ধরনের খাবারই একসময় সর্বজনীনভাবে চালু ছিল। এখনো বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষের মধ্যে এ ধরনের খাবারই প্রধান। তাই তাঁদের মধ্যে খাবারের কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতি শক্ত মল হওয়ার ব্যাপারটা খুব কম। কিন্তু আধুনিকতার নামে ও ব্যবসায়িক প্রচারের জোরে, তথাকথিত কিছু শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বা উচ্চবিত্ত-ধনীদের মধ্যে খাদ্যাভ্যাসেও যে পরিবর্তন এসেছে তার কারণে মূলতঃ এদের মধ্যেই কোষ্ঠবদ্ধতা জাতীয় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ঢেঁকিছাটা চালের পরিবর্তে মেশিনে ছাঁটা ধবধবে সাদা চাল বা আটার পরিবর্তে আঁশহীন ময়দার প্রচলনের ফলে খাবারে আঁশের পরিমাণ অনেক কমে যায়। আম, কাঁঠাল, শাঁকালু, শশা, পেয়ারা, খেজুর, জাম, কলা ইত্যাদি নানা ফলমূলের পরিবর্তে নানা ধরনের জ্যাম-জেলির প্রবর্তনের ফলেও একই ধরনের সর্বনাশ হয়। এ সব ফলমূল থেকে পায়খানার জন্য আঁশ শুধু নয়, শরীরের পুষ্টির জন্যও

প্রাকৃতিকভাবে নানা পদার্থ (প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, লবণ ইত্যাদি) পাওয়া যায় যা ব্যবসায়িক কোম্পানির চালু করা জ্যাম-জেলি ইত্যাদি থেকে ঐভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।* দৈনিক ৫০-১০০ গ্রাম এ ধরনের ফল খেলেই পায়খানা নরম ও পরিষ্কার রাখা যায় এবং ফলের রস নয়—পুরো ফলটাই খাওয়া দরকার। ঐ ফল থেকেই তৈরী ৫০-১০০ গ্রাম জ্যাম-জেলির চেয়ে এ ফলের দামও অনেক কম পড়বে। কিন্তু ব্যাপক প্রচারের ফলে, সুদৃশ্য শিশি বা কৌটো আর ছিমছাম খাবারের নাম করে, অনেক বেশী দাম দিয়ে এইসব ক্ষতিকর পদার্থই চালু হয়েছে গত কয়েক দশকের মধ্যে। খাবারে শাকসব্জির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিয়েও বিপদ ডেকে আনা হয়। নানা ধরনের সব্জি ও শাককে হাবিজাবি মনে করে এ ধরনের রান্না কমিয়ে দেওয়া হয় ; স্টু বা এই ধরনের তথাকথিত ছিমছাম রান্না, বড়জোর দু'এক টুকরো আলু, সাথে কিছু মাংস, মাছ বা ডিম, দুধ—ইত্যাদির ফলে খাবারে আঁশের পরিমাণ কমে যায়। এছাড়া মাখন, চিনি, চকোলেট ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলনের ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির (ক্যালরি) জোগান এদের থেকেই চলে আসে,—ফলে ভাত-রুটি-ফলমূল-শাকসব্জির প্রয়োজন কমে যায়। এ কারণেও অন্যান্য ক্ষতির মত মল ঠিকমত তৈরী হতে পারে না।

খাবারের সাথে প্রচুর পরিমাণ জল না খাওয়ার ফলেও পায়খানা শক্ত হয়ে যায়। শীত প্রধান দেশে কম জল খাওয়ার ফলে এ কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা অনেক বেশী। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণভাবে জল প্রচুর খাওয়া হয়, তাই পায়খানাও শক্ত হতে পারে না। কিন্তু জীবিকার কারণে বা বেশী জল খেয়ে ঘন ঘন প্রস্রাব করা এড়ানর জন্য অনেকেই নিজেদের অজান্তে অনেক কম জল খান—নেহাৎ তেষ্টা না পেলে জল খাওয়া আর হয়ে ওঠে না। এ কারণেও অনেকের মধ্যে পায়খানা শক্ত হয়ে গিয়ে কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

অন্ত্রের (intestine-এর) ঠিকমত সঞ্চালন না হলেও পায়খানা পরিষ্কার না হয়ে পেটে জমে থাকে। এর পেছনে আমাদের নার্ভতন্ত্রসহ জটিল অনেক দিকই জড়িত রয়েছে। তবে সাধারণ অভ্যাসের যে দুটি একে বিপর্যস্ত করে তোলে তা হল উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও অসুবিধাজনক সময়ে পায়খানা পেলে তা চেপে রাখা।যে সমাজে শারীরিক পরিশ্রম অসম্মানিত, কম পরিশ্রম করে বেশী আয় করার সুবিধাবাদী মানসিকতা যেখানে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজে কোষ্ঠবদ্ধতাও একটা সমস্যা—মূলতঃ বুদ্ধিজীবী, কেরাণীকুল, ব্যবসায়ী বা এই ধরনের যারাই কম শারীরিক শ্রম করে তাদের মধ্যে। আয়েসী, সুবিধাভোগী

* চর্বি ও শর্করা-প্রধান 'আধুনিক' খাদ্যকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেকটর-জেনারেল ডঃ হাফডিন মাহলের নাম দিয়েছেন জাংক ফুড (junk food) বা 'জঞ্জাল খাদ্য'। এদের থেকে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, দাঁতের রোগ, ডায়াবিটিস, ইত্যাদিরও সৃষ্টি হয়। (চীজ, বাটার, আইসক্রীম, জ্যাম, জেলী, চকলেট ইত্যাদি এ ধরনের খাবারের উদাহরণ।)

আরামপ্রদ জীবন এইভাবে বিপদ ডেকে আনে। সকালে পায়খানার আগে কিছুক্ষণ তাড়াতাড়ি হাঁটলে, ছুটলে বা জগিং করলে এবং এই সমাজে যাদের পেশায় শারীরিক শ্রমের সুযোগ নেই, তারা নিয়ম করে কিছু শারীরিক পরিশ্রম করলে (ঝাঁট দেওয়া, মাটি কুপোন, ব্যায়াম, মাঠের খেলাধূলা ইত্যাদি) অনেকেই তাদের পায়খানাকে পরিষ্কার করে তুলতে পারেন। তবে শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই থাকা ভাল। মেহনতী মানুষের মধ্যে এ ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতা নেই বললেই চলে। এখনকার সমাজে পেশাগত রূপান্তরও কোষ্ঠবদ্ধতাকে বাড়িয়ে তোলে। যখন তখন পায়খানা পেলে সুযোগের অভাবে ও কৃত্রিম শোভনতার কারণে অনেকেই পায়খানা চেপে রাখতে বাধ্য হন। দীর্ঘ ভ্রমণ, চাকরির জায়গা, সুদীর্ঘ মিটিং ইত্যাদির সময় প্রায়ই ব্যাপারটি ঘটে। অনেক বাবা-মাই তাঁদের বাচ্চাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানা করার ব্যাপারটা অভ্যাস করান, যখন তখন পায়খানা করলে ভ্রূকুটি করেন বা বিরক্ত হন। এর ফলেও অনেকের মধ্যে ঐ সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে পায়খানা করাটা অপরাধজনক কিছু বলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চেপে রাখেন। বার বার এভাবে চেপে রাখার ফলে আমাদের মলাশয়ের সংবেদনশীলতা কমে যায়, মলাশয়ে পায়খানা জমলেও তা প্রথমে বোঝা যায় না বা অস্বস্তিকর মনে হয় না। এক সময় এটিও স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতায় পরিণত হয়। একে কাটানর জন্য কোন ওষুধ বার বার খেলে সাধারণ কোন পদ্ধতি (যেমন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি) আর তখন কাজ করে না। বিশেষ কিছু ওষুধ খেলেও কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যেমন মরফিন, বেলাডোনা, প্রোপানথেলিন, কিছু অম্বল বিরোধী এণ্টাসিড, লৌহঘটিত লবণ (আয়রন ট্যাবলেট ও টনিক), এট্রোপিন ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কারণেও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে, যেমন হতে পারে পাতলা পায়খানাও।

কোষ্ঠবদ্ধতার কষ্টের কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীর এই সব ব্যাপারই মূলতঃ থাকে। সুতরাং এ সবের চিকিৎসা কখনোই পায়খানা পরিস্কার করার ওষুধ নয়। বরং যখন তখন ঐ ধরনের ওষুধ খেলে পরিণতিতে ক্ষতিই হয়। একসময় ঐ ওষুধ প্রতিদিন না খেলে আর পায়খানাপরিস্কার হয় না। বিশেষত অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধ বয়সে কারোর কারোর ক্ষেত্রে অন্ত্রের সঞ্চালন এমনিতেই কমে যায়, তখন খাবারে আঁশের পরিমাণ বাড়িয়ে বা নেহাৎ দরকার হলে মাঝে মাঝে কিছু ওষুধ (যেমন তরল প্যারাফিন) তবু দেওয়া যায়। দীর্ঘ সময় শয্যাশায়ী থাকার ফলে পায়খানা না হলে তার জন্যও সাময়িকভাবে এদের প্রয়োগ করা যায় বা এনিমা (enema) দেওয়া যায়। স্পাইন্যাল কর্ডের কিছু রোগ, অন্ত্রের টিউমার বা ক্যানসার, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের

কম কাজ, অর্শ বা ফিসার—এ ধরনের আরো নানা কারণেও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই রোগের অন্যান্য লক্ষণ থাকবে এবং অন্যান্য পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করতে পারেন। এদেরও চিকিৎসা, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার বাজার চলতি ওষুধ নয়, বরং এদের ব্যবহারে মূল রোগটি চাপা পড়ে বিপদ বেড়ে চলে।

পায়খানা পরিস্কার করার তথা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য নানা প্রতিষ্ঠিত ওষুধ কোম্পানি যেমন ওষুধ সাজিয়ে রেখেছে, তেমনই অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানও পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বা হাটে-বাজারে মাইক সহযোগে প্রচার চালিয়ে এসব বিক্রি করে। এসব পদার্থে মূলত দু'ধরনের জিনিস থাকে। হয় তারা পায়খানার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ও নরম পায়খানা করে, কিংবা অন্ত্রের সঞ্চালন বাড়িয়ে জোর করে পায়খানা করায়। ওষুধের সাথে সেলুলোজ, সাইলিয়াম (psyllium) ইত্যাদি পদার্থ খেলে তা জল শোষণ করে ফুলে ওঠে কিন্তু অন্ত্র থেকে শোষিত হয় না, এবং পায়খানার পরিমাণ বাড়ায়, অন্ত্রের সঞ্চালনও বৃদ্ধি করে। এ সব পদার্থ খেলে সাথে প্রচুর জল অবশ্য খেতে হয়। অনেকের মধ্যে এগুলি অন্ত্রের পথ বন্ধ করে দিয়ে (intestinal obstruction) মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এমনিতেই খাবারে আঁশের পরিমাণ বাড়িয়ে ও প্রচুর জল খেলে নিরাপদভাবেই এদের প্রয়োজন কমে আসে। তরল প্যারাফিন পায়খানাকে নরম করে দেয়। যেমন অর্শের জন্য পায়খানা নরম রাখার দরকার হয়। অর্শ হলে সাময়িকভাবে এর ব্যবহার করা চলে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এর ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়। কারণ এর ফলে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (এ, ডি, ই, কে)-এর অভাব ঘটে এবং আরো ভয়াবহ নানা রোগ সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোলোনের বা মলাশয়ের ক্যানসারও তরল প্যারাফিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্ত্র থেকে কিছু প্যারাফিন শোষিত হয়ে পেটের ভেতরে লিম্ফ নোডে জমা হতে পারে ও প্যারাফিনোমা নামক টিউমারের সৃষ্টি করতে পারে। কোনক্রমে, বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, ফুসফুসে সামান্য পরিমাণ চলে গেলেও ফুসফুসের মারাত্মক প্রদাহ (lipid pneumonitis) সৃষ্টি হয়। এটি পায়খানা এমন তরলও করে দিতে পারে যে, যখন তখন, যত্রতত্র পায়খানার দ্বার দিয়ে তরল মল বেরিয়ে আসতে পারে। তবু বুটস কোম্পানির ক্রেমাফিন, ওয়ার্নারের এগারল ইত্যাদি প্যারাফিন-যুক্ত 'ওষুধ' অনেকেই যখন তখন কিনে খান, দোকানে অবাধে কিনতেও পাওয়া যায়। অথচ নিতান্ত প্রয়োজন না হলে এর ব্যবহার যে বিপজ্জনক তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। আর সাধারণভাবে প্রচুর জল খেলেই এর প্রয়োজনকে কমিয়ে দেওয়া যায়।

আরো কিছু রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যেগুলি অন্ত্রের সঞ্চালনকে উত্তেজিত করে যেমন ক্যাস্টর অয়েল, সেন্না, ক্যাসকারা সাগ্রাদা, ড্যানথ্রন, ফেনলফ্থ্যালিন, বিসাকোডিল, অক্সিফেনিস্যাটিন ইত্যাদি। এদেরও ব্যবহার অত্যন্ত সাবধানে করা

উচিত। কারণ বার বার ব্যবহার করলে অন্ত্রের সঞ্চালন বেড়ে যাওয়ার ফলে অন্ত্র থেকে খাবার, লবণ ইত্যাদির শোষণ ঠিকমত না হয়ে শরীরে এদের অভাব দেখা দিতে পারে। বেশী পরিমাণে খেলে পেটে তীব্র কলিকি ব্যথাও হয়, অনেকে অল্প পরিমাণেও অস্বস্তিকর এধরনের ব্যথা অনুভব করতে পারেন। ফেনলফ্থ্যালিন থেকে এলার্জি হয়ে আম বাত, লুপাস এরিথিমেটোসাসের মত নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে। সেন্না (শোনা- পাতা), ক্যাসকারা, রুবার্ট, এ্যালোস—এসব পদার্থই গাছগাছড়া থেকে পাওয়া যায়। হাটে-বাজারে মাইক যোগে প্রচারিত পায়খানা পরিস্কারের দাওয়াইগুলোতে মূলত এ ধরনের পদার্থই থাকে। আগেই বলা হয়েছে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা, পায়খানা পেলে তা চেপে না রাখা ইত্যাদি করেই অন্ত্রের সঞ্চালনের অস্বাভাবিকত্ব তথা এদের প্রয়োজন অনেক কমান যায়। বিশেষ কোন রোগের কারণে অন্ত্রের সঞ্চালন ঠিকমত না হলে সাময়িকভাবে এদের ব্যবহার করা চলে। জার্মান রিমেডিজ এর ডালকোল্যাক্স, গ্রিফন-এর ইভাকুওল, গ্ল্যাক্সোর গ্ল্যাক্সেনা, র‍্যালিস-এর জুলাক্স, স্যাণ্ডোজ-এর পার্সেনিড-ইন, এ্যালেম্বিক-এর ল্যাক্সাটিন ইত্যাদি ওষুধে এ ধরনের পদার্থ থাকে। এদের অনেকগুলিরই নাম সাধারণ মানুষও জানেন এবং সামান্য প্রয়োজনে, প্রকৃতার্থে অপ্রয়োজনে কিনে খান। ডাইঅক্সাইল সোডিয়াম সালফোসাক্সিনেট নামে আর একটি রাসায়নিক পদার্থ অন্ত্রের ভেতরে পৃষ্ঠটান (surface tension) কমিয়ে মলের মধ্যে জলের প্রবেশ বাড়িয়ে দেয় ও পায়খানা নরম করে। স্ট্যাডমেড-এর ল্যাক্সিকন, এ্যাস্ট্রোডিয়ল-এর সেলুব্রিল-এ এ পদার্থ থাকে। তবে এটির বিরাট কিছু ক্ষতিকর ক্ষমতা এখনো জানা যায়নি।

কিন্তু পায়খানা পরিস্কার করার এ সমস্ত পদার্থই যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার করাই ভাল। এদের বিশেষ কারোর বিপজ্জনক দিক ছাড়াও সাধারণভাবে এদের নিয়মিত বা অতিরিক্ত ব্যবহারে কোষ্ঠবদ্ধতার ব্যাপারটিই বেড়ে চলে। দেখা গেছে কোষ্ঠবদ্ধতার অতি সাধারণ একটি কারণ হচ্ছে কোষ্ঠ পরিস্কার করার দাওয়াই-এর উপর নির্ভরতা—যা প্রথমের দিকে থাকে মানসিক একটা ব্যাপার, কিন্তু পরে শারীরিক নির্ভরতাও চলে আসে অর্থাৎ তখন শারীরিক স্বাভাবিক কাজকর্মও অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে ও এধরনের পদার্থ ছাড়া পায়খানা নরম হয় না বা ঠিকমত পায়খানা করা যায় না ("a commom cause of contsipation is purgative dependence, which may be solely emotional at first, though physical dependence may follow" —Laurence)।

অনেকের এমনও ভুল ধারণা ("mistaken belief") আছে, প্রতিদিন পায়খানা না হওয়াটা যেন অসুস্থতার লক্ষণ। ব্যাপারটি তা নয়। মলের পরিমাণ যথেষ্ট না হলে পায়খানা নাও হতে পারে। খিদে ঠিকমত থাকলে, পেটে কোন কষ্ট না থাকলে, বা অন্য কোন শারীরিক কষ্ট বা লক্ষণ না থাকলে দু'একদিন পায়খানা না

হওয়াটা কোন রোগের বা অসুস্থতার লক্ষণ নয় বা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এমনকি কারোর কারোর ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে একবার মাত্র ভালভাবে পায়খানা করাটাও স্বাভাবিক হতে পারে।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ওষুধের নিয়মিত প্রয়োগ অত্যন্ত বিপজ্জনক— সারা জীবনের জন্য তাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। বাচ্চাদের কোষ্ঠবদ্ধতায় নিয়মিত এসব ওষুধের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ব্যাপারটি চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তা, বা মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় ("Casts doubt on either intelligence or mental health of the prescriber"—ঐ)। অন্য কোন রোগ না থাকলে সাধারণভাবে কোষ্ঠবদ্ধতার ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ মানসিক ও তার জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই তা একটি সমীক্ষা থেকে বোঝা যায়। "যে সব রোগী কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন তাঁদের ক্ষেত্রে কোন অকার্যকরী ওষুধ (placebo) কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার ওষুধ হিসেবে বলে প্রয়োগ করেও দেখা গেছে এঁরা দিনে একবার ঠিকমত পায়খানা করছেন— যা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য কোন ওষুধ খেয়েও হচ্ছিল। অন্তত আমাদের ক্লিনিকে, কোষ্ঠবদ্ধতার রোগীরা তাঁরাই যাঁরা নিছক মনে করছেন যে, তাঁদের পায়খানা হচ্ছে না"। (Journal of Chronic Diseases; 6, 244, 1957, Greiner et al)। এসব কারণেই পায়খানা পরিষ্কার করা বা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় এ ধরনের অজস্র ওষুধের অপ্রয়োজনীয়তার জন্যে তাদের উল্লেখই করেননি। নেহাৎ দরকার হলে জোলাপ (cathartic) হিসেবে শুধুমাত্র সেন্নার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে পায়খানা পরিষ্কারের ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক ও ওষুধের ব্যবহার এসব ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় শুধু নয় ক্ষতিকরও। তা সত্ত্বেও বিশেষ কোন রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা হলে তাকে অবহেলা করা উচিত নয়। কিন্তু তার জন্য রোগটিই নির্ণয় করা দরকার, পায়খানা পরিষ্কারের দাওয়াই নয়। সাধারণভাবে আয়েসী ও তথাকথিত আধুনিক উন্নত জীবনের মোহে না পড়ে খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রম ঠিকমত করলেই পায়খানা পরিষ্কার রাখা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন অস্ত্রোপচার করার আগে বা এক্সরে করার জন্য) অন্ত্রকে মলশূণ্য করতে বা অতি বয়স্কদের ক্ষেত্রে যখন অন্ত্রের সঞ্চালন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে বলে সুপ্রতিষ্ঠিত কিংবা অর্শ ইত্যাদির জন্য সাময়িকভাবে এদের ব্যবহার করা চলে। অতি বিরল এ সব ক্ষেত্র ছাড়া যখন তখন এসব ওষুধ খেয়ে পায়খানা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে তার ফলে শুধু পকেটই পরিষ্কার হয় না, ভয়াবহ নানা রোগ আর স্থায়ী অসুস্থতাকেও আমন্ত্রণ করে আনা হয়।

এছাড়া আমাশা (amoebiasis), জিয়ার্ডিয়া (Giardiarsis), কৃমি, হুকওয়ার্ম ইত্যাদি নানা পরজীবী অন্ত্রের মধ্যে বাসা বেধে যে সব রোগ করে তার ফলেও মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা, মাঝে মাঝে কোষ্ঠবদ্ধতা—তথা পায়খানা

অপরিস্কারের ঘটনা ঘটে। আমাদের দেশে এসব রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। এর সমাধানও পায়খানা পরিস্কারের দাওয়াই নয়। সুযোগ থাকলে পায়খানা পরীক্ষা করে ঠিক কি পরজীবীর আক্রমণ ঘটেছে তা নির্ণয় করে সুনির্দিষ্ট ওষুধ দেওয়া দরকার।

কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এদের প্রতিরোধ। দেশের সকলের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিতপরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের ফলে স্থায়ীভাবে এগুলি দূর করা যায়। অনেক দেশে তা করা গেছেও, অন্তত অনেক কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। জল ফুটিয়ে খেলে কিছুটা উপকার হয়, বিশেষত বস্তি বা গ্রামাঞ্চলে যেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ নেই। বাস্তবত এটিও কিন্তু একটি অবাস্তব ব্যাপার। কারণ এসব মানুষের কাছে জ্বালানীর সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। দিনের পর দিন গেরস্থালি আর রান্নাবান্নার কাজের বাইরে খাওয়ার জল ফোটানর সময় বের করাও সামর্থ্যের বাইরে থাকে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটি দেশীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত—সরকারী আন্তরিকতা থাকলে, স্বাধীনতার এত বছরের মধ্যে দেশের সর্বত্র পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ করার সমান্য কাজটুকু অন্তত করা যেত।*

* দেশের মানুষের জন্য ভাবলে, জনহিতকর এসব নানা প্রকল্প আমাদের সরকারই, আমাদের দেশের লোকেদের দিয়ে করাতে পারেন। "দরকার হলে যে ভারতীয় কর্মকর্তারা 'যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে' প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারেন তা দেখা গেল 'এশিয়ান ক্রীড়ার' জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে স্টেডিয়াম, হোটেল, রাস্তা, ফ্লাইওভার, বাসগৃহ ইত্যাদির নির্মাণে। সামাজিক অপচয়মূলক প্রকল্পে যে দক্ষতা দেখা গিয়েছিল, তা বিদ্যুৎ বা অন্যান্য জনহিতকর প্রকল্পের জন্য কেন পাওয়া যাবে না এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। আসল উত্তর হল যে, সংকল্প থাকলেই প্রকল্প সফল হয়।"

(ভারতের আর্থিক উন্নয়ন; ভবতোষ দত্ত; ১৯৮৪)

(১১)

গ্যাসে গ্যাস

অম্বল, বদহজম, পায়খানা পরিস্কার না হওয়ার মত পেটে গ্যাস বেশী হওয়া আরেকটি অস্বস্তিকর ব্যাপার। আর ঐ সবের মত গ্যাসের জন্যও কত মানুষ হন্যে হয়ে হাতের কাছে যা পান তাই সেবন করেন—একটু আশ্বাস পেলেই। উপকরণেরও ঘাটতি নেই, এনজাইম যুক্ত পূর্বোক্ত নানাবিধ 'ওষুধ'সহ হাটে বাজারে বা পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জোরে বিক্রি করা হয় 'গ্যাস' নামাঙ্কিত নানা পদার্থ—গ্যাসট্রো, গ্যাসট্রোজেন, গ্যাসানল,গ্যাসকালান্তক—আরো কত মনোহারী নামের 'অব্যর্থ পদার্থ'। এদের দাবী সহজ সরল—"গ্যাসের কষ্ট সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করে।" বিজ্ঞাপনে পণ্যটির নাম বিরাট করে লেখা আর বিরাট করে লেখা গ্যাসের কষ্টের কথা। ছোট ছোট করে লেখা থাকে নানা মজার কথা। "খাদ্য যখন ভালভাবে হজম হয় না, তখন পেটে গ্যাস জমে। শুরু হয় গ্যাসের অসহ্য যন্ত্রণা। লক্ষণ হলো বদ্‌গ্যাস, উদ্‌গার, খিদে না হওয়া, কখনো ভয়ানক খাওয়ার ইচ্ছা, ঝিমুনি, ক্লান্তি, হাঁপানি, আলসেমি, মেজাজ বিগড়ানো, উত্তেজনা, পেটে জ্বালা ও যন্ত্রণা, পেট ব্যথা, ঘন ঘন বিস্বাদ লাগা, প্রচণ্ড অম্বল, দম বন্ধ হয়ে আসা, পাঁজরে ও গাঁটে দারুণ ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তলপেটে ভার বোধ, পাকস্থলী বড় হওয়া, হৃদপিণ্ডে জ্বালা ও ধড়ফড়ানি, উৎকণ্ঠা, রক্তশূন্যতা, মাথা ঘোরা, বুকে সর্দিজমা, কাশি, শারীরিক ক্লান্তি ইত্যাদি। গ্যাসের রোগে এই সব কষ্ট হয়।" 'গ্যাসের রোগের' লক্ষণগুলির তালিকা কি বিরাট! শরীরের হেন কোন কষ্ট নেই যাকে এর মধ্যে ঢোকান হয় নি। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট—এসব যাবতীয় কষ্টে নিজেদের পণ্যটিকে ব্যবহারযোগ্য বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং বিক্রি বাড়ান। কিছুদিন আগে একটি শারদীয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'গ্যাসট্রোজেন'-এর বিজ্ঞাপন থেকে এটি সংগৃহীত হলেও, অন্যান্যরা ব্যতিক্রম নয়—কেউ কম, কেউ বেশী। আর এনজাইম ঘটিত তথাকথিত নানা ওষুধের মত গ্যাস-এর জন্য এসব পদার্থেও থাকে নানা ধরনের গাছগাছড়ার নির্যাস—জোয়ান, মেথি, দারুহরিদ্রা ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাস্কর লবণ জাতীয় কিছু পদার্থ, কিছু কৃত্রিম এনজাইমও কেউ কেউ মেশায়।

কিন্তু আদৌ কি এ ধরনের ওষুধের দরকার থাকে? প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে ঔষধপদবাচ্য পদার্থ হিসেবে ধরা হয় না এবং গ্যাসের রোগ বলে আলাদা কোন রোগও নাই। আমাদের পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে খাবার হজমের প্রক্রিয়াতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন প্রায় দেড় লিটার গ্যাস তৈরী হয়, যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই পরিমাণের কিছু হেরফের হতে পারে।

এই গ্যাস-এ থাকে ইণ্ডোল ও স্ক্যাটোল নামক পদার্থ। এদের জন্যই পেটে তৈরী হওয়া গ্যাস পায়খানার দবার দিয়ে বেরোনোর পর তাতে গন্ধ পাওয়া যায়। এদের পরিমাণের হেরফেরের উপর এই গন্ধেরও তারতম্য ঘটে। এছাড়া কার্বনডাই

অক্সাইড, হাইড্রোজেন, মিথেন ইত্যাদি গ্যাসও তৈরী হয়। পেটের ভেতরে তৈরী হওয়া এইসব গ্যাসের পরিমাণ মূলত নির্ভর করে কি খাবার খাওয়া হচ্ছে তার উপর। বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, শাক, শিম জাতীয় সজি, ডাল ইত্যাদি খাবারে বিশেষ ধরনের শর্করাজাতীয় উপাদান থাকে (nonabsorbable sugar বা undigestible polysachharides)। এর সাথে অন্ত্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকা অজস্র ব্যাকটেরিয়া বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্যাস তৈরী করে। তাই এধরনের খাবার বেশী খেলে অনেকের পেটেই গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বার বার মলদবার দিয়ে গ্যাস নিস্ক্রমণে। এর চিকিৎসা তথাকথিত গ্যাসের ওষুধগুলি নয়—খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং বিশেষ কোন্ খাবার খেয়ে গ্যাস বেশী তৈরী হচ্ছে তা সতর্কভাবে নির্ধারণ করে সেটি কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়ার ফলেই 'গ্যাস' কমিয়ে ফেলা যায়।

কারো কারোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ খুব বেশী থাকলেও গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। পেটের মধ্যে হওয়া কিছু অস্ত্রোপচারের পরে, ডায়াবিটিস হলে বা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কাজ কম হলে, পেটের মধ্যে ফিশ্চুলা হয়ে গেলে (যেমন পাকস্থলী থেকে বৃহদন্ত্রে, ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রে ইত্যাদি)—এধরনের কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটতে পারে। কিন্তু স্পষ্টতঃই এসবই সাধারণভাবে দেখা যায় না এবং এদের অন্যান্য লক্ষণও থাকবে। অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস-এর কাজ কম হলেও এটি ঘটতে পারে—কিন্তু এটি একটি বিরল রোগ, সঙ্গে এরও অন্যান্য লক্ষণ থাকবে। এবং এদের কোনটির চিকিৎসাই তথাকথিত গ্যাসের দাওয়াই আদৌ নয়। বিশেষ রোগের জন্য বিশেষ ওষুধ, অস্ত্রোপচার ইত্যাদির প্রয়োজন।

আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খুব সাধারণ যে রোগের জন্য পেটের গণ্ডগোল ও গ্যাস বেশী হয় তা হল ট্রপিক্যাল স্প্রু (tropical sprue)। এর থেকে ক্ষুধামন্দ্য, পাতলা পায়খানা, অপুষ্টি, রক্তহীনতা (তথা খাবারের শোষণ ঠিক না হওয়ার কারণে নানা লক্ষণ—ভিটামিনের অভাব ইত্যাদি) ও পেট ফাঁপা দেখা দেয়। অন্ত্রের মধ্যে বিশেষ ধরনের জীবাণুর উপস্থিতি, তাদের থেকে বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বিশেষ কোন খাবার থেকে কোন ক্ষতিকর পদার্থের (toxin) ক্ষরণের জন্য এসব লক্ষণ দেখা দেয়। এর সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে ২-৪ সপ্তাহ ধরে সালফোনামাইড, বা টেট্রাসাইক্লিন ওষুধ, সঙ্গে ভিটামিন বি-১২ ও ফোলিক এ্যাসিড (অন্য হাবিজাবি ভিটামিন-এর জগাখিচুড়ি নয়—অবশ্যি ব্যবসায়িক কারণে বাজারে আলাদাভাবে এ দুটিকে পাওয়া মুস্কিল)। স্পষ্টতঃ আমাদের দেশে পেটের গণ্ডগোল তথা 'গ্যাসে' যাঁরা ভোগেন তাঁদের অনেকেই ভোগেন এই রোগে এবং এরও চিকিৎসা গ্যাসের বাজারচলতি ওষুধগুলি নয়। বরং এ সব তথাকথিত ওষুধের ব্যবহারে নিতান্তই সাময়িক কিছু উপকার হলেও তাতে মূল রোগটি চাপা

পড়ে জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি হয়, কষ্টগুলি স্থায়ীও হয়ে যায়।

পাকস্থলীর উপরের অংশে অত্যধিক গ্যাস জমলে পেটে অস্বস্তি ও বুকে ব্যথা হতে পারে। এর সাথে হৃদপিণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই, তবে এ ব্যথা ও অসুবিধাগুলি তীব্র আকারও ধারণ করতে পারে। অনেক সময় একই সাথে বৃহদন্ত্রে গ্যাস জমে পাকস্থলীটি বৃহদন্ত্রের ওপর দিয়ে ঘুরে যায় (Cup-and-spill deformity)। এ অবস্থার জন্য গ্যাসের ওষুধগুলি তো নয়ই, কোন বিশেষ ধরনের চিকিৎসারই প্রায় প্রয়োজন হয় না। শোয়া-বসার অবস্থানের পরিবর্তন করলে ও আশ্বাস দিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটালেই কষ্টগুলো চলে যায় (Usually no spceial treatment is necessary exept explanation....)। এ ধরনের 'গ্যাসের' কষ্টের জন্য অম্বল-গ্যাসের বাজার চলতি ওষুধ খেয়ে অনেকে বলেন যে, কিছুক্ষণ পরে কষ্ট কমল। ব্যাপারটি ঘটে কিছু সময় কেটে যাওয়া আর রোগীর নড়াচড়ার ফলেই। খুব বিরল ক্ষেত্রে এ অবস্থার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

পেটে গ্যাস বেশী জমার আর একটি বড় কারণ অজান্তে মুখ দিয়ে বাতাস খাওয়া (aerophagia)। বাস্তবত অন্ত্রের ভেতরে যে গ্যাস থাকে তার ২০-৬০% অংশই ঐ ব্যক্তির নিজের খাওয়া গ্যাস—তা খাবারদাবারের মাধ্যমেই হোক, তথাকথিত ঢেকুর তোলার অভ্যাসের জন্যই হোক— যাতে পেট থেকে গ্যাস না বেরিয়ে প্রকৃতপক্ষে পেটের ভেতর গ্যাস বা হাওয়াই ঢোকে। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, খুব অল্প পরিমাণে খাওয়ার অভ্যাসের কারণেও অনেকে নিজের অজান্তে অনেক বেশী হাওয়া খেয়ে ফেলেন। খাবারে চর্বি জাতীয় উপাদান বেশী থাকলে (যেমন প্রচুর ঘি-তেল-মাখন দিয়ে রান্না করা খাবার) তার ফলে অন্ত্রের মধ্যে খাদ্যের তথা খেয়ে ফেলা বাতাসের সঞ্চালন অনেক কমে যায়। ফলে পেট অনেকক্ষণ ভারী লাগে এবং ঐ বাতাস অনেকক্ষণ পেটে জমে থেকে 'গ্যাসের কষ্টের' সৃষ্টি করে। পায়খানা হওয়ার পর বা মলদ্বার দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার (flatus) পর এ কষ্ট চলে যায়। এরও চিকিৎসা ঐ গ্যাসের ওষুধাবলী নয়।

তথাকথিত গ্যাসের কষ্টের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রচলিত ওষুধপত্রের কার্যকারিতার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলেও বাজারে যে সব ওষুধ পাওয়া যায় অনেকে তা খান, কেউ কেউ উপকার পান বলেও বলে থাকেন। এই উপকার পাওয়ার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক কিছু ব্যাপার, কিছু সময় কেটে যাওয়া, নড়াচড়া, মলদ্বার দিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া-র ব্যাপারগুলিই থাকে প্রধান। তবু অনিশ্চিত কার্যকারিতার কিছু ওষুধের সন্দেহজনক কিছু ভূমিকাও থাকে। যেমন—পাকস্থলী ও অন্ত্রের গ্যাস বের করানোর জন্য কার্মিনেটিভ মিক্সচার নামে বা এই ধরনের নানা নামের বিভিন্ন কোম্পানির কিছু ওষুধে থাকে পেপারমিন্ট, শুলফা-মৌরী জাতীয় কিছু গাছগাছড়ার নির্যাস ইত্যাদি। এটি কিভাবে কাজ করে তার কোন প্রমাণ নেই।

সক্রিয় কাঠকয়লাও অনেকে গ্যাস শোষণ করার 'সদুদ্দেশ্য' কাজে লাগায়। এরও কর্মপদ্ধতি অপ্রমাণিত। মিথাইল পলিসিলোক্সোন (MPS) নামে আর একটি পদার্থের কথাও বলা হয় যা পৃষ্ঠটান কমিয়ে গ্যাসের ছোট বুদ্বুদগুলোকে ফাটিয়ে বড় বুদ্বুদ তৈরী করে ও এই ভাবে গ্যাসনিস্ক্রমণেসাহায্য করে। জেলুসিল এম পি এস, ডাইজিন জেল, ডায়োভল, এলুসিনল, এ্যালমাকার্ব, এলুজেল, ডিসিলক্স, পেপটিকা, প্যারাক্টল, পলিক্রল ফোর্ট জেল, সাইলোক্সোজেন, সাইমেকো ইত্যাদি বাজার চলতি বেশ কিছু অম্বলবিরোধী ওষুধে অন্যান্য পদার্থের সাথে এ পদার্থটিও মেশান থাকে। কিন্তু যতটা দাবী করা হয় এটি ততটা কার্যকরী কিনা সন্দেহ। গ্যাস-পেটফাঁপায় এর কার্যকারিতা ও পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ আবরণীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকার সম্পর্কে দাবীগুলি উপযুক্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে ("Claims of clinical usefulness for the relief of flatulence as well as the claim that it protectively coats mucous membranes require supportive evidence"—Laurence)। তা সত্ত্বেও এটিকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে দু পয়সা কামান চলে। এর একটা সুবিধে হচ্ছে, এগুলি মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় খেলে বিরাট কিছু ক্ষতি করে না। অন্য সুবিধে হচ্ছে, টনিকের মতই, এ ধরনের পদার্থ যে সব কষ্টের জন্য দেওয়া হয় (অর্থাৎ পেটফাঁপা, গ্যাস, অম্বল ইত্যাদি) সেগুলি অনেক সময় আপনা থেকেই শরীরের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চলে যায় এবং প্রায়শঃই এসব কষ্টের বাড়া-কমা রোগীর মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ডাক্তাররাও রোগীর মন বুঝে তার চাহিদাকে 'সম্মান' দেওয়ার জন্য রোগীকে আশ্বাস দিয়ে ওষুধের নিদান দিয়ে যান।

সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে, অপ্রয়োজনে এসব সন্দেহজনক কার্যকারিতার মালকড়ির উপর নির্ভরতার মানসিকতার ব্যাপক বৃদ্ধি। এর আগে এনজাইম বা পায়খানা পরিস্কার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে গ্যাসের তথাকথিত কষ্টের নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্যও একইভাবে উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, ছোটবেলা থেকে শারীরিক শ্রম, পায়খানা চেপে না রাখা, পরিশ্রুত পানীয় জল, নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা না করে বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলে বা নানা ডাক্তারের পরামর্শে কিংবা নিজের বিদ্যায় একবার গ্যাসট্রো, একবার জেলুসিল এম পি এস, কিছুদিন গ্যাসানল, কিছুদিন পলিক্রল ফোর্ট জেল জাতীয় ওষুধ খেয়ে গেলে মূল কষ্ট কিন্তু সারে না। গ্যাসের কষ্ট কমানোর জন্য প্রচলিত এ সব পদার্থের দাবীগুলিও প্রায়শঃই গ্যাস দেওয়া কথাবার্তা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় গ্যাসের জন্য কোন ওষুধই নেই। মূল তালিকায় অম্বল ও পেপটিক আলসারের জন্য এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও সিমেটিডিন-এর উল্লেখ আছে, তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য সক্রিয় চারকোলের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে জাতীয় ওষুধ নীতি

ঘোষিত হওয়ার পর, "যে সব ওষুধের কার্যকারিতা সন্দেহজনক, অনুপস্থিত কিংবা একান্তই নগণ্য এবং যে সব ওষুধ অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও অপব্যবহার প্রচুর"—এই বলে যেগুলি বাতিল করা হয়েছে তার মধ্যে নানা হাবিজাবি মিশিয়ে তথাকথিত গ্যাসের ওষুধগুলিও রয়েছে যেমন, গ্যাসট্রিল, গেসটাজিল লিকুইড, গেসটাসিড পাউডার ইত্যাদি।

কিন্তু না, আমাদের দেশের মানুষের 'গ্যাসের কষ্টের' জন্য গ্যাস দেওয়া নানা পদার্থের অবাধ ব্যবসা এখনো বাধাহীন—আরো অজস্র অপ্রয়োজনীয়, স্বল্পপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ওষুধের মতই।

(১২)
অম্বল-পেপটিক আলসার ও তার ওষুধ

পাকস্থলীর ভেতরে স্বাভাবিকভাবে বেরোয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিন নামক প্রোটিন-হজমকারী উৎসেচক। সাধারণভাবে ধারণা যে এই অ্যাসিড-এর বেশী ক্ষরণ হলে পাকস্থলী (gastric ulcer) বা তার পরবর্তী অংশ ডুওডেনাম (duodenal ulcer)-এ ক্ষত হতে পারে। কিন্তু পাকস্থলীর ক্ষতের ক্ষেত্রে এই অ্যাসিডের ক্ষরণ বেশী নাও হতে পারে, এমনকি কমও হতে পারে। যকৃৎ থেকে বেরোন বাইল অ্যাসিড পিছু হটে পাকস্থলীতে আসার ফলেও এখানে আলসার হতে পারে। জন্মগতভাবে পাকস্থলীর দেওয়ালের কোন অংশের দুর্বলতা বা অস্বাভাবিকত্ব অথবা ব্যথা কমানোর নানা ওষুধ (যেমন অ্যাস্পিরিন, প্যারাসিটামল, ইণ্ডোমেথাসিন ইত্যাদি) বা অন্যানা কিছু ওষুধ ও রাসায়নিক পদার্থ, এবং লঙ্কা বা উত্তেজক কোন খাবার ইত্যাদির কারণে পাকস্থলীর দেওয়াল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মূলত আলসার হয়। ডুওডেনাল আলসারের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত অ্যাসিড ক্ষরণের ঘটনা জড়িত আছে। তবে এখানে আলসার হওয়ার পেছনে জীনগত (genetic) কারণ, ও ধূমপান-এর ভূমিকা বিরাট। মানসিক কিছু ব্যাপার—যেমন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিও কিছুটা ভূমিকা পালন করে যদিও এর ওপর আগে যতটা জোর দেওয়া হত, এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ দু'জায়গার আলসার সৃষ্টির পেছনে পেপসিন উৎসেচকের অবদানের জন্য দুটিকেই পেপটিক আলসার হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এখনো এর সৃষ্টির মূলে সঠিক কারণগুলিকে চূড়ান্তভাবে জানা যায়নি।

যাইহোক, এর চিকিৎসায় অ্যাসিড প্রশমনকারী ক্ষারজাতীয় পদার্থ, এণ্টাসিডের ভূমিকা বিরাট। এণ্টাসিড প্রয়োজনীয় ওষুধের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মুস্কিল হয় এর যথেচ্ছ ব্যবহারে। তাছাড়া এর ওপর যতটা গুরুত্ব সাধারণ মানুষ ও কিছু চিকিৎসকও আরোপ করেন ততটা গুরুত্বপূর্ণ এ নয় এবং ব্যাপক প্রয়োগের ব্যাপারটিও বাড়াবাড়ি। যেমন, দেখা গেছে ডুওডেনাল আলসারের রোগীদের দু'দলে ভাগ করে, এক দলকে এণ্টাসিড দেওয়া হল, আরেক দলকে এণ্টাসিড না দিয়ে কার্যকারিতাহীন অন্য ওষুধ (placebo) দেওয়া হল কিন্তু রোগী জানল যে তাকে এণ্টাসিডই দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে যারা এণ্টাসিড খেয়েছে তাদের ৭৮% ও যারা এণ্টাসিডের নাম করে কার্যকারিতাহীন ওষুধ খেয়েছে তাদের ৪৫%-এর আলসার নিরাময় হয়েছে (ওষুধ দেওয়া হয়েছিল খাওয়ার ১ ঘণ্টা ও ৩ ঘণ্টা পরে ও রাত্রে শোওয়ার সময়—এক আউন্স বা প্রায় ৬ চামচ করে)। (Harrison's) এ থেকে বোঝা যায়, এণ্টাসিড নিঃসন্দেহে ডুওডেনাল আলসারের নিরাময়ে ভূমিকা রাখে; কিন্তু পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, এটি ছাড়াই প্রায় অর্ধেক রোগীর আলসার আপনিই নিরাময় হয়, শুধু মানসিক আশ্বাসে বা নিজস্ব ক্ষমতায়। তাছাড়া অন্তত কিছু জনের ক্ষেত্রে (এখানে ২২%) এণ্টাসিডও ক্ষত নিরাময়ে কার্যকারী নয়। আর

গ্যাসট্রিক আলসারের ক্ষেত্রে দিতে হলে তুলনামূলক কম পরিমাণের এন্টাসিডই যথেষ্ট, কারণ এক্ষেত্রে অ্যাসিডক্ষরণ এমন কিছু বেশী হয় না। সঠিক কি পরিমাণে এন্টাসিড দিলে সর্বোৎকৃষ্ট উপকার পাওয়া যাবে তা এখনো যানা যায়নি। তবে সাধারণভাবে ৩-৬ চামচ তরল এন্টাসিড খাওয়ার ১ ও ৩ ঘণ্টা পরে ও রাত্রে শোওয়ার আগে দেওয়া যায়। (এছাড়া উভয়ের ক্ষেত্রেই সাইমেটিডিন, কার্বেনেক্সোলোন, ইত্যাদি নানা ওষুধও ট্যাবলেট আকারে দেওয়া হয়।) সম্পূর্ণ চিকিৎসা অন্তত ৪-৮ সপ্তাহ পুরোদমে চালানর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এর প্রয়োজন হয়, আলসার হয়ে গেছে এটি সুনিশ্চিত হওয়ার পর। আর অম্বল হলেই যখন তখন বা দীর্ঘদিন ধরে এন্টাসিড খেলে সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি না হলেও অন্ত্র থেকে ফসফরাস ঘটিত লবণের শোষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শরীরে এর অভাব দেখা দিতে পারে, যার ফলে হাড় ও দাঁতের রোগসহ আরো নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পেপটিক আলসার-এর রোগীদের চা, কফি (অর্থাৎ ক্যাফিনযুক্ত পানীয়, মদ্যপান, ধূমপান—এগুলো একেবারেই নিষিদ্ধ করা দরকার।

পেপটিক আলসার প্রতিরোধেও এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খালিপেটে বা অপ্রয়োজনে-সামান্য প্রয়োজনে ব্যথা কমানোর ওষুধ, যেমন অ্যাস্পিরিন, ইত্যাদি না খাওয়া।

পেপটিক আলসারের চিকিৎসায় খাবারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও দুধ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে দীর্ঘদিন ধরে একটা ধারণা চালু রয়েছে। কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষাদির ফলে দেখা যাচ্ছে এগুলি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। মসলাহীন নরম খাবার, ঘনঘন দুধ খাওয়া ইত্যাদির ফলে অ্যাসিডক্ষরণও কমে না, আলসার নিরাময়ও দ্রুততর হয় না। বরং দুধ-এর প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম অ্যাসিডক্ষরণ বাড়িয়েই দেয়। তাছাড়া বেশি দুধ খেলে ভিন্নতর রোগ (milk-alkali syndrome)-এর সৃষ্টি হয়। এরফলে রক্তবহানালীর স্থায়ী পরিবর্তন (atherosclerosis)-ও দ্রুততর হয়। বড়জোর বিশেষ কোন খাবারে অস্বস্তি বোধ হলে সেটি পরিহার করার পরামর্শ দেওয়া যায় আর অতিরিক্ত লংকাও বাদ দেওয়া যায়। ক্ষতিকর খাবার দাবার (যেমন মাত্রাতিরিক্ত তেল-মশলা-লংকা, এলকোহল, চা-কফি ইত্যাদি) না খেয়ে স্বাভাবিক সাধারণ খাবারের সাথে এন্টাসিড ও প্রয়োজনে অন্যান্য ওষুধ (যেমন সাইমেটিডিন) খেলেই এর চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে হয়। ৪-৮ সপ্তাহের মধ্যে কষ্ট না কমলে বিশেষত পাকস্থলীর আলসারের ক্ষেত্রে ও বয়স্কদের মধ্যে, ক্যান্সারের সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখা উচিত। পরবর্তীকালে অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হতে পারে।

এন্টাসিড মারাত্মক ক্ষতিকর নয় ও প্রয়োজনীয়ই। সর্বোৎকৃষ্ট এন্টাসিড অ্যাসিডকে পরিপূর্ণভাবে প্রশমন করবে, খরচ কম হবে, পরিপাকতন্ত্র থেকে শোষিত হবে না, খেতে ভাল হবে, তাতে সোডিয়ামের পরিমাণ হবে নূন্যতম, এবং

কোন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকবে না ; কিন্তু এখনো এ ধরনের কোন এণ্টাসিড আবিস্কৃত হয় নি। (Harrison's) তাই 'নেই মামার চেয়ে কানামামা ভাল' করে এদিক ওদিক যা পাওয়া যায় তাই মিশিয়ে বাজারে প্রচুর এণ্টাসিড নানা নামে চালু রয়েছে। অম্বল বিরোধি উপাদান হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা শুধু এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের উল্লেখ করেছে এবং বাস্তবতঃ এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড একত্রে তরল আকারে দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু বাজারে শুধু তরল আকারে নয়, ব্যবহারের সুবিধার জন্য ট্যাবলেট আকারেও এণ্টাসিড পাওয়া যায়। আর এসবে পূর্বোক্ত ২-৩টি ছাড়া অনা উপাদানও থাকে বহু। যেমন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস-এর এসিডিন-এ থাকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও সোডিয়াম বাইকার্বনেট, গ্লাক্সোর এলমাকার্বে আছে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট। অথচ সোডিয়াম বাইকার্বনেটে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশী থাকায় (এবং এর ফলে systemic alkalosis নামক অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায়) এণ্টাসিড হিসেবে এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় ("it should not be used as an antacid in treatment of peptic ulcer"—Harrison)। ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এরও নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ (Because of its potential side effects, calcium carbonate is not recommended for use as an antacid for treatment of peptic ulcer—ঐ)। এণ্টাসিড হিসেবে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের ব্যবহারকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সন্দেহজনক কার্যকারিতা সত্ত্বেও গ্যাস বের করানোর জন্যে মিথাইল পলিসিলোক্সনও(MPS) অনেকে মিশিয়ে দেয়—এর ফলে দাম সুনিশ্চিতভাবে বাড়ে, কিন্তু গ্যাস কতটা বেরোয় এবং সুফল কতটা হয় তা নিশ্চিত নয়। তবু এলুজেল ডি এফ (ইউনিকেম), এলমাকার্ব (গ্লাক্সো), এলমাজেল(আই ডি পি এল), এলুসিনল (ফ্রাংকো ইণ্ডিয়ান), ডাইজিন (বুটস), পলিক্রল ফোর্টজেল (নিকোলাস), ডায়োভল (কার্টার ওয়ালেস), ডিসিলক্স (স্ট্যাডমেড), ডিসোজেল (কনসেপ্ট), লোগাসিড (এ্যাস্ট্রা—আই ডি এল), নিউট্রালন (নিকোলাস), পেপটিকা (জেনো), সাইমেকো (ওয়ায়েথ), সোলাসিড (দে'জ) ইত্যাদি নানা এণ্টাসিডেই এটি যথেচ্ছ মেশান রয়েছে। কেউ আবার সাথে বেলেডোনাও মিশিয়ে দেয় যেমন এসিডিন, নিউট্রাডোনা ইত্যাদি। অথচ এটি অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। নানা কারণে গ্যাস্ট্রিক আলসারে এর ব্যবহারও যুক্তিযুক্ত নয় ("does not appear justified")। ডুয়োডেনাল আলসারে তবু ব্যবহার করা যায়। তবে যাদের প্রস্রাব আটকে যাওয়ার রোগ আছে বা ছিল, চোখে গ্লকোমা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়। মুখ শুকিয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, হৃদপিণ্ডের অনিয়মিত সঞ্চালন,

প্রস্রাব আটকে যাওয়া ইত্যাদি এর কয়েকটি কষ্টকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। কেউ আবার এণ্টাসিডের সাথে মিশিয়ে দেয় ঘুমের ওষুধ যেমন পেপটিকা নামক ওষুধে। কেউ মেশায় যষ্টিমধু (liquorice)—যেমন এলমাকার্ব, ডিসোজেল-এ। এইভাবে নানা ধরনের অজস্র জিনিসপত্র মিশিয়ে ওষুধের দাম বাড়ছে, ব্যবসা চলছে। ওয়ায়েথ-এর এলুড্রক্স (শধু এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড), ওয়ার্ণার-এর জেলুসিল (ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট ও এ্যালু হাইড্রক্সাইড) ইত্যাদির মত দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাদামাটা ওষুধ পাওয়া মুস্কিল। শুধু এলুমিনিয়াম ও ম্যাগনে-সিয়াম হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণ নেইই; যা আছে তা অন্য অনেক কিছুর সাথে মিশিয়ে—যেমন এলুজেল, ডিসিলক্স, ডায়োভল, লোগাসিড, এলমাজেল, সাইলক্সো-জিন, সাইমেকো, সাইলক্স ফোর্ট ইত্যাদিতে। অন্যান্য এণ্টাসিড পদার্থ মিশিয়ে কাজ যদি ভাল হত তাও বোঝা যায়, কিন্তু আদৌ তা হয় না। নীচের তালিকাটি দেখে তা বোঝা যাবে

উপাদানের নাম	এক আউন্স পরিমাণ যে মাত্রার এ্যাসিডকে প্রশমণ করে, তার একক
শুধু অ্যালু ও ম্যাগ হাইড্রক্সাইড	২৫৬
ঐ + সাইমেথিকন	১২৪
ঐ + ক্যালসিয়াম কার্বনেট	১০৮
এ্যালু কার্বনেট	১০০
ম্যাগ ট্রাই সিলিকেট ও এ্যালু-হাইড্রক্সাইড (যেমন জেলুসিল-এ)	৪০-৫২
ম্যাগ-ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট + এ্যালু হাইড্রক্সাইড + ম্যাগ হাইড্রক্সাইড	৭০ ইত্যাদি

আমেরিকার বাজারে চালু বিভিন্ন ওষুধের উপাদান অনুযায়ী পরীক্ষা করে এটি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের দেশেও একই ছবি। এ তালিকার বিস্তারিত ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই, তবে এথেকে একটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নানা নামে নানা দামে যে অজস্র এণ্টাসিড পাওয়া যায় তার সবগুলি সমান কার্যকরী তো নয়ই, বাজারে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী একটি এণ্টাসিড চালু রাখাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমেরিকার মত আমাদের দেশেও তা চলতে দেওয়া হয় না—যাতে সাধারণ মানুষের পকেট কেটে দেশী-বিদেশী ওষুধ কোম্পানিগুলি ব্যবসা করতে পারে।

এণ্টাসিডের উপাদানগুলির দাম এমন কিছু বেশী নয়। তাই সহজেই এ ওষুধ

(এবং আরো নানা ওষুধও) অনেক কম দামে বিক্রি করা যায়। অথচ প্রতিযোগিতার জন্য নানা কিছু মিশিয়ে দামের হেরফের করা হয়।
যেমন :

ওষুধের নাম	প্রায় ১৭০ মিলি-এর দাম
এলুড্রক্স	৪ টাকা
ডিসিলক্স	৮ টাকা
ডাইজিন জেল	৬ টাকা
ডায়োভল	৭ টাকা
জেলুসিল	৬ টাকা
জেলুসিল এম পি এস	৮ টাকা
সাইমেকো	৭ টাকা
	ইত্যাদি

আমাদের প্রতিবেশী বাংলা দেশে এ কারণে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির তৈরি এলুড্রক্স, হাইপসিড, সিমকো, এ্ভলোসিড, এণ্টাসিল ইত্যাদি নানা নামের এণ্টাসিড বাতিল করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এ সব "ঔষুধের প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত সহজ তৈরি করতে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কোন প্রয়োজন নেই, দেশী কোম্পানিগুলি অনায়াসেই উৎপাদন করতে প্যারে। যেখানে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আরো বিনিয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ কাংখিত, সেখানে অতি সাধারণ যেসব ওষুধ উৎপাদন করে তারা দেশীয় শিল্পের বিকাশে বাধা দিচ্ছে, সে ওষুধসমূহ তৈরি করতে বিদেশী কোম্পানিগুলিকে অনুমতি দেওয়া হবে না।"

(১৩)

গ্ল্যাক্সোজ-ডি, গ্লুকোন-সি

"গ্লাক্সোজ-ডি: গ্লুকোজ, ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম গ্লিসারো-ফসফেটের মিশ্রণ। শুধু গ্লুকোজ যথেষ্ট। বাকী দুটো উপাদান বাদ দিতে হবে। দাম কমবে।" বাংলাদেশেগ্ল্যাক্সোকোম্পানির গ্লাক্সোজ-ডি বাতিলের প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করা হয়েছে। আমাদের দেশে কিন্তু তা এখনো চলছে, নাম পাল্টান হয়েছে গ্লুকোন-ডি বলে। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পনি গ্ল্যাক্সো তার গ্লুকোন-ডি'র বিক্রি বাড়ানর জন্য আরো নানা সুচতুর ব্যবসায়ীর মত 'বিনামূল্যে' উপহারও দেয়। অবশ্যই এই সব 'বিনামূল্যের উপহার'-এর দামটা কিন্তু ক্রেতার পকেট থেকেই যায়।

যাই হোক গ্লুকোন-ডির সম্পর্কে বলা হয় এটি নিমেষে শক্তি যোগায়। তার কারণ এতে রয়েছে ডেক্সট্রোজ যা খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়ে গিয়ে শক্তির যোগান দেয়—প্রতি গ্রাম পিছু ৪ ক্যালরি করে। তাই ক্লান্ত খেলোয়াড়, গৃহবধূ, ছাত্র-ছাত্রী বা অফিসফেরতা মানুষেরা এই দ্রব্যটি খেলে তাঁরা নাকি নিমেষে শক্তি পেয়ে সব ক্লান্তি দূর করতে পারবেন। আর সঙ্গে দেওয়া আছে ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি।

নিছক ব্যবসা করার জন্য মানুষকে এভাবে ঠকানটা কিন্তু অনেকেই ধরতে পারেন না। ধরতে পারেন না কারণ সুচতুর প্রচার। সাধারণ চিনি, গুড়, ভাত ইত্যাদি থেকেও আমরা ঐ ডেক্সট্রোজ তথা গ্লুকোজ-এর মত কার্বোহাইড্রেট পাই। ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজ-এর অণু কিছু সরল বলে এটি মিনিট পনেরর মধ্যে হজম হয়ে শক্তি জোগায়। হ্যাঁ, মিনিট পনের লাগেই, নিমেষে আদৌ নয়। অন্য দিকে চিনির দেওয়া শক্তি শরীরের কাজে লাগতে সময় লাগে বড়জোর আধঘণ্টা। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অনুযায়ী নিমেষে শক্তির কথাটি তো মিথ্যে বটেই, এমনকি তা সাধারণ চিনির থেকে এমন কিছু আগেও নয়। গ্লুকোন-ডি আর চিনির দেওয়া শক্তির মধ্যেও কোন তফাৎ নেই। দু'টোরই প্রতিগ্রাম থেকে একই পরিমাণ অর্থাৎ ৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। নিছকশক্তি যোগান দেওয়া ছাড়া গ্লুকোজের রোগ সারানোরও কোন ক্ষমতা নেই।

শুধু কয়েকমিনিট আগে শক্তি পাওয়ার জন্য দাম দিতে হচ্ছে কিন্তু চিনির চেয়ে অনেক বেশী। ৪০০ গ্রাম গ্লুকোন-ডি-তে ৪০০ গ্রামের সামান্য কম গ্লুকোজ থাকে, তার দাম প্রায় ১৫ টাকা ; অন্যদিকে এই পরিমাণ চিনির দাম বড়জোর ৩ বা সাড়ে তিন টাকা। অথচ গ্ল্যাক্সো তার বিজ্ঞাপনে বলে "মাগির চিনি মেশানর দরকার নেই।" চাতুরিটা এখানেই। নিমেষে শক্তি দেওয়ার মিথ্যে কথা বলে আর চিনির চেয়ে সামান্য কিছু আগে শক্তির যোগান দিয়ে গাঁটকাটার ব্যবস্থা। যে কিনে খাচ্ছে সে কিছু মানসিক সান্ত্বনা অবশ্য পায়—দাম দিয়ে মোড়কে ভরা চিনি গুঁড়ো খাওয়ার আনন্দও পায়।

আরো পায় ঐ ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি। অবশ্যি সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে। এ সম্পর্কে টনিক প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। মোদ্দা কথা হল

মিথ্যে কথার ফুলঝুরি

এসবের অভাব সাধারণভাবে ঘটেই না, যদি অভাব ঘটে তবে তা গ্লুকোন-ডি-র মাধ্যমে খেলে মিটবে না, প্রয়োজন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা।

সব মিলিয়ে ক্লান্ত লাগলে বা সত্যিই গ্লুকোজ জাতীয় কোন কিছু খাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে এক মুঠো চিনি বা চিনির সরবৎ খাওয়াই যথেষ্ট। অনেক কম দামে হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। আরো ভাল হয় গুড় খেলে কারণ গুড়ে শুধু কার্বোহাইড্রেটই নয়, প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ লবণ, আয়রন, ফসফরাস—এ সবই থাকে। একশ' গ্রাম খেজুরের গুড় থেকে শক্তি পাওয়া যাবে ৩৫৩ ক্যালরি। এছাড়া খেজুরের গুড়ে আরো রয়েছে ৩৬০ মি গ্রা. ক্যালসিয়াম, ৬০ মি গ্রা. ফসফরাস, ১.৫ গ্রাম প্রোটিন আর ৩০০ মি গ্রা. চর্বি জাতীয় খাদ্য। আখের গুড়ের ১০০ গ্রামে থাকে প্রায় ১১-১২ মি গ্রা. লোহাও। তাই এসবের যদি দরকার থাকে তবে বহুজাতিক কোম্পানির, মোড়কে ভরা গাঁটকাটা গ্লুকোন-ডি-র ধোঁকা না খেয়ে, গুড় খেলেই অনেক সস্তায় আরো বেশী পরিমাণে শক্তি ও পুষ্টি পাওয়া যাবে।

বহুজাতিক গ্ল্যাক্সো আবার গ্লুকোন-সি-ও বের করেছে। গ্লুকোজের গুণ ছাড়া এতে নাকি ভিটামিন-সি-ও রয়েছে। খেতেও বেশ—লেবু-লেবু মত। কিন্তু ভিটামিন-সি-ও সাধারণ নানা খাবারদাবার থেকেই পাওয়া যায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দৈনিক মাত্র ২০ মি গ্রা., বয়স্কদের ক্ষেত্রে ৪০ মি গ্রা. ও স্তন্যদায়ী মায়েদের ৮০ মি গ্রা. ভিটামিন-সি শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। তা পেয়ারা বা অন্যান্য ফলমূল, বাঁধাকপি-ফুলকপি, নটেশাক-পালংশাক-বেগুন-টম্যাটো ও নানা শাকসব্জি, যে কোন ধরনের লেবু, অংকুরিত ছোলা ইত্যাদি অজস্র জিনিষ থেকেই পাওয়া যাবে। তার জন্য গ্লুকোন-সি-র কোন দরকার নেই। যেমন একশ গ্রাম পেয়ারায় থাকে ২১২ মি গ্রা. ভিটামিন -সি, নটেশাকে ৯৯ মি গ্রা., বাঁধাকপিতে ১২৪ মি গ্রা., ফুলকপিতে ৫৬ মি গ্রা., পাতিলেবুতে ৬৩ মি গ্রা. ইত্যাদি ইত্যাদি। (অবশ্যি এসব সেদ্ধ করে 'জম্পেশ' রান্না করে খেলে অধিকাংশ ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাঁচা যে গুলি খাওয়া যায় সেগুলি থেকেই ভিটামিন-সি শরীরে আসে।)

সদ্য রোগ থেকে ওঠা কোন ব্যক্তি বা প্রসূতি মা কিংবা স্কুল ছাত্র-ছাত্রী বা বৃদ্ধ—যে কেউই গ্লুকোন-ডি গ্লুকোন-সি যদি হজম করতে পারেন তবে চিনি-গুড়ও পারবেন। আর ভিটামিন-সি বা-ডি তো পাচ্ছেনই অল্পদামের নানা খাবার আর সূর্যালোকের সাহায্যেই।

(১৪)

লোক ঠকান বোতল—হরলিক্স, ভিভা ইত্যাদি

সস্তায় একই, কিংবা বেশী গুণের পুষ্টি হাতের কাছেই পাওয়া গেলেও টনিক বা গ্লুকোজের মত প্রচারের জোরে এ ধরনের মালকড়িরও জোরদার বাজার তৈরী করা হয়েছে। এদের মধ্যে হরলিক্স-এর বাজার আমাদের দেশে মনে হয় সবচেয়ে বেশী। প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে ভিভা, মল্টোভা, নিউট্রামুল, কমপ্লান, ওভালটিন, বুষ্ট ইত্যাদি নামের বোতলও।

মহান শক্তিদাতা (great nourisher) হিসাবে সিনেমা, রেডিও, টেলিভিসন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে দিনের পর দিন ঢালাও প্রচারের মাধ্যমে হরলিক্স জাতীয় পদার্থ এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে তা গল্প-উপন্যাসেও স্থান পায়। ওষুধ না হলেও ডাক্তাররা এর প্রেস্‌ক্রিপশানও করেন। দুর্বল, সদ্য রোগে ভোগা মানুষ থেকে শুরু করে গর্ভবতী মহিলা বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শরীর সবল-সুস্থ করার হাতিয়ার হিসেবে তা বহুল প্রচারিত।

এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য শুধু হরলিক্স-এর কথাই ধরা যাক। হরলিক্স-এর মূল উৎপাদক বহুজাতিক কোম্পানি বীচাম (Beecham) ভারতে হিন্দুস্থান মিলকফুড ম্যানুফ্যাকচারার্স-কে ৪০% শেয়ার বিক্রি করার পর হরলিক্স-এ কিছু দিশী গন্ধ বেরোচ্ছে। এদেশে হরলিক্স বিক্রি হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে হরলিক্স লি-এর (Brentford, Middlesex, UK) কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে। যে দেশে এর জন্ম সেই ইংল্যাণ্ডে একে কিন্তু মহান শক্তিদাতা বা great nourisher, খেলে দুর্বল শরীর সবল হবে বা খাবারদাবারের বিকল্প হিসেবে আদৌ হাজির করা হয় না। এ ধরনের মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত কথা বলা ওখানে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়, বড়জোর রাত্রে শোওয়ার আগে এক কাপ খাওয়া যায় ("food drink of the night")। কিন্তু ব্যবসায়িক কৌশল ওখানেও রয়েছে, যেমন বলা হয় হরলিক্‌স্ ঘুম ভাল করে ("Horlicks helps you relax into the proper rhythm of sleep")। এটিও মিথ্যে কথা। আগে আমাদের দেশেও প্রচারে বলা হত হরলিক্স দুধেরও দ্বিগুণ পুষ্টিকর ("twice as good as milk")। কিন্তু ভারত সরকারের নির্দেশের ফলে তা বন্ধ করা হয়েছে। তাই বলে সব মিথ্যাকথাই বন্ধ করা হয় নি। যেমন এর মহান শক্তিদাতা (great nourisher) বিশেষণ। ৭২ বছরের বৃদ্ধ কিভাবে হরলিক্স খেয়ে যে কোন জোয়ান লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কিভাবে হরলিক্স খেয়ে প্রচণ্ড পড়াশুনা করে বা খেলাধুলার পরও ক্লান্ত হয় না, সুন্দরী গৃহবধু কিভাবে সারাদিন ঝি-এর মত খাটার পরও হরলিক্স খেয়ে আরো খাটা খাটুনি করেন ইত্যাদি হাজারো সচিত্র বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ অসুস্থ, দুর্বল লোকেরা ছাড়াও সত্যিকারের সুস্থ লোকেদেরও এর শিকার বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে।

হরলিক্স-এ আছে "ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানা"। সবগুলিই নিঃসন্দেহে ভাল জিনিষ। (তবে বার্লি মানুষের প্রধান খাদ্য হিসাবে মোটেই ব্যবহৃত হয় না, বিদেশে এটি মূলতঃ পশু খাদ্য হিসেবে ও মদ তৈরী করার জন্য কাজে লাগান হয়।) কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এর জন্য এত দাম দিয়ে হরলিক্স (বা ভিভা, মল্টোভা, কমপ্লান, বুষ্ট ইত্যাদি) খাওয়ার দরকার কি? সরাসরি দুধ, আটার রুটি এগুলো খেলেই হয়। হরলিক্স ইত্যাদির কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন, বোতল, মোড়ক, আর মালিকের মুনাফা—এই বিপুল ব্যয়ভার কিন্তু ক্রেতাকেই বহন করতে হচ্ছে, যে ব্যয়ভারের জন্য দুধ, বার্লি বা গমের খাদ্যগুণ আদৌ বাড়ছে না।

প্রায় ২০ টাকা দিয়ে ৪৫০ গ্রামের একটি হরলিক্স-এর বোতল পাওয়া যায়। এর থেকে মোট শক্তি পাওয়া যায় প্রায় ১৮০০ ক্যালরি। অথচ একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মোটামুটি ৫৫ কে. জি যাঁর ওজন, তাঁর দৈনিক দরকার হয় ২৮০০ ক্যালরি শক্তি—এ শক্তির জোগান হয় সারাদিনের খাবার থেকেই। সাধারণ ভাত-ডাল-তরকারি রুটি থেকেই এ শক্তি পাওয়া যায় এবং এর জন্য খরচ পড়বে বড়জোর ৬-৮ টাকা। অর্থাৎ অনেক বেশী দাম দিয়ে সাধারণ খাবার দাবারের থেকে অনেক কম শক্তিই পাওয়া যাচ্ছে হরলিক্স জাতীয় পদার্থ থেকে।

আর পুষ্টি? ১০০ গ্রাম হরলিক্স-এ প্রোটিন থাকে প্রায় ১৪ গ্রাম, অন্যদিকে ১০০ গ্রাম মুসুরি ডালে প্রোটিন থাকে ২৫ গ্রাম, মুগডালে ২৪ গ্রাম, মাছে থাকে ১৯ গ্রাম, মাংসে থাকে ২২ গ্রাম; এমনকি ১০০ গ্রাম গমের আটায় থাকে ১২ গ্রাম প্রোটিন, সেদ্ধ চালে প্রায় ১৩ গ্রাম প্রোটিন। ১০০ গ্রাম হরলিক্স-এর দাম যেখানে প্রায় সাড়ে চার টাকা, তখন এই পরিমাণ ডাল-চাল-আটার দাম এক টাকার কম, অথচ তার থেকে পাওয়া যাচ্ছে বেশী বা সমপরিমাণ প্রোটিন। আমাদের খাদ্যের অন্যান্য যে সব অংশ অর্থাৎ ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, লবণ ও ভিটামিনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সব মিলিয়ে শুধু ভাত-ডাল-শকসব্জি-ফলমূল থেকে যে পুষ্টি পাওয়া যায় হরলিক্স তার থেকে অনেক অনেক কম পুষ্টি দেয় অথচ দাম পড়ে অনেক অনেক বেশী।

হরলিক্স খেয়ে পেট ভবে না। মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা ধনীদের সামনে এর টোপ ফেলা হয় খাবার দাবারের বাড়তি হিসেবে খাওয়ার জন্য। প্রচারের এমনই মাহাত্ম্য গরীব মানুষেরাও পয়সা জমিয়ে হরলিক্স কিনে শরীর ভাল করার করুণ আশা পোষণ করেন। অথচ হরলিক্স-এর দেওয়া পুষ্টি বিশেষ ভাবে কারোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনই হয় না, যদি পেটপুরে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাত-ডাল-রুটি-শাকসব্জি-ফলমূল খাওয়া যায়। এ সব খাবার মোটামুটি খেতে পাওয়া দিনমজুরেরা বা তাঁদের ছেলেমেয়েরা, পয়সাওয়ালা লোকেদের হরলিক্স খাওয়া বাচ্চাদের চেয়ে খারাপ চেহারায় আদৌ নেই। তবু আমাদের মত দেশে অপুষ্টি একটি বড় সমস্যা।

বিশেষতঃ মধ্যবিত্তদের এ সম্পর্কে ভীতি আর সচেতনতাও রয়েছে। যেমন সচেতনা আধুনিকা মায়ের ভয়—বাচ্চা বুঝি রোগা হয়ে গেল। তাই বিজ্ঞাপনের 'সুমিত্রা'-র মত কাপভর্তি হরলিক্স খাওয়ানো চলে বাড়তি হিসেবে। বাস্তবত সমাজের এই স্তরেই হরলিক্স-টনিক জাতীয় মালকড়ির বাজার সবচেয়ে বেশী। আবার ভারতের পূর্বাঞ্চলে দুধের উৎপাদন কিছু কম বলে, এ অঞ্চলেই এগুলো চলে ভাল। অথচ হরলিক্স ইত্যাদি খেয়ে মূল সমস্যা বাড়া ছাড়া কমে না মোটেই। কারোর অপুষ্টি থাকলে ঐ পয়সায় শাকসব্জি-ফলমূল খেলে হরলিক্স-এর চেয়েও অনেক বেশী পুষ্টি ও খাদ্যগুণ পাওয়া যেত। পুরো এলাকা জুড়ে দুধের উৎপাদন বাড়ানর জন্য উদ্যোগ নেওয়াও যায়। হরলিক্স ইত্যাদির কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনে যা ব্যয় করে তার কিছু অংশ দিয়েই সারা দেশের প্রত্যেককে দুধ খাওয়ান যায়। তারা যদি সত্যিই বৃদ্ধ, কিশোর, গৃহবধূ বা পরিশ্রান্ত মানুষের ভাল চায় তবে তাই-ই করতে পারে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য লোক ঠকিয়ে ব্যবসা করা। ঠকতে রাজী থাকা এত মানুষ যখন ভারতের মত দেশে রয়েছে তবে আর কেন এ দাঁও ছাড়া ? সত্যিই অপুষ্টি যাঁদের সমস্যা তাঁদের হরলিক্স জাতীয় মাল কেনার সামর্থ নেই। তাই অপুষ্টি যাঁদের নেই তাঁরাই কেনেন 'পুষ্টিদায়ক' এই ধোঁকাটি। এঁরাই টিভি দেখেন, রেডিও শোনেন, পত্রিকা পড়েন ; বিজ্ঞাপনে এঁদের কাছেই পৌছানোর চেষ্টা করে কোম্পানিগুলি।

ছেলেমেয়েকে ভাল পুষ্টি দেওয়ার আশায় যে বাবা-মা এভাবে প্রতারিত হন তাঁদের তবু সাবধান করা যায় বা করুণা করা যায়। কিন্তু তথাকথিত যে সব চিকিৎসকরাও হরলিক্স-টনিক ইত্যাদি লেখেন তাঁদের ? তাঁদের একটা যুক্তি—মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষেরা টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েই আসেন, বিশেষ কিছু না লিখে দিয়ে শুধু ডাল-ভাত-শাকসব্জি-ফলমূল খেতে বল্লে প্রাইভেট প্রাকটিশ রাখা মুস্কিল ; কেউ আসবে না। হয়তো ঠিকই। তবে ওষুধ ও এ ধরনের পদার্থ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ মানসিকতা সৃষ্টি করেছে কিন্তু কোম্পানিগুলি ও চিকিৎসকেরা—মিলিতভাবেই। অচিকিৎসক মানুষদেরও এব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। তেমনি চিকিৎসকদেরও বলা দরকার, এত পয়সা খরচ করে হরলিক্স ইত্যাদি খেলে পয়সা নষ্ট ছাড়া বাড়তি লাভ কিছু হয় না : হরলিক্স বেশী ভালভাবে হজমও হয় না—যাঁরা হরলিক্স ইত্যাদি হজম করে শরীরের কাজে লাগাতে পারবেন তাঁরা সাধারণ খাবারদাবারও হজম করতে পারবেন। আর ব্যবসায়িক কোম্পানির সেবাদাস হয়ে যেসব 'চিকিৎসক' বিজ্ঞাপনে মিথ্যে কথা বলে লোককে ভুল বোঝান তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।(যেমন, দূরদর্শন ইত্যাদিতে চ্যবনপ্রাশ, মথাধরার ওষুধ, আয়ুর্বেদিক বডি বিল্ডার ইত্যাদি মালকড়ির বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ১৯৮৭-তে অভিনেতা ডাক্তার শ্রী রামলাগু র ডাক্তারী রেজিস্ট্রেশান বাতিল করে দিয়েছেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল।)

বহুজাতিক কোম্পানি গ্লাক্সো তাদের কমপ্লান এর-বিজ্ঞাপনে আবার বলে প্রোটিন ছাড়া আরো ২২টি খাদ্যগুণও তাদের টিনের ভেতর থাকে। ক্যালসিয়াম.

প্রতারণার হরেক কায়দা

ফসফরাস, সোডিয়াম, ক্লোরাইড, পটাসিয়াম, আয়রন, আয়োডিন — কি নেই ? আছে সব ভিটামিন — ভিটামিন এ, বি-১, বি-১২, সি, ডি ই, কে, রাইবোফ্লেভিন,

নিকোটিনামাইড, প্যাণ্টোথেনিক এ্যাসিড, কলিন, ফলিক এ্যাসিড। প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট—এ সব তো আছেই। পুঁজিবাদী তথা নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কি ভয়াবহ প্রতারণা। এ সব নানা পুষ্টি সম্পর্কে এর আগেই বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। তবু আবার স্মরণ করা যায়, এখনো পৃথিবীতে কোন মানুষের শরীরে প্যাণ্টোথেনিক এ্যাসিড ও ভিটামিন-ই-এর অভাব ঘটেনি কারণ প্রায় সব খাবারেই তা রয়েছে। অন্যান্য অনেকগুলির ক্ষেত্রেই তা কমবেশী সত্য। আর অনেক সময় এগুলোর পরিমাণ বেড়ে গেলেও শারীরিক নানা ক্ষতি হয়। তবু পয়সা খরচ করলে গ্ল্যাক্সো তা খাওয়াচ্ছে।

লোকঠকান এ সব বোতলের মাল না খেয়ে যারা সাধারণ খাবারদাবার পেটপুরে, তৃপ্তিভরে খায় তাদের শরীরে পুষ্টির অভাব থাকে না মোটেই। মায়ের দুধ বনাম বেবীফুডের মত—প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যের গুণাবলী, চড়াদামের এসব কৃত্রিম পদার্থ আদৌ দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শাকসব্জি, ফলমূল, ডাল-ভাত-রুটি-র উপর জোর না দিয়ে, হরলিক্স, ভিভা, কমপ্লান বা নানাবিধ টনিক গেলা বাচ্চারা প্রায়শঃই কেন রুগ্ন হয় বা নানা রোগে ভোগে, তার আংশিক কারণ তথাকথিত এই মহান শক্তিদাতা বা পুষ্টিকর 'খাদ্য' গুলিই। 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'-এ আদিম অন্ধ বিশ্বাসের মত, মহান শক্তিদাতা এসব পদার্থের উপরও সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক অন্ধবিশ্বাস। দুর্বলচিত্ত মানুষ অসহায় অবস্থায় অস্তিত্বহীন ঈশ্বরকে ডেকে মানসিক জোর পাওয়ার চেষ্টা করে, একইভাবে শারীরিক-মানসিক জোর পাওয়ার আশা করে পুঁজিবাদের এসব পাদোদক খেয়েও।

(১৫)

বেবিকিলার বেবিফুড

না, সত্যিই বেবিফুড খেয়ে বাচ্চারা ফটাফট মরে যাবে—তা নয়। তাই এই শিরোনামটা অতিশয়োক্তিই বটে। তবে পুরোটাই কি ? সত্যি কথা বলতে কি, যে সব বাচ্চারা মায়ের দুধের চেয়ে বাজার চলতি নানা বেবিফুডের উপর বেশী নির্ভর করে তারা রুগ্ন স্বাস্থ্য বা নানাবিধ রোগে ভোগে বেশীই, এবং তাদের মৃত্যুর হারও বেশী।

ব্যবসায়ীরা ছোট বাচ্চাদের জন্য নানাবিধ বেবিফুড সাজিয়ে রেখেছে। যেমন ল্যাক্টোজেন, আমূল স্প্রে। আরেকটু বড় বাচ্চাদের জন্য রয়েছে ফ্যারেক্স, সেরিল্যাক ইত্যাদি।

প্রচারের জোরে এক সময় এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যখন তথাকথিত আধুনিকা মায়েরা নিজের বাচ্চার জন্য নিজের বুকের দুধের চেয়ে এ ধরনের খাবারকেই বেশী পছন্দ করতেন। সম্প্রতি এ ধরনের বেবিফুডের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হতে ও নানা মহল থেকে চাপ আসায়, বিশেষত পাশ্চাত্যে মায়ের দুধের উপর জোর দেওয়ার জন্য প্রচার জোরদার করা হচ্ছে। ফলে ঐ সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভারতের মত দেশে ঘাঁটি গাড়ছে। সাথে সাথে ব্যবসায়ীরা সূক্ষ্মতরও নতুনতর কৌশল নিয়েছে। যেমন আমূল স্প্রে-র বিজ্ঞাপনে নির্মাতা গুজরাটি সংস্থাটি প্রথমেই বলে নেয় "মায়ের দুধ প্রকৃতির এক মহান দান ? কারণ বাচ্চার জন্মের পরেই মায়ের বুকের দুধে প্রাকৃতিক রূপে 'রোগ প্রতিরোধক বস্তু' থাকে, যার জন্য নবজাত বাচ্চাটি আমাশয় ও অন্যান্য রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে নিজেদের জাল ছড়ায়। "হ্যাঁ, যদি আপনি কোন অসুবিধার দরুণ বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়াতে পারেন—যেমন ধরুন আপনার স্বাস্থ্য ভাল নয় বা পুরোমাত্রার বুকে দুধ আসছে না তাহলে কি করবেন ?" তাহলে ঘুরে ফিরে ঐ আমূল স্প্রে-ই খাওয়াতে হবে যা "মায়ের দুধের ঠিক পরেই।" কি সুন্দর যুক্তিভরা কৌশল। বিজ্ঞাপনে আবার মায়ের দুধের সম্পর্কে বলতে গিয়েও "স্বাভাবিকভাবে পুষ্টিকর" "সারাবিশ্বে প্রচলন বাড়ছে" জাতীয় কথাগুলি বড় হরফে ছাপা থাকে, আর তার নীচে মায়ের দুধের গুণাবলী লেখা থাকে অতি ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে। এগুলো খুঁটিয়ে পড়ার সময় ও আগ্রহ অনেকেরই থাকে না। তাই বিজ্ঞাপনে সাধারণভাবে চোখ বোলালেই মনে হবে আরো বড় করে লেখা আমূল স্প্রে সম্পর্কেই কথাগুলি বলা হচ্ছে। তারপর বিজ্ঞাপন আসে আমূল-স্প্রে-র কথায়—"কোন অসুবিধা থাকলে", "স্প্রেড্রায়েড আমূল-স্প্রে", "সাশ্রয়কারী", "সাবধানতা" ইত্যাদি। সাবধানতা অবশ্যি আমূল স্প্রে সম্পর্কে নয়; দুধের বাসনপত্র ইত্যাদি ও দুধ গোলার জল ফুটিয়ে নিতে হবে তার জন্য। বহুজাতিক কোম্পানি গ্লাক্সো বা নেস্‌ল-এর তৈরী ফ্যারেক্স বা সেরিল্যাকও কম যায় না,—সব সময়েই তা 'দুধযুক্ত'

বা এতে দুধ মেশান আছে বলে উল্লেখ করা হয়। তারপর বলা হয় এতে সব ভিটামিন, মিনারেল আছে, এবং প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট তো আছেই। ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করার জন্য গ্লাক্সো আবার new ফ্যারেক্স বাজারে ছেড়েছে। "নতুন ফ্যারেক্স বেশী সুস্বাদু, নতুন ফ্যারেক্স বেশী সম্পূর্ণ!" মাঝখানে আবার 'বিনামূল্যে' চকচকে বাটিও দিচ্ছিল ওরা। পাছে মায়েরা বাটির অভাবে ফ্যারেক্স না খাওয়াতে পারে! তবে তার জন্য দুটো ফ্যারেক্স-এর টিন কিনতে হবে—এই যা। নেসল্‌ও বলে তাদের সেরেল্যাক "একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার—যা অত্যন্ত সুস্বাদু"। এগুলো বড় বড় হরফে ছাপা। আর ক্ষুদি ক্ষুদি করে বলা আছে —"বুকের দুধই আপনার সন্তানের পক্ষে সবচেয়ে ভাল।" (আহা!) "কিন্তু চার মাস বয়সে যখন শক্ত খাবার তাকে দেওয়া দরকার তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেরেল্যাক খাওয়াতে আরম্ভ করুন।"যেভাবে সব বলা আছে তাতে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই এগুলোর ব্যবহার শুরু হয়। আর অজস্র উপঢৌকন, বক্তৃতা আর সম্ভ্রমের বেড়ি দিয়ে ডাক্তাররা এমন ভাবে আটকান যাতে তাঁদের কলম থেকে বেরিয়ে আসে এই আমূল স্প্রে বা সেরেল্যাক জাতীয় মালকড়ি।

মায়ের দুধের বিকল্প হিসাবে বা ঠিক তার পরেই বলে প্রচারিত আমূল-স্প্রে বা এই ধরনের 'খাদ্যের' আদৌ প্রয়োজন আছে কি? মোটামুটি সুস্থ যে কোন মা-ই সন্তান জন্মের পর বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। বুকে দুধ না আসা একটি অতি দুর্লভ ঘটনা। UNICEF- এর অধীনে করা ভারতের পুষ্টি সংস্থার ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় দু হাজার নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে বোম্বের শতকরা ২.৩টি শিশু, কলকাতায় ১.৯ ভাগ শিশু ও মাদ্রাজের ৩.১ ভাগ শিশু তার মায়ের দুধ পাননি। এই সব হতভাগ্য শিশুরা প্রায় সকলেই উচ্চবিত্ত পবিবারের। আর এদের সবার ক্ষেত্রে মায়ের বুকে দুধ না আসাটাই কারণ নয়, কারণ দেখা গেছে মায়ের দুধ না খাওয়া শিশুদের বোম্বেতে ৪২ জনের মধ্যে ১১ জনকে, কলকাতায় ২৬ জনের মধ্যে ১২ জনকে, মাদ্রাজে ৪৬ জনের মধ্যে ১৫ জনকে তাদের মা নিজের দুধ দেওয়ার কোন চেষ্টা আদৌ করেননি।* এর থেকে বোঝা যায় মায়ের বুকে প্রকৃতই দুধ না আসার ব্যাপারটা অতি দুর্লভ, শতকরা এক জনের থেকেও কম। আরো ভয়াবহ হল, এদেশেও কিছু মায়ের সৃষ্টি হয়েছে যারা বাচ্চাকে বুকের দুধ না দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। আর তথাকথিত আধুনিক মায়েরা ব্যবসায়িক প্রচারের জোরে নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের কাছে বিকল্প হিসাবে পাওয়া দুধ বাচ্চাদের দেন—কেউ বুকের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য, কেউ বা সময় বাঁচান ইত্যাদি কারণে।

* An Extract of the Report on Infant-feeding Practices with special Reference to the use of Commercial Infant Food. (Nutrition Foundation of India. Project funded by UNICEF,1984)

দুর্লভ যে সব ক্ষেত্রে মায়ের বুকে সত্যিই দুধ আসে না, সেক্ষেত্রে আমূল স্প্রে জাতীয় দুধও খাওয়ান যায়, কিন্তু এর থেকে সস্তায় ভাল খাদ্য হচ্ছে গরুর দুধ। (গরুর দুধ অর্ধেক পাতলা করে, একটু চিনি মিশিয়ে ও ফুটিয়ে জীবাণু মুক্ত করে বাচ্চাকে দেওয়া যায়।) যে সব মায়ের বুকে দুধ আসেনি ব্যতিক্রম ঐ সব মহিলার পুরো চিকিৎসার দরকার। অনেক সময় পুষ্টিকর খাবার-দাবার, প্রচুর জল, মানসিক সুস্থিতি, বাচ্চার মুখ বার বার স্তন বৃন্তে দেওয়া ইত্যাদির ফলেই এই সব মায়ের বুকে দুধ এসে যায়। স্তনে গরম ঠাণ্ডা সেঁক দেওয়ার কথাও বলা হয় যদিও ব্যাপারটি সতিই কতটা কার্যকরী তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। স্তনে ফোঁড়া বা প্রদাহ হলে, স্তন বৃন্তে ফাটা বা ঘা থাকলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান যায় না। মায়ের যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি তীব্র কোন রোগ হলেও বুকে দুধ না আসতে পারে। এসব ক্ষেত্রেও সাময়িকভাবে বুকের দুধ বন্ধ করে দ্রুত চিকিৎসা করা দরকার। সেসব মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ আসছে না বলে মনে হয়, তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুষ্টি, যথেষ্ট জল ও বিশ্রাম এবং প্রতিবার বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানর পর কিছু দুধ হাত দিয়ে (বা যন্ত্রের সাহায্যে) বের করে দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বাচ্চা খুব বেশী কাঁদলে কিংবা কোন কারণে মায়ের অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ-দুশ্চিন্তাও বুকে যথেষ্ট দুধ না আসার কারণ হতে পারে। এগুলি মাথায় রাখলে অনেক সময় বুকে যথেষ্ট দুধ না আসার বা কম আসার (অধিকাংশ সময়ই তা আবার মায়েদের ধারণা মাত্র) ব্যাপারটার চিকিৎসা নিজেই করা যায়।

বেবিফুড কখনোই মায়ের দুধের বিকল্প, ঠিক পরেই বা কাছাকাছিও নয়। মায়ের দুধের অন্যতম বড় গুণ হল, —শিশু জন্মানর পর থেকে বাচ্চার শারীরিক ক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার পরিবর্তন ঘটে—দিনে দিনে, এমনকি দিনের বিভিন্ন সময়ও। বাচ্চা জন্মানর ঠিক পরেই প্রথম পাঁচদিন মায়ের বুকে আসে ঘন দুধ (colostrum)। এতে চর্বি থাকে পরবর্তী দুধের চেয়ে কম, কিন্তু প্রোটিন ও জীবাণু-বিরোধি পদার্থ—এ্যান্টিবডি ইত্যাদি, থাকে অনেক বেশী। এতে জিংক ও ভিটামিন-এ-র পরিমাণও থাকে বেশী, যা বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে এই দুধ খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ এই দুধ বাচ্চাকে দেন না। পরবর্তী কালেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং এক থেকে দেড় মাস সময়ে প্রায় স্থায়ী রূপ পায়। দুধ খাওয়ানর প্রথমের দিকে তাতে চর্বি থাকে কম, শেষের দিকে তা বাড়তে থাকে। শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী এ ধরনের পরিবর্তন নির্দিষ্ট ফরমুলার বেবিফুডে সম্ভব হয় না।

বেবিফুডের চেয়ে মায়ের দুধের প্রোটিনে কেসিন-এর এর পরিমাণ থাকে কম—এর ফলে হজম ভাল হয়, বাচ্চার পায়খানাও ভাল ভাবে হয়, কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে না। মায়ের দুধে ল্যাকটোজ-এর পরিমাণ বেবিফুডের চেয়ে বেশী, ফলে বাচ্চার শরীরে লবণ বেশী জমতে পারে না। মায়ের দুধের চর্বিতে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি

এ্যাসিড (লিনোলেইক এ্যাসিড) ও ভিটামিন-ই থাকে বেশী—যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। মায়ের দুধে ক্যালসিয়াম, লৌহ ঘটিত লবণ ইত্যাদি যে ভাবে থাকে, তাতে বাচ্চার শরীরে এদের শোষণ ভালভাবে হয়। মায়ের দুধে সোডিয়াম-এর পরিমাণ থাকে নিরাপদভাবে কম, নবজাত শিশুর অপরিণত কিডনিকে বাঁচানর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। যে সব বাচ্চারা মায়ের দুধ খায় তাদের পায়খানা হয় অম্লধর্মী, এর ফলে ফাংগাস এর আক্রমণ ঘটতে পারে না।

মায়ের দুধের অনুকরণে প্রোটিন-ফ্যাট-কার্বোহাইড্রেট-ভিটামিন-লবণ হাবিজাবি করে মেশালেও বেবিফুডে যা একেবারেই থাকে না, তা হল জীবাণু প্রতিরোধি নানা পদার্থ—শ্বেত কণিকা (বিশেষতঃ লিম্ফোসাইট), এ্যান্টিবডি (ইমিউনোগ্লোবিউলিন)। এর ফলে মায়ের দুধ বাচ্চাকে ইকোলাই, সিগেলা, সামোনেলা, রোটা ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণ তথা ডায়ারিয়া থেকে রক্ষা করে। পোলিও ও ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস, ও আরো নানা ভাইরাসের প্রতিরোধী পদার্থও থাকে মায়ের দুধে। আরো বড় কথা হল পৃথিবীর কোন প্রান্তের একজন মা তাঁর নিজস্ব পরিবেশে যে সব রোগের সম্মুখীন হন, তাঁর শরীরে ঐ সব রোগের প্রতিরোধী পদার্থ সৃষ্টি হয়; এগুলি তাঁর দুধের মাধ্যমে বাচ্চার শরীরেও যায়। মায়ের পরিবেশ তার বাচ্চারও পরিবেশ। এই ভাবে একটি বিশেষ অঞ্চলের শিশু তার বিশেষ পরিবেশের বিশেষ রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে মায়ের দুধ খেয়ে। বেবিফুডে এর কিছুই সম্ভব হয় না।

আর মায়ের দুধ স্বাভাবিকভাবেই জীবাণুমুক্ত। কিন্তু বেবিফুড খাওয়াতে হলে বোতল ও জল জীবাণুমুক্ত করা অবশ্যই প্রয়োজন ; এর জন্যও যেমন অর্থ ও সময় যায়, তেমনি এর মধ্যে ত্রুটি থাকলে তাও বাচ্চার ডায়ারিয়া ও অন্যান্য রোগ ডেকে আনে।

আর এসবের ফলেই সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়েছে বেবিফুডে নির্ভরশীল বাচ্চাদের ভয়াবহ অবস্থা। হরিয়ানার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বোতলে বেবিফুড খাওয়া বাচ্চাদের মধ্যে ডায়ারিয়ার হার মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চাদের তুলনায় তিনগুণ বেশী। ডায়ারিয়ার কারণে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি ও মৃত্যুও এদের মধ্যে বেশী। আরেকটি উন্নয়নশীল দেশের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এক বছর বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে যাদের নানা জীবাণুঘটিত রোগে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাদের মধ্যে বোতলের দুধ খাওয়া বাচ্চার সংখ্যা মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চার চেয়ে দশগুণ বেশী ; এদের রোগারোগ্যের জন্য সময়ও লাগে প্রায় দশগুণ বেশী। আমেরিকার একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা যে ১০৭ জন শিশু ভয়াবহ ডায়ারিয়া নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চা ছিল মাত্র একজন। লণ্ডনের একটি এলাকায় মাত্র ১৪% শিশু ছিল মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল ; এবং এখানে ডায়ারিয়ার জন্য হাসপাতালে ভর্তি

হওয়া ৬০৮ জন শিশুর ৬০৪,জনই ছিল বোতলে বেবিফুড খাওয়া শিশু, ২ জন মাত্র বুকের দুধ খেত। গরীব হোক বড়লোক হোক, সবার ক্ষেত্রেই বেবিফুড ও বোতল এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে।

আর বিশেষতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীবদের মধ্যে বেবিফুডের উপর নির্ভরতা আর্থিক সংকটেরও সৃষ্টি করে। বেবিফুডের পয়সায় মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তবে মা ও শিশু উভয়েরই মঙ্গল। ভয়াবহভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেবিফুডের প্রতি মোহ তথাকথিত শহুরে আধুনিকা বা শিক্ষিতা মায়েদের মধ্যেই নয়, দেখাদেখি গ্রামাঞ্চলে, গরীব পরিবারেও সংক্রামিত হয়েছে। দেখা গেছে, ভারতের বড় বড় শহরের আশপাশের গ্রামাঞ্চলে ২২-৩০% শিশু কমবেশী বেবিফুড খেতে শুরু করেছে ; এধরনের বাণিজ্যিক শিশু দুগ্ধের পেছনে গরীব পরিবারগুলোর আয়ের ১০%-এর বেশী খরচ করা হচ্ছে। (সূত্র : পূর্বোক্ত) আরো ভয়াবহ হল এই সব পরিবারের প্রায় সকলেই এই সব বেবিফুড তাদের বাচ্চাকে খাওয়ায় অস্বাস্থ্যকর-ভাবে—প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সচেতনতার অভাবে। এই সব পরিবারের কোন কোন মায়ের মধ্যে প্রচণ্ড অপুষ্টি থাকলে বুকে দুধ কম আসতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামই দরকার, বেবিফুডের উপর খরচ করে মায়ের খাবারে টান ধরালে এ সমস্যা বেড়েই চলবে।

বাচ্চাকে বুকের দুধ দিলে সৌন্দর্য হানির ভয় করেন অনেক মহিলা। এটিও ভ্রান্ত ধারণা। বরং গর্ভাবস্থায় যে অতিরিক্ত চর্বি শরীরে জমে শিশুকে স্তন্যপান করালে ঐ চর্বি চলে যায়, মায়ের শরীর তন্বী, আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। যে সব মায়েরা বাচ্চাকে বুকের দুধ দেন না বা কম দেন, তাঁদের স্থূল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ে। আর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে তার সাথে যে আবেগগত সম্পর্ক গড়ে তার ফলেও মায়ের চেহারা হয়ে ওঠে কমনীয় সুন্দর। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে স্তন ঝুলে যাওয়া বা আলগা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এটি নির্ভর করে মূলত মায়ের বয়স, পুষ্টি ও সুস্থতার উপর। প্রসবের পর থেকেই বাচ্চা বুকের দুধ খেলে কিছু হরমোনের নিঃসরণের ফলে মায়ের জরায়ু তাড়াতাড়ি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

বাচ্চার পাৎলা পায়খানা হলে অনেক মা বুকের দুধ বন্ধ করে দেন। এটিও ঠিক নয়। মায়ের দুধ সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত। বোতলের দুধ খাওয়াতে গেলে বোতল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করা দরকার, জলও ফোটাতে হয়। এসবের কোথাও গণ্ডগোল হলেই বাচ্চার ডায়ারিয়া হতে পারে। ডায়ারিয়ার সময় বাচ্চার জল ও পুষ্টি—উভয়ই দরকার। এ প্রয়োজন মেটাতে পারে মায়ের দুধ।

বাচ্চাকে অন্তত তার ছ'মাস বয়স পর্যন্ত পুরোপুরি বুকের দুধ খাওয়ান দরকার—আরো ভাল হয় ছ'মাস বয়সের পরও, যতদিন বুকে দুধ থাকবে ততদিন, অন্যান্য খাবারের সঙ্গে বুকের দুধ দিয়ে যাওয়া। ছ'মাস বয়সের পর বাচ্চাকে বুকের দুধের পাশাপাশি কমলালেবু বা অন্য ফলের রস,

কলা-পেঁপে-আম ইত্যাদি ফল চটকে, ডাল-ভাত-শাকসব্জি-মাছ সেদ্ধ করে দেওয়া যায়। এ সময়ও প্রাকৃতিক এই সব খাবার দাবারই সবচেয়ে ভাল—তথাকথিত বেবিফুড ফ্যারেক্স, সেরিল্যাক ইত্যাদি নয়।

একসময় পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলিতে তথাকথিত আধুনিক বেবিফুডের ব্যাপক প্রচলন হয়। কিন্তু তার কুফলগুলি বুঝতে পেরে সচেতন চিকিৎসক ও নাগরিকেরা তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তবু উপযুক্ত শিক্ষা, পরিশ্রুত পানীয় জল ও উন্নত জীবনযাপন প্রণালীর কারণে ৫ দশক ধরে ঐ সব দেশে ব্যাপক ভাবে বেবিফুড চালু হলেও ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে নি। কিন্তু ভারতের মত গরীব দেশগুলিতে তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে, কি শিশুর ও মায়ের স্বাস্থ্য, কি সামগ্রিক অর্থনীতির দিক থেকে। বহুজাতিক ঐ সব সংস্থা নিজেদের দেশে বিপদ বুঝে তৃতীয় বিশ্বের দিকে তাদের থাবা বাড়ায়। মূলতঃ এদেরই ব্যাপক প্রচার ও উৎসাহে এই সব গরীব দেশগুলিতে বেবিফুডের প্রতি মোহ সৃষ্টি হয়। আর এসব দেশে এদের ব্যবসা ক্রমবর্ধমান। ১৯৮৩ সালে গ্লাক্সো কোম্পানি ভারতে প্রায় ১৬ কোটি টাকার বেবিফুড বিক্রি করেছে। নেস্‌ল্ করেছে ১৫ কোটি টাকার। আমূল বিক্রি হয়েছে ৫০ কোটি টাকার। আর এ সর্বনাশা ব্যবসা ক্রমবর্দ্ধমান। টাকার হিসেবে গত এক বছরে এদেশে বেবিফুডের বিক্রি বেড়েছে ৪০%। এসব কোম্পানি চিকিৎসকদের নানা উপহার আর অর্থের টোপ গিলিয়ে নিজেদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্লাক্সো কোম্পানি বোম্বাইয়ের ৫০ জন শিশু চিকিৎসককে এই উদ্দেশ্যে তাদের ৫০ টা শেয়ারও সস্তায় দিয়ে দেয়। এই সব চিকিৎসকেরা হয়ে ওঠে বহুজাতিক গ্লাক্সোর সর্বনাশা ব্যবসার শরিক।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ইত্যাদি সংস্থা বেবিফুডের প্রচার ও প্রচলনের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৮১ সালের বিধি অনুযায়ী ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রকও গত ১৯. ১২ ৮৩ তারিখে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিধি নিষেধের সাথে, স্বাস্থ্য রক্ষার নামে বেবিফুডের সব ধরনের বিজ্ঞাপন ও সুপারিশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেবিফুডের টিনের গায়ে বাচ্চার ছবি ছাপা ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।* বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিষিদ্ধ করেছে বেবিফুডের কোন প্রচারপত্র বিলি করা, ফ্রি স্যাম্পেল দেওয়া, এর সপক্ষে উপহার দেওয়া ইত্যাদিকেও। কিন্তু এই সব নিষেধ যে নেহাৎই কাগজে কলমে. নানা ফাঁক ফোকর দিয়ে কোম্পানিগুলি যে বেরিয়ে আসে তার প্রমাণ বেবিফুডের বিজ্ঞাপন ও তাদের গায়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুর চাঁদমুখ এখনো পত্রপত্রিকায় শোভা পেয়ে চলেছে। এদের চটকদারী কথাবার্তা ও বিজ্ঞাপন, সরকারী দায়সারা নিয়মরক্ষার কিছু কথার চেয়ে ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছায় অনেক বেশী। আমাদের দেশে জনমতও এতটা সোচ্চার ও সচেতন হয়ে ওঠে নি। বিদেশে বেবিফুডের বিরুদ্ধে

* Sunday : 1—7 April, 1984

সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এধরনের একটি সংস্থার নাম International Baby Food Action Network (IBFAN)। ১৯৮৪-এর জুলাই আগষ্ট মাসে এরা শিশুখাদ্য বিক্রির নিয়মকানুন লঙ্ঘন করার দায়ে আমেরিকার বৃষ্টল-মায়ার্স
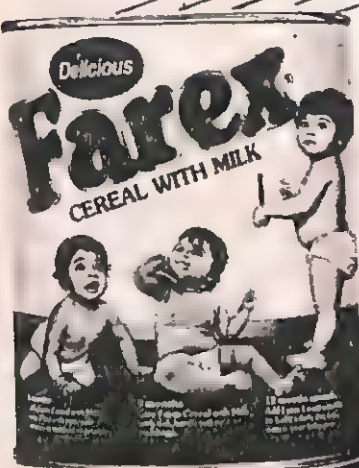
নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেবিফুডের বিজ্ঞাপন,—টিনে শিশুর ছবি

কোম্পানিকে অভিযুক্ত করে। ফলে কোম্পানিটি স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে শিশুখাদ্যের টিনের বা প্যাকেটের লেবেল ও পুস্তিকাগুলি তারা সংশোধন করবে।* আরেকটি সংগঠন International Nestle Boycott Committee

* IBFAN News, February-March, 1981.

(INBC) পেরুতে উপরোক্ত কোম্পানিকে নীতিমালা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে। কোম্পানিটি ওখানে বেবিফুডের প্রসারকে প্রভাবিত করতে ঘড়ি, কলম ইত্যাদি উপহার দিচ্ছিল। পুঁজিবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এধরনের সংগঠিত প্রতিবাদেরও গুরুত্ব অনেক। এ সবের ফলেই নরওয়েতে বেবিফুডের প্রচারপত্র নিষিদ্ধ, শ্রীলংকাতেও। তানজানিয়া, মোজাম্বিক, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশে বেবিফুড শুধু হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়, খোলাবাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ। ইয়োরোপের দেশগুলিতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ এই সংস্থার সনদনামায় স্বাক্ষরকারী হলেও তার নির্দেশাবলী কার্যকরীভাবে পালনের চেষ্টা এখানে এখনো অনুপস্থিত।

সচেতন হতে হবে আমাদেরই। আপনার শিশুকে ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাভের মাধ্যম করে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবেন না ; সে হোক আপনার শরীর ও মনের সম্পদে লালিত, সুস্থ, সুন্দর।

(১৬)

সর্বনাশা গ্রাইপ ওয়াটার

গ্রাইপ (gripe) কথাটার অর্থ হচ্ছে পেটে কলিকি ব্যথা বা অন্ত্রের সংকোচন জনিত তীব্র ব্যথা (gripan = to seize)। গ্রাইপ ওয়াটার নামক এই জিনিষটিও, বিশেষতঃ বাচ্চাদের, পেটে ব্যথার জন্য ব্যবহারের কথা প্রচার করা হয়। দু'চার মাসের বাচ্চা হয়তো হঠাৎ কেঁদে কঁকিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাইপ ওয়াটার খাওয়ান, কান্না প্রায়ই থেমে যাবে—এই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। সত্যিই অনেক সময় থামেও। ব্যাপক প্রচার ও বহুল ব্যবহারের ফলে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এটি ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার হয়; ঘরে বাচ্চা থাকলে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মত দোকান থেকে কিনে আনা হয়। বাচ্চা কাঁদলেই তা পেটে ব্যথা আন্দাজ করে গ্রাইপ ওয়াটার দু'চামচ খাইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন অনেক মা।

গ্রাইপ ওয়াটার নামে বাজারে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাতে প্রধানতঃ থাকে সোডিয়াম বাই কার্বনেট। এটি ক্ষারধর্মী; অতিরিক্ত অম্বল বা পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা হয়। খাওয়ার সোডা নামে এটি অধিক পরিচিত এবং কাপড়কাচার সোডাও এই একই জিনিষ। কিন্তু সোডিয়াম বাই কার্বনেটের অতিরিক্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য এটি এখন আর আলসারের ওষুধেও বেশী ব্যবহার করা হয় না। এটি খেলে পেট ফেঁপে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; ঢেকুরও ওঠে, অনেকে এই ঢেকুর ওটাকে পেটের গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া ভেবে নিশ্চিন্ত হন। আসলে এই ঢেকুর ওঠায় পেটের গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার কোন ব্যাপার নেই, যদি কিছু বেরোয় তা পেটে গিয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেটেরই তৈরী করা নতুন গ্যাস! (সোডিয়াম বাইকার্বনেট পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সাথে কার্বনডাইঅক্সাইড তৈরী করে।) যাঁদের পেপটিক আলসার রয়েছে, সেই সব বয়স্ক কেউ গ্রাইপ ওয়াটার তথা সোডিবাইকার্ব খেলে পেট ফাঁপার কারণে রোগটি বেড়ে যেতে পারে, এমনকি আলসার ফুটো হয়ে গিয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এইভাবে পেটে গ্যাস তৈরী করা ও বের করান যথেষ্ট বিপজ্জনক। বেশীদিন গ্রাইপ ওয়াটার খেলে বাচ্চাদের মিল্ক-এ্যালকালি সিণ্ড্রোম (Milk-alkali syndrome নামে এক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যা আরো নানা অসুস্থতা, স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি ও পরে তার বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি ঘটাতে পারে, যেমন রক্তের ক্ষারত্ব বেড়ে গিয়ে কিডনিতে রক্ত সঞ্চালন কমে গিয়ে তার স্থায়ী ক্ষতি হয়। গ্রাইপ ওয়াটারের সোডিবাইকার্ব বাচ্চার খাওয়া দুধের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় ও ক্যালসিয়াম অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই ক্যালসিয়াম রক্তের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কিডনিতে জমা হয়ে কিডনির কাজকে বিপর্যস্ত করতে থাকে; এক সময় কিডনির কাজ স্থায়ীভাবে নষ্ট হয় (renal failure)। অনেক সময় এর থেকে মূত্রপাথুরিও সৃষ্টি হতে পারে। গ্রাইপ ওয়াটার

খাওয়ান মাত্রই ব্যাপারটি ঘটে না, ঘটে ধীরে ধীরে ও বারবার খাওয়ালে। তাই এ ধরনের রোগ পরবর্তীকালে ধরা পড়লে তাকে গ্রাইপ ওয়াটারের সাথে আর যুক্ত করা হয় না।

গ্রাইপ ওয়াটারের আরেকটি ভয়াবহ উপাদান হল অ্যালকোহল বা মদ। বিখ্যাত উডওয়ার্ডস গ্রাইপ ওয়াটারে এটি থাকে শতকরা ৫ ভাগ; উল্লেখযোগ্য যে, বীয়ারেও থাকে একই মাত্রার মদ। অর্থাৎ গ্রাইপ ওয়াটারের নামে বাচ্চাকে বীয়ারই খাওয়ান হচ্ছে। এবং মূলত এই মদের প্রভাবেই নেশাগ্রস্ত লোকের মত অবোধ ছোট্ট শিশু নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর বাচ্চার কান্নায় অতিষ্ট বাড়ীর লোক গ্রাইপ ওয়াটারের সুখ্যাতি করতে থাকে। বাচ্চা বয়সেই বারবার এই মদ খাওয়ান শুরু করার বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া হল তাদের মধ্যে আসক্তি সৃষ্টি হওয়া। পরে এরা কোন ধরনের মদ না খেলে সুস্থ থাকতে পারে না—তা সে কাশির সিরাপের মাধ্যমেই হোক, টনিক খেয়েই হোক বা পরে নিছকই বীয়ার জাতীয় পানীয় খেয়েই হোক। এছাড়া এ্যালকোহলের ফলে বাচ্চার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায় (hypoglycemia), এর ফলে শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি বাচ্চাকে সহজে গ্রাস করে, এ কারণেও বাচ্চা ঘুমিয়ে থাকে। এর ফলে খিঁচুনিও হতে পারে। আর অজান্তে মদ্যপ হওয়া শিশুটির লিভার ও পাকস্থলীর বারোটাও বাজতে থাকে।

গ্রাইপ ওয়াটার নামে কোন ওষুধ পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে আর এখন চালু নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় এ নামে কোন মালকড়ি নেই, নেই বৃটিশ বা অ্যামেরিকান ওষুধের তালিকাতেও। এমনকি আমাদের দেশে নতুন দিল্লী বা ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত 'মান্থলি ইনডেক্স বা কারেন্ট ইনডেক্স অব্ মেডিক্যাল স্পেশালিটিজ'-এও গ্রাইপ ওয়াটার তালিকাভুক্ত নয়; যদিও আমাদের দেশে এটি বেশ ভালভাবেই চালু। আর আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ১৯৮২ সালে তাদের জাতীয় ওষুধ নীতিতে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে।

ক্ষিদে পেলে, প্রস্রাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেললে বা অনেকক্ষণ মা-কে না দেখতে পেয়ে ইত্যাদি নানা কারণেই বাচ্চা কাঁদে। স্পষ্টতঃই এসব ক্ষেত্রে দুধ দিলে, বিছানা পাল্টালে এবং সর্বোপরি মায়ের স্নেহময় উপস্থিতি বাচ্চার কান্না থামানোর পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া জন্মের পরবর্তী কয়েকমাস শিশুর শরীরে(যেমন বৃহদন্ত্রের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণকারী) কিছু নার্ভের বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা স্বাভাবিক হয়। এর আগে মাঝে মাঝে বৃহদন্ত্রের সংকোচন হয়ে বাচ্চার পেটে ব্যথা হতে পারে, তখন বাচ্চা পা দুটি কুঁকড়ে নিয়ে কাঁদে। এটি ক্ষতিকর কিছু নয় ও আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়। এর জন্য কোন ওষুধের দরকার হয় না, গ্রাইপ ওয়াটারের নামে সর্বনাশা মদ ও সোডিবাইকার্ব তো নয়ই। তবে বাচ্চা যদি ক্রমাগত কেঁদে যেতে থাকে তবে সাধারণ এসব কারণ

ছাড়া অন্য কোন কারণ আছে কিনা দেখতে হবে। হয়তো কোন বিষাক্ত পোকা তাকে অলক্ষ্যে কামড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে গ্রাইপ ওয়াটার (বা ফেনারগান জাতীয় সিরাপ) দিয়ে তাকে ঘুম পাড়ালে ব্যাপারটি বাচ্চার মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। কোন রোগ থাকলে তাও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। গ্রাইপ ওয়াটারের মদের নেশায় ঘুম পাড়ালে ঐ রোগটি চাপা থেকে আরো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

সব মিলিয়ে গ্রাইপ ওয়াটার ক্রন্দনরত শিশুর মায়ের পক্ষে আপাত স্বস্তিকর হলেও ছোট্ট শিশুটির কাছে মূর্তিমান অভিশাপ। নিজের অসহায় প্রিয় শিশুকে এভাবে অভিশপ্ত করে তুলবেন না!

(১৭)

এলোপাথাড়ি এ্যান্টিবায়োটিক

পানাগড়ের একটি বাচ্চা মেয়ে এল চিকিৎসার জন্য। হাত-পা এমনিতেই লিকলিকে সরু, জোরে ছুটতেও পারে না, দেখা গেল দাঁতে কালোকালো ছোপও রয়েছে। জিগ্যেস করায় জানা গেল বছর পাঁচেক আগে জ্বর (পোলিও) হওয়ার সময় বেশ কিছুদিন ধরে টেট্রাসাইক্লিন সিরাপ খেয়ে ছিল মেয়েটি (মেয়ের বাবা নাম করেই বললেন—টেরামাইসিন সিরাপ)। বাচ্চাটির এই রোগা দুবলা ভাব আর দাঁতে ছোপের পেছনে এই টেট্রাসাইক্লিনের ভূমিকাই যথাসম্ভব প্রধান। অনেক চিকিৎসকই এ ধরনের বাচ্চা বা রোগীর সাক্ষাৎ হামেশাই পান। বাচাদের ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন নামক এ্যান্টিবায়োটিক যথেচ্ছ ব্যবহারের কুফলের উদাহরণ এরা।

নানা রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী এ্যান্টিবায়োটিক নামের এই ওষুধগুলি কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব এনে দিয়েছে; হাজার হাজার মানুষএর কল্যাণে মৃত্যুর দুয়ার থেকে যেমন ফিরেছেন, তেমনি দীর্ঘতর সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষমও হয়েছেন। এ্যান্টিবায়োটিক (anti-বিরোধি; biosis—জীবন) কথাটির অর্থ, এমন এক ধরনের পদার্থ যা কোন একটি জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ তৈরী করে কিন্তু অন্য কোন জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের পক্ষে তা ক্ষতিকর বা তাদের ধ্বংস করে। এই সংজ্ঞা অনুসারে কুইনিন, সালফোনামাইড, আইসোনায়াজিড (যক্ষ্মা জীবাণু বিরোধি) ইত্যাদি এ্যান্টিবায়োটিক নয়। তবে বর্তমানে এ ধরনের তফাতের বাস্তব উপযোগিতা আর প্রায় নেই (Laurence)। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, নিওমাইসিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ এ্যান্টিবায়োটিকের উদাহরণ। সাধারণ ভাবে এ ধরনের পদার্থ দিয়ে চিকিৎসাকে কেমো থেরাপি বলা হয়। প্রাচীন কালেও এ ধরনের চিকিৎসা করা হত, যেমন প্রাচীন ভারতে চাউলমুগরা দিয়ে কুষ্ঠের চিকিৎসা, এ্যাজটেকদের চেনোপোডিয়াম দিয়ে কৃমির চিকিৎসা ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক কেমোথেরাপির শুরু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে—যখন নানা রোগের পেছনে নানা রোগজীবাণুর অস্তিত্ব জানা গেল এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য নানা রাসায়নিক পদার্থও আবিস্কৃত হতে থাকল। এহ্‌রলিক-কে আধুনিক কেমোথেরাপির জনক বলা হয়। ১৯২৮ সালে ফ্লেমিং আবিস্কার করলেন পেনিসিলিন, এক ধরনের ছত্রাক থেকে। এর পর নানা ছত্রাক ইত্যাদি থেকে একে একে অন্যান্য এ্যান্টিবায়োটিক আবিস্কৃত হল। এমনকি আর্জেন্টিনার এক ধরনের পিপড়ের মলাশয়ের গ্ল্যাণ্ড থেকে এক ধরনের এ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া গেছে। রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় এইসব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) যারা রোগজীবাণু বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে, কিন্তু মেরে ফেলতে পারে না (bacteriostatic) যেমন সালফোনামাইড (সালফাডায়াজিন, সালফাগুয়ানিডিন ইত্যাদি নানা নামে পাওয়া যায়), টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, অল্পমাত্রায় ইরিথ্রোমাইসিন, প্যারা

আমাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড (PAS) ইত্যাদি। (২) যারা রোগজীবাণুকে মেরে ফেলে (bactericidal) যেমন পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, এ্যাম্পিসিলিন, নিওমাইসিন, পলিমিক্সিন, বেশী মাত্রায় ইরিথ্রোমাইসিন, আইসোনায়াজিড, ক্যানামাইসিন, বেসিট্রেসিন ইত্যাদি। পুঁজ হওয়া,ক্ষত বিষিয়ে রক্ত দূষণ (septicaemia), নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, এপেণ্ডিসাইটিস, অস্টিওমায়েলাইটিস, গনোরিয়া, সিফিলিস, ইত্যাদি অজস্র ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী যে সব রোগ নানা জীবাণুর কারণে সৃষ্টি হয় তাদের নিরাময়ে এ ধরনের পদার্থের ভূমিকা অসামান্য।প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় এদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে।

কিন্তু তাই বলে এদের থেকে বিপদ যে কিছুই নেই বা এদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে নেই তা নয়। বরং অত্যাবশ্যক ওষুধ বলে এদের ভয়াবহ দিকগুলি প্রায়ই অবহেলিত হয়ে বিপদ ডেকে আনে।

যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন সিরাপের ব্যবহার। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ফাইজার বাচ্চাদের জন্য টেরামাইসিন নামে তা বিক্রি করে গেছে। অথচ এর ক্ষতিকর প্রভাব আগে থেকেই জানা আছে। বাচ্চাদের বর্ধিষ্ণু হাড় ও দাঁতে টেট্রাসাইক্লিন জমা হয় এবং হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে; দাঁত হয়ে যায় কালচে ছোপওয়ালা। দন্তক্ষয় (caries)-এর সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়। ফলে যে সব শিশু টেট্রাসাইক্লিন খায়, বড় হলে প্রায়শঃই তাদের হাড় হয় অপরিণত বিশেষত দাঁতের স্বাস্থ্যতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই। এসব কথা মাথায় রেখে এইমাত্র গত ১৯৮৩ সালে ভারত সরকার টেট্রাসাইক্লিন সিরাপ নিস্দ্ধি করেছেন। ১৯৮৪ সালে অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের (টেরামাইসিন) সিরাপও নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু অনেক দেশে এটি আরো আগে থেকেই বিপজ্জনক বলে নিষিদ্ধ। (বাচ্চাদের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ এ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে এ্যামপিসিলিন বা ইরিথ্রোমাইসিন।) কিন্তু শুধু বাচ্চাদের জন্য নয়, টেট্রাসাইক্লিন গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ করা উচিত। গর্ভাবস্থার চার মাসের পর মা টেট্রাসাইক্লিন খেলে গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। গর্ভাবস্থায় টেট্রাসাইক্লিন শরীরে গ্রহণ করলে মায়ের লিভার (যকৃৎ), প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মায়ের যদি কিডনির কোন রোগ থেকে থাকে তবে তা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।(গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে এ্যাম্পিসিলিন তুলনামূলকভাবে অনেক নিরাপদ।) সব মিলিয়েগর্ভবতী অবস্থায় ও১২বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের টেট্রাসাইক্লিন একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অনেকেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজেরাই দোকান থেকে কিনে বা বাড়ীতে থাকলে সেগুলি শিশু-মহিলা বা নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে থাকেন। (টেরামাইসিন, স্যাণ্ডোসাইক্লিন, রেস্টেক্লিন, থ্রিওসাইক্লিন, সুবামাইসিন, এ্যাক্রোমাইসিন,

এমিক্লিন, এ্যালসাইক্লিন, এ্যালিকুইন, লুপিসাইক্লিন ইত্যাদি নানা নামে টেট্রাসাইক্লিন বাজারে বিক্রি হয়।)

ক্লোরামফেনিকল-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের অভ্যাস আরো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। এন্টেরোমাইসেটিন, রেক্লোর, ক্যাটিলান, ক্লোরোস্ট্রেপ, এন্টেরোস্ট্রেপ, পাইরিমন, স্ট্রেপ্টোপ্যারাক্সিন, লাইকাসেটিন, বিওফিন ইত্যাদি নানা নামে এটি আলাদা ভাবে বা অন্য ওষুধের সাথে মিশিয়ে বাজারে বিক্রি হয়। টাইফয়েড-এর মত ভয়াবহ রোগে এটি যেমন অত্যন্ত কার্যকরী, তেমনি আরো নানা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধেও এটি সক্রিয়। কিন্তু অনেকে জ্বর হলেই নিজেরা এটি কিনে খেতে বা অন্যদের খাওয়াতে শুরু করেন। বেশী জ্বর হলে অনেক ডাক্তারও একে এলোপাথাড়ি দিয়ে যান। কিন্তু ক্লোরামফেনিকল টেট্রাসাইক্লিনের থেকেও বিপজ্জনক। এর থেকে হাড়ের মজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শ্বেতকণিকা ও অনুচক্রিকা (থ্রমবোসাইট)-র সংখ্যা অত্যন্ত কমে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে, এমনকি অ্যাপ্লাষ্টিক এ্যানিমিয়ার মত প্রাণঘাতী রক্তহীনতার সৃষ্টিও হতে পারে। ১৯৪৭ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। তারপর বেশ কয়েক বছর এটি সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকি সামান্য কোন জীবাণু সংক্রমণেও। তারপর ধীরে ধীরে এর মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি জানা যায় এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আমাদের মত দেশে এটি এখনো যে কেউ দোকান থেকে প্রেসক্রিপশান ছাড়া কিনতে পারেন। আর এর ফলে কারোর মৃত্যু ঘটলে তার পেছনে সঠিক কারণ প্রায়ই অনুসন্ধান করা হয় না।

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে প্রকাশিত একটি মৃত্যুর বিবরণ এর ভয়াবহতার অন্যতম উদাহরণ। চার বছর বয়সের একটি মেয়েকে ব্রংকাইটিস ও হাঁপানির জন্য দিনে এক গ্রাম করে চার দিন ক্লোরামফেনিকল দেওয়া হয়েছিল। ৬ মাস পরে মেয়েটির গলা ব্যথা (sore throat) করে, তাকে আবার চার দিন দিনে এক গ্রাম করে ক্লোরামফেনিকল দেওয়া হয়। ওষুধ শেষ হওয়ার তিন দিন পরে তার সারা গায়ের চামড়ায় রক্তের ছোপ দেখা দেয়। রক্ত দেওয়া সত্ত্বেও দু'সপ্তাহ পরে মেয়েটি মারা যায়। মৃতদেহটি পরীক্ষা করে দেখা যায় মেয়েটির এ্যাপ্লাষ্টিক এ্যানিমিয়া হয়ে গিয়েছিল। সদ্যজাত অপরিণত (premature) শিশুর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জীবাণু সংক্রমণ প্রতিহত করতে এর ব্যবহারে যে অত্যধিক মৃত্যু ঘটে তার থেকেও এর ভয়াবহতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ধরনের যে সব শিশুদের কোন এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় নি, তাদের মধ্যে ১৯%-এর মৃত্যু ঘটে; ক্লোরামফেনিকল ব্যবহারে মৃত্যুর হার হয় ৬০%; শুধু পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন দিয়ে মৃত্যুর হার হয় ১৮%-এর সাথে ক্লোরামফেনিকল যোগ করতে মৃত্যুর হার দাঁড়ায় ৬৮% (Laurence)। ক্লোরামফেনিকল থেকে নার্ভতন্ত্রও আক্রান্ত হতে পারে, বিরল ক্ষেত্রে চোখের নার্ভ নষ্ট হয়ে অন্ধত্বও ডেকে আনে। দেখা গেছে ২৫০০০ জনের মধ্যে অন্তত একজন ক্লোরামফেনিকল থেকে

অপরিবর্তনীয় এ্যাপ্লাষ্টিক এ্যানিমিয়ায় ভুগে মারা যায়। (Harrison) (ক্লোরামফেনিকল ছাড়া বাতের ওষুধ ফিনাইলবুটাজোন থেকেও এবং সালফাড্রাগ, বার্বিচুরেট, বেনজিন, ফেনোথায়াজিন, থায়োইউরাসিল ইত্যাদি থেকেও এ ধরনের এ্যানিমিয়া হতে পারে।) ক্লোরামফেনিকল তাই অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত,যখন তখন দোকান থেকে কিনে তো নয়ই। টাইফয়েড হয়েছে সুনিশ্চিত হলে, হিমোফিলাস ইনফ্লুএনজি নামক জীবাণু থেকে মেনিনজাইটিস ও নিউমোনিয়া হলে তা যদি অন্য ওষুধে ভাল না হয়, একমাত্র ঐ সব ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যায়। এ সব ক্ষেত্রেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু রোগীকে বাঁচানর তাগিদে এ ঝুঁকি নেওয়া বিজ্ঞানসম্মতই। কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক হচ্ছে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বা সামান্য কারণে একে ব্যবহার করা। যেমন ডায়ারিয়ার জন্য ক্লোরোস্ট্রেপ (পার্ক ডেভিস), এণ্টেরোস্ট্রেপ (দে'জ), স্ট্রেপটোপ্যারাক্সিন (বোরিংগার-নল) ইত্যাদি নামের ওষুধের মাধ্যমে স্ট্রেপটোমাইসিনের সাথে মিশিয়ে এলোপাথাড়ি ক্লোরামফেনিকল ব্যবহার করা অত্যন্ত অনৈতিক। এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ অন্যত্র নিষিদ্ধ হয়েছে, এমনি বাংলা দেশেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণায় ক্লোরামফেনিকলের সাথে অন্যান্য ওষুধের মিশ্রণ বাতিল করলেও ওষুধ কোম্পানির চাপে পড়ে ক্লোরামফেনিকল ও স্ট্রেপটো-মাইসিনের মিশ্রণকে ছাড় রাখা হয়েছে। এমনকি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশানের পত্রিকায় কিছু চিকিৎসক এই সব ওষুধ কোম্পানির মুনাফা অব্যাহত রাখতে এ ধরনের মিশ্রণের সপক্ষে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানও হাজির করে ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার কোন পাঠ্যপুস্তকেই ডায়ারিয়া-ডিসেন্ট্রির জন্য এই দুই ওষুধেরমিশ্রণেরব্যবহার উল্লেখ করা নেই। এ সব ক্ষেত্রে নেহাতই এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হলে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও কার্যকরী অন্য ওষুধ রয়েছে, যেমন কোট্রাইমক্সাজোল, টেট্রাসাইক্লিন।

ডায়ারিয়ার জন্য ক্লোরোস্ট্রেপ--এণ্টেরোস্ট্রেপ--স্ট্রেপটোপ্যারাক্সিন স্ট্রেপটোফেনিকল ইত্যাদি ওষুধের মাধ্যমে ক্লোরামফেনিকলের সাথে স্ট্রেপটোমাইসিনও খাওয়ান হয় ; স্ট্রেপটোট্রায়াডেও সালফাড্রাগের সাথে মিশিয়ে একে খাওয়ান হয়। অস্ত্রোপচারের পরে জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ করা, হৃৎপিণ্ডের অভ্যান্তরীণ আবরণীর প্রদাহ (endocarditis) ইত্যাদি ক্ষেত্রে একে ইনজেকশানও করা হয় পেনিসিলিনের সাথে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যেমন যুক্তিসঙ্গত তেমনি প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে এর প্রয়োগ ঘটে চলেছে। আর যক্ষ্মার জীবাণু মারার জন্য এর কার্যকারিতা ও গুরুত্ব অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইনজেকশান করে দিতে হয়। মুখে খাওয়ালে এটি অন্ত্র থেকে শরীরে খুব সামান্যই শোষিত হয় এবং স্থানীয়ভাবে কিছু কাজ করে বলে বলা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতে

একে ডায়ারিয়া বা ডিসেন্ট্রির জন্য মুখ দিয়ে খাওয়ানর কথা বলা হয় না, ক্লোরামফেনিকলের সাথে মিশিয়ে তো নয়ই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় স্ট্রেপটোমাইসিনকে শুধু যক্ষ্মার জন্য ইনজেকশান করে ব্যবহার করার নির্দেশ আছে। এই তালিকায় ডায়ারিয়ার জন্য কোডেইন ও লবণ জলের সরবতের (saline water or glucose saline) কথা বলা হয়েছে আর আমাশার জন্য মেট্রোনিডাজোল,ডাইলোক্সানাইড ও ক্লোরোকুইনের কথা বলা হয়েছে—ক্লোরামফেনিকল বা স্ট্রেপটোমাইসিন কোনটির কথাই বলা নেই। "স্ট্রেপটোমাইসিন খাওয়ালে খুব অল্প পরিমাণে শোষিত হয়ে চামড়ায় বিভিন্ন ধরনের এ্যালার্জির কারণ ঘটতে পারে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এমন রোগীকে স্ট্রেপটোমাইসিন খাওয়ালে রোগী বধির হয়ে যেতে পারে এবং কিডনির (বৃক্কের) ক্ষতি হতে পারে।"* কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ডায়ারিয়ার জন্য মুখে স্ট্রেপটোমাইসিন খাওয়ানর সুপারিশ করার মত বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। আর এ সবের ফলেই অবশ্যম্ভাবীভাবে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর এ সব ওষুধ পরম বিশ্বাসে মানুষ কিনে খাচ্ছে কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে।

বহু এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধই এই ভাবে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একসময় পেনিসিলিনও যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে বিকল্প অনেক ওষুধ জানতে পারার ফলে এর ব্যবহার অনেক কমেছে। পেনিসিলিনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে এর প্রতি এ্যালার্জি হয়ে বিপদ হতে পারে, এমনকি তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে (anaphylactic shock)। তাই পেনিসিলিন ইনজেকশনের আগে চামড়ার মধ্যে অল্প পরিমাণ দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখা দরকার পেনিসিলিনের প্রতি ঐ ব্যক্তির এ্যালার্জি আছে কিনা (skin test)। যাঁদের হাঁপানি, একজিমা, আমবাত ইত্যাদির মত এ্যালার্জিজনিত রোগ রয়েছে তাঁদের পেনিসিলিন না দেওয়াই ভাল। উচ্চমাত্রায় (প্রতিদিন ১৫০-২০০ লক্ষ ইউনিট) পেনিসিলিন ইনজেকশান-এর ফলে রক্তের লোহিতকণিকা ভেঙ্গে গিয়েও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ইনজেকশান ছাড়া পেনিসিলিন অন্য ভাবেও ব্যবহৃত হয় বা হত। কিন্তু এ ধরনের ব্যবহার প্রায়ই অবৈজ্ঞানিক। যেমন এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত পেনিসিলিনের মলম চামড়া বা চোখের জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এ মলম উল্টে স্থানীয় এ্যালার্জি সৃষ্টি করে-এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পেনিসিলিনের এ ধরনের সমস্ত মলম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সারাভাই কোম্পানির ট্যাবলেট পেন্টিডস-ও খুব চালু। এতে থাকে পেনিসিলিন জি। কিন্তু মুখে খেলে এটির ৬৬% অংশ নষ্ট হয়-যদিও এরও দাম ক্রেতাকে দিতে হচ্ছে। পেনিসিলিন যুক্ত লজেন্স (throat lozenges) অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটিও বিপজ্জনক, এর ফলে

* নিষিদ্ধ ওষুধ (ডাঃ পীযূষ কান্তি সরকার, ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম, পঃ বঃ)

গলায়, জীবে মুখে ঘা হয়ে যায়। অনেক সময় এ ধরনের ঘা হওয়ার পরে তার চিকিৎসার জন্য আরো পেনিসিলিন লজেন্স দিয়ে ব্যাপারটিকে আরো ভয়াবহ করে তোলা হয়। পেনিসিলিন যুক্ত এ ধরনের সমস্ত লজেন্সই নিষিদ্ধ করা উচিত।

সালফাড্রাগ্স্ আরেক ধরনের প্রয়োজনীয় ওষুধ যা নানা ধরনের জীবাণুর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। কিন্তু যথেচ্ছ ব্যবহারে এরও নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। কিডনিতে জমা হয়ে প্রস্রাবে এর কেলাস (crystal) বেরুতে পারে ; প্রচুর জল খাইয়ে ও এ্যালকালি মিক্সাচার খাইয়ে প্রস্রাবকে এ্যালকালাইন করে সর্তকতা অবলম্বন না করলে এর ফলে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে (renal tubular necrosis)। এছাড়া রক্তের লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যাওয়া, ডায়ারিয়া ইত্যাদির সম্ভাবনাও থাকে।

জীবাণু বিরোধি প্রতিটি ওষুধ আরো সব ওষুধের মতই নানা ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে কমবেশী। কিন্তু আরো বিপজ্জনক হচ্ছে, যখন তখন এসব ওষুধ সামান্য প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে খাওয়া বা ব্যবহার করা ; নির্দিষ্ট ডোজ না খেয়ে, কষ্ট একটু কমলেই মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। এর ফলে নানা জীবাণু ঐ ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করে ভয়াবহ অবস্থা ডেকে আনে, আগের ওষুধে তখন আর জীবাণুটি মারা যায় না। তাই বর্তমানে এক জীবাণুর নানা প্রজাতির বা ধরনের সৃষ্টি হয়েছে, দু'এক দশক আগেও যাদের অস্তিত্ব ছিল না,—এই নতুন ধরনটিকে মারার জন্য নতুনতর এ্যান্টিবায়োটিকের বা ওষুধের প্রয়োজন হচ্ছে। শুধুমাত্র পেনিসিলিনের উদাহরণ থেকে এ ভয়াবহ ব্যাপারটি কিছুটা বোঝা যাবে। ১৯৪১ সালে এটি যখন প্রথম ব্যবহৃত হয় তখন স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর মাত্র ১০% ছিল পেনিসিলিন-প্রতিরোধী। কিন্তু এখন আমেরিকার হাসপাতালে রোগীদের ৬০-৯০% স্ট্যাফাইলোকক্কাসই পেনিসিলিনের প্রতি প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে।

জীবাণু বিরোধি এই সব ওষুধের ব্যবহারে তাই সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অবশ্য অনুসরণ করা উচিত, যেমন—

(১) প্রথমেই ঠিক করা দরকার ওষুধটির আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা। কোন জীবাণু সংক্রমণের শুরুর দিকে ওষুধ দেওয়াটা সব চেয়ে কার্যকরী—এই সময়ই এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে ও ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা দরকার জীবাণুটি কি ও তাকে ঠিক কোন্ ওষুধে প্রতিহত করা যাবে।

(২) ওষুধটি উপযুক্ত পরিমাণে পুরোপুরি খাওয়াতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে (যেমন ইনজেকশান করে বা মুখ দিয়ে খাইয়ে ইত্যাদি) প্রয়োগ করতে হবে। যে সব লক্ষণের জন্য ওষুধটি দেওয়া হয়েছে ঐ সব লক্ষণ কমে যাওয়ার (apparent cure) পর তিন দিন পর্যন্ত ওষুধটি দিয়ে যেতে হবে,

লক্ষণগুলি আর যাতে ফিরে না আসে তা সুনিশ্চিত করার জন্য।

(৩) জ্বর হলেই জীবাণু বিরোধি কোন ওষুধ বা এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত নয়, এতে রোগ নির্ণয় কষ্টকর হয়ে পড়ে, ব্যাপারটি অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনো জ্বর (যেমন ভাইরাস জনিত) আপনা থেকেই সেরে যায়—এক্ষেত্রে এ্যান্টিবায়োটিক অপ্রয়োজনীয় (ভাইরাসকে মারার কোন এ্যান্টিবায়োটিক এখনো জানা যায় নি। ইনফ্লুয়েনজা, হাম, বসন্ত, ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি ভাইরাসজনিত অসুখ।) রোগ নির্ণয় করে উপযুক্ত ওষুধ নেওয়া দরকার। তবে কখনো কখনো হাতের কাছে পাওয়া ব্যবস্থাদি দিয়ে রোগ নির্ণয় করা মুস্কিল হয়, এবং রোগীর প্রাণ নিয়ে টানাটানির মত অবস্থা থাকে—সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দরকার হতে পারে; অন্যথায় নয়।

কিন্তু প্রায়শঃই যা হয়, বিশেষত 'শিক্ষিত' কিছু মানুষ (প্রকৃতপক্ষে অর্ধ-শিক্ষিত), জ্বর হলেই দোকান থেকে টেরামাইসিন, এ্যাম্পিলিন, পেন্টিড, এন্টেরোমাইসেটিন জাতীয় জানা কোন এ্যান্টিবায়োটিক দু'চারটে নিজে নিজে কিনে খেতে থাকেন এবং দু'তিন দিন পরে জ্বর ইত্যাদি কমে গেলে তা বন্ধ করে দেন। ব্যাপারটি খুবই বিপজ্জনক। এর ফলে জ্বর ইত্যাদি আবার ভয়াবহভাবে দেখা দিতে পারে, কিংবা তখনকার মত 'ভাল' হলেও ঐ ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনকারী মারাত্মক জীবাণু সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।

(৪) জীবাণু বিরোধি একাধিক ওষুধ একসাথে ব্যবহার করা উচিত নয়,—যদি না তার ব্যবহারের সপক্ষে যথেষ্ট কারণ থাকে। কারণ এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ওষুধগুলি পরস্পরের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার (mutual antagonism) সৃষ্টি করে। যক্ষ্মা রোগের জীবাণুকে মারার জন্য একাধিক ওষুধ আলাদাভাবে একই সাথে দেওয়াটা বিজ্ঞানসম্মত কারণে যুক্তিযুক্ত, যেমন, স্ট্রেপটোমাইসিন, আই এন্ এইচ (Isonicotinic acid hydrazide) ও প্যাস (Paraamino salicylic acid) একসাথে কিংবা আই এন এইচ ও রিফাম্পিসিন অথবা আই এন এইচ ও ইথামবিউটল একসাথে ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুটি জীবাণু বিরোধি ওষুধ একসাথে দেওয়া উচিত নয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একসাথে পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন মেশান বড়ি বিক্রি হত। এই কারণেই তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবু এখনো এ ধরনের ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়, অনেকে ব্যবহারও করেন। ডায়ারিয়ার জন্য একসাথে ক্লোরামফেনিকল ও স্ট্রেপটোসাইসিনের বা স্ট্রেপটোমাইসিনের সাথে সালফা ড্রাগের প্রয়োগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে এ্যালেম্বিক কোম্পানির বিস্ট্রেপেন (পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটো-মাইসিন একসাথে), সারাভাই কোম্পানির ডাইক্রিস্টিসিন-এস ৮০০ (বা ফোর্টিস) (ঐ); এ কোম্পানি বাচ্চাদের জন্যও এ ধরনের ওষুধ সাজিয়ে রেখেছে—ডাইক্রিস্টিসিন এস-পিডিয়াট্রিক। পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন একসাথে

একমাত্র হৃদপিণ্ডের অভ্যন্তরীণ আবরণীর প্রদাহে (bacterial endocarditis) বড়জোর দেওয়া যায়—কিন্তু যত্রতত্র নয়। এবং অবশ্যই তা আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশের যত বড় বিশেষজ্ঞই সুপারিশ করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে একই ট্যাবলেট বা ইনজেকশানে একাধিক এ্যান্টিবায়োটিক (fixed does combination)-এর ব্যবহার ক্ষতিকর বলে অন্যান্য দেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে—যে সব বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির ব্যবসা সুরক্ষিত করতে এঁরা এগিয়ে এসেছেন ঐ সব দেশেও। যেমন, "মুখে খাওয়ানর জন্য বা ইনজেকশান করে দেওয়ার জন্য আমেরিকায় এক সময় শতাধিক এ ধরনের ওষুধ (fixed dose combination) পাওয়া যেত। কিন্তু সেখানকার খাদ্য ও ভেষজ প্রশাসন (Food & Drugs Administration : FDA)-এর আদেশ বলে বাস্তবতঃ সবগুলিকেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে—কারণ বলা হয়েছে যে (ক) গবেষণায় (controlled studies) জানা গেছে প্রচারিত দাবী অনুযায়ী চিকিৎসাগত সুফল প্রকৃতপক্ষে এরা দেয় না, (খ) এদের যে পরিমাণ মেশান থাকে তা উপযুক্ত নয়, (গ) একসাথে একাধিক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রোগী আরো বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে, বিশেষতঃ যখন একটি মাত্র ওষুধই দরকার ছিল।" বলা হয়েছে যদি সত্যিই একাধিক এ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন থাকে তবে সেগুলিকে আলাদা ভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং রোগীর বয়স, ওজন ও শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হবে এটাই সবচেয়ে যুক্তি সঙ্গত। (Harrison) এত সব সত্ত্বেও আমাদের দেশে মিশ্র এ্যান্টিবায়োটিক ভাল ভাবেই চালু আছে। এদের মধ্যে যেমন ক্লোরোস্ট্রেপ, এন্টেরোস্ট্রেপ; স্ট্রেপটেট্রায়াড, বিস্ট্রেপেন, ড্রাইক্রিস্টিসিন ইত্যাদি রয়েছে—তেমনি আছে, ওমনাইসিন (পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন; সাথে থাকে ওমনাডিন নামে একটি রহস্যময় পদার্থ; হেক্সট কোম্পানির), পেনস্ট্রেপ (ঐ, M S D কোম্পানির), প্রোসিলিন-এস (ঐ, HAL কোম্পানির), ম্যাগনাসিলিন (এম্পিসিলিন ও ক্লক্সাসিলিন; এরিস্টো), স্যাণ্ডোসাইক্লিন (টেট্রাসাইক্লিনের সাথে ব্রক্সিকুইনোলিন ও ব্রোবেঞ্জোক্স্যালডিন; স্যাণ্ডোজ কোম্পানির) ইত্যাদি।

দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে জাতীয় ওষুধ নীতি চালু হওয়ার পর আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশেও এধরনের ওষুধ বাতিল করা হয়েছে। যেমন হেক্সট কোম্পানির ওমনাসিলিন ও ওমনামাইসিন ফোর্ট ইনজেকশান (আমাদের দেশে ওমনামাইসিন)। এটি বাতিল করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, "এ্যান্টি-বায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ। অসম্ভব দাম। অথচ বিকল্প ভাল ইনজেকশান বাজারে আছে। ওমনাডিন-সি নামের একটি সন্দেহজনক উপাদানের জন্যই নাকি

দাম বেশী, যদিও ওমনাডিন সি-এর কার্যকারিতার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। মুনাফা লোটার অভিনব কৌশল। ওমনাডিন-সি ছাড়া তৈরী করলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে নামটা বদলাতে হবে।" ওখানে আরো বাতিল হয়েছে ফাইসন্স-এর এমপিক্লক্স (এ্যামপিসিলিন ও ক্লক্সাসিলিনের মিশ্রণ), অর্গানন-এর এড্রিমাইসিন (প্রেডনিসোলোন ও নিওমাইসিনের মিশ্রণ), বি পি আই-এর সালফট্রায়াড ("তিনটি সালফার জাতীয় ওষুধের মিশ্রণ। অপ্রয়োজনীয় ও অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর ") ইত্যাদি। ওখানে স্কুইব কোম্পানির পেণ্টিড্স্ (২০০, ৪০০ ইত্যাদি) ট্যাবলেট ও সিরাপও বাতিল করা হয়েছে। (এই একই উপাদান একই নামে সারাভাই কোম্পানি আমাদের দেশে বিক্রি করে।) এটি বাতিল করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, "এতে আছে পটাসিয়াম পেনিসিলিন-জি (পেনিসিলিন-ভি নয়) যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী পাকস্থলীর জারক রসে নষ্ট হয়ে যায় এবং শোষিত না হয়েই বৃহদন্ত্রে চলে যায়। এভাবে ওষুধের বৃহৎ অংশই নষ্ট নয়, কোন কাজেই লাগে না। অথচ বিকল্প ও উন্নতমানের ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থের অপচয়। অনাবশ্যক বেশী দাম। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়।"

সব মিলিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সব এ্যান্টিবায়োটিক নিয়েও চলছে নির্মম ব্যবসা, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ব্যবহার। আর পাশাপাশি ওষুধ না হলে রোগজীবাণু মারা সম্ভব নয়—এ ধরনের মানসিকতাও সুদৃঢ় হয়ে আছে, অথচ মূলতঃ প্রয়োজন শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান। উপযুক্ত পুষ্টি, সুস্থ পরিবেশ, উন্নত জীবনযাপন প্রণালীর মাধ্যমে এটি করা সম্ভব, জীবাণু আক্রমণ জনিত রোগও অনেক কমান যায়। দেশের ব্যাপক মানুষকে এ সবের কোন সুযোগ না দিয়ে এ্যান্টিবায়োটিক সাজিয়ে রাখাটা ভয়াবহ সমাজ ব্যবস্থার এক করুণ পরিণাম। সামাজিক অবস্থা উন্নীত হলে এ্যান্টিবায়োটিক সহ বহু ওষুধের ব্যবহারই অনেক কমে যাবে।

(১৮)

'রক্ষকই ভক্ষক'—ফ্লোরাইড টুথপেষ্ট

না, টুথপেষ্ট কোন ওষুধ নয়। কিন্তু ব্যাপক প্রচারের ফলে এটি ব্যাপক মানুষের বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে, নিতান্ত গরীব ছাড়া অন্যদের মধ্যে, অন্যতম নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের অন্তর্ভুক্ত এবং এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, শরীর রক্ষার জন্য টনিক-হরলিক্স ইত্যাদির মত টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত না মাজলে মুখ পরিষ্কার ও দাঁত শক্ত, সুরক্ষিত হবে না। এ ধারণাকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক কোম্পানি আবার ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্ট বাজারে ছেড়েছে, যেমন, কলগেট ফ্লোরিগার্ড, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড বা বিনাকা ফ্লোরাইড। আর সাধারণ টুথপেষ্টের মধ্যে কলগেট (কলগেট পামোলিভ ইণ্ডিয়া লিঃ-এর), ফরহ্যান্স ইত্যাদি নামও সবার জানা। এরা সবাই কোন না কোন ভাবে বহুজাতিক কোম্পানির সাথে গাঁট ছড়া বাঁধা, কোনটি আবার ওষুধ কোম্পানির সাথেও, যেমন বিনাকা (এখন নাম পাল্টে সিবাকা) (সিবা-গেইগি)। এদের দেখাদেখি দেশী কিছু কোম্পানিও এগিয়ে এসেছে। সবারই দাবী তাদের টুথপেষ্ট দাঁতের এনামেলকে শক্ত করে, দন্তক্ষয় রোধ করে, দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের দাঁত শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ। ক্যালসিয়াম ঘটিত একটি পদার্থ (হাইড্রক্সিএ্যাপাটাইট) দিয়ে তৈরী এর শক্ত বর্হিভাগ—যার নাম এনামেল। এর ভেতরে রয়েছে নরম পাল্প, এই অংশে থাকে রক্তবহা নালী ও নার্ভতন্তু। ল্যাকটিক এ্যাসিড, বুটারিক এ্যাসিড, পাইরুভিক এ্যাসিড, এ্যাসেটিক এ্যাসিড ইত্যাদি এনামেলে হাইড্রক্সি এ্যাপাটাইটের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে এনামেলকে ক্ষইয়ে দেয়। এই ক্ষয় ভেতরের পাল্প্ অব্দি পৌঁছে গেলে ওখানকার নার্ভতন্তু উত্তেজিত হয়ে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। মুখের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই থাকে অজস্র জীবাণু (যেমন Lactobacilli, Streptococci ইত্যাদি)। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে মাড়ির গায়ে খাবারের টুকরো বিশেষতঃ শর্করা জাতীয় খাবারের টুকরো থেকে গেলে এই সব জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করে ও উপরোক্ত নানা ধরনের এ্যাসিড তৈরী করে। এর ফলে খাদ্যের পচন হয়ে মুখে দুর্গন্ধও হয়। দাঁত পরিষ্কার করার উদ্দেশ্য— দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে এই খাবারের টুকরো যাতে না জমে থাকে তার ব্যবস্থা করা। এটির জন্য দরকার ব্রাশ করা—তা সে নিম, শেওড়া বা কঞ্চির ডাল দিয়েই হোক বা প্লাষ্টিকের টুথব্রাশ দিয়েই হোক—এইটাই সব চেয়ে দরকার। এর সাথে টুথপেষ্টের প্রয়োজন প্রায় নেই।

সাধারণ টুথপেষ্টে থাকে, কিছু ক্ষার জাতীয় উপাদান (detergent) ও চকের গুঁড়ো জাতীয় কিছু পদার্থ (abrasive)। প্রথমটি বিশেষতঃ চর্বি জাতীয় ময়লা দাঁত থেকে দূর করতে সাহায্য করে, দ্বিতীয়টি শর্করা জাতীয় ও অন্যান্য খাবারের টুকরো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—যে কোন কিছু দিয়ে ভালভাবে ব্রাশ করলেই এসব পদার্থ দূর হয়। তার জন্য সাথে টুথপেষ্ট খুব একটা দরকার নেই। যদি

নিতেই হয় তবে যত কম পরিমাণ টুথপেষ্ট নেওয়া যায় ততই ভাল। কিন্তু দাঁতের এনামেলকে শক্ত করার ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকাই নেই। শরীরে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ফ্লোরিনের অভাব ঘটলে দাঁতের এনামেল শক্ত হতে পারে না। আবার ফ্লোরিনের পরিমাণ শরীরে বেশী হয়ে গেলেও দাঁত ভঙ্গুর হয়ে যায়—যা আমাদের দেশে ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্ট ঘটাতে পারে।

দন্তক্ষয় রোধ করা ও দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে না দেওয়ার জন্য মূলতঃ দরকার মুখের ভেতরটা পরিস্কার রাখা ও কোন খাবারের টুকরো যাতে লেগে না থাকে তা দেখা। যেকোন জিনিষ খাবার পরই খুব ভালভাবে কুলকুচি করে নিলে এটি করা যায়। আর দরকার সারাদিনে দু'বার ব্রাশ করা—এর মধ্যে রাত্রে শোওয়ার আগে একবার। (ব্রাশ করার আগে টুথব্রাশটি জলে বা নুন জলে ভিজিয়ে নরম করে নেওয়া দরকার।) সময় পরিবর্তনের সাথে অনেকে নিমডাল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে টুথব্রাশ অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য—বারবার ব্যবহার করা যায়, বহনযোগ্য, দেখতেও আধুনিক। তবে যা দিয়েই ব্রাশ করা হোক না কেন দাঁতে অত্যধিক চাপ দেওয়া উচিত নয় এবং দাঁতেরসামনে পেছনে উভয়দিকই ব্রাশ করা দরকার। এছাড়া দিনে অন্তত একবার আখ, কাঁচা পেয়ারা, শাঁকালু, কাঁচা গাজর বা এই ধরনের, আঁশযুক্ত কিছু খাবার চিবিয়ে খাওয়া উচিত, এতেও দাঁত পরিস্কার থাকে, পুষ্টিও ভাল পাওয়া যায়। এখন ব্যাপক বিজ্ঞাপনের জোরে সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের চকোলেটের ভক্ত হয়ে পড়েছে। শর্করাপ্রধান এসব পদার্থ দাঁতের ফাঁকে সহজেই আটকে যায় এবং জীবাণুর বৃদ্ধি ও এ্যাসিড তৈরী করে দাঁতের ক্ষয় ত্বরান্বিত করে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এসব পদার্থ যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল আর কিছু খাওয়ার পর মুখটা অবশ্যই ভাল করে কুলকুচি করে ধুয়ে ফেলা দরকার।

বাচ্চাদের পক্ষে টুথপেষ্ট যথেষ্ট ক্ষতিকর। অনেক বাচ্চাই টুথপেষ্ট খেয়ে ফেলে। একসময় এটি নানা ধরনের স্থায়ী পেটের রোগ, আন্ত্রিক প্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়! বড়দের ক্ষেত্রেও এটি কমবেশী সত্যি। আর টুথপেষ্ট অনেকের ক্ষেত্রে এ্যালার্জিরও সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মতামত স্মরণ করা যায়— "ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার সময় দাঁত সাদা করতে টুথপেষ্টের ব্যবহার কি ঠিক ? সব সময় এটি নিরাপদ নয়—কয়েক জন বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এর ফলে ঠোঁটের চারপাশে চামড়ার প্রদাহ, এমনকি শ্বেতীর দাগও শুরু হতে পারে। ...... তারা একটি সমীক্ষায় দেখেছেন, প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্রুত কার্যকারিতার উদ্দেশ্যে এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে যা চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর। কীটনাশক পদার্থ, ফলমূলজাত খাদ্যদ্রব্য, কাপড় কাচার সাবান ও সাবনগুঁড়ো, প্রসাধন সামগ্রি ইত্যাদিদের মধ্যেও এ

ব্যাপারটি হামেশাই করা হয়ে থাকে"। (দি স্টেটসম্যান ২৬. ৬. ৮৩) এইভাবে টুথপেস্ট একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন নয়, তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলিও এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত এর সাথে আবার অনেক টুথপেস্টে ফ্লোরাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফ্লোরাইড আমাদের দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই ফ্লোরাইড আমরা পাই আমাদের পানীয় জল থেকেই। জলেফ্লোরাইডের নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় মাত্রা হল প্রতি লিটারে০.৫-১.৫ মি গ্রা। ০.৫ মি গ্রা/লিটার-এর কম হলে তা দন্তক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ১.৫ মি গ্রা/লিটারের বেশী হলে

হাড়ের ও দাঁতের ফ্লুরোসিসে আক্রান্ত দু'জন রোগী

ফ্লুরোসিস রোগ হয়—এর ফলে দাঁতে ছোপ পড়ে (mottling)। পরে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়, হাড়ের গঠনও বিকৃত হয়ে যায় (Dental & skeletal fluorosis)। (পানীয় জল ছাড়া কিছু খাবার দাবারেও ফ্লোরিন থাকে, বিশেষতঃ সামুদ্রিক মাছ, চা ও চীজ-এ এর পরিমাণ যথেষ্ট।) আমেরিকা সহ পাশ্চাত্যের কিছু দেশের পানীয় জলে ফ্লোরাইডের পরিমাণ কম। তাই ১৯৪৫ সালে আমেরিকায় ও কানাডায়, ও পরে আরো ২০টি দেশে পানীয় জলে কৃত্রিমভাবে ফ্লোরাইড মিশিয়ে এই ঘাটতি মেটান হয় ও উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়;

ফ্লোরাইডের অভাবজনিত দন্তক্ষয় ইত্যাদি রোধ করা সম্ভব হয়। এসব দেশে তবু ফ্লোরাইড যুক্তটুথপেষ্টেরকিছুটা ভূমিকা রয়েছে তবে ফ্লোরাইডের অভাব মেটানর জন্য ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্ট নয়, সমাধান হচ্ছে জলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্লোরাইড মেশান বা আরো ভাল খাবার দাবার থেকে তা সংগ্রহ করা।

কিন্তু ঐ সব দেশেরই বহুজাতিক 'সাহেবী' কোম্পানিগুলি প্রচুর ঢক্কা নিনাদ করে যে ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্ট আমাদের দেশের বাজারে ছেড়েছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার প্রধান কারণ ভারতসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এসব দেশের পানীয় জলে ফ্লোরাইড যথেষ্ট পরিমাণে আছে, শুধু তাই নয় কোথাও কোথাও তা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে রয়েছে এবং ফ্লুরোসিস রোগের সৃষ্টি করেছে ব্যাপকভাবে। এছাড়া শীতপ্রধান দেশের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ জল খায় অনেক বেশী। তাই দেখা গেছে আমাদের দেশের পানীয় জলে ফ্লোরাইডের পরিমাণ ০.৫ মি. গ্রা./লিটার হওয়াই নিরাপদ। স্পষ্টতঃ এর সাথে ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্ট যুক্ত হয়ে ফ্লুরোসিসের সম্ভাবনা ও প্রকোপ অনেক বাড়িয়ে দেয়। ভারতবর্ষে রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর কোন কোন জায়গায় মহামারী আকারে ফ্লুরোসিস রোগ হতে দেখা যায়! যেমন রাজস্থানে ৩০ লক্ষ লোক এতে আক্রান্ত ; প্রায় ৬০০০ গ্রামের পানীয় জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা নিরাপদ সীমার বেশী, কোথাও কোথাও তা ১৫ গুণ বেশী! যোধপুরের ডিফেন্স ল্যাবরেটারির সমীক্ষায় এসব ভয়াবহ তথ্য জানা যায়। রাজস্থানে নাগাউর-এ একটি পুরো এলাকার নামই হয়ে গেছে 'বাঁকা পট্টি' কারণ ফ্লুরোসিসে আক্রান্ত হয়ে এখানকার বহু মানুষের চেহারাই বেঁকে কুজো হয়ে গেছে। (India Today; May 15, 1985) স্পষ্টতঃ আমাদের মত দেশে ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্ট বাড়তি বিপদ ডেকে আনার অবস্থায় রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বিপদ ডেকে এনেছেও। নতুন দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এর অধ্যক্ষ ও ইনটার ন্যাশান্যাল সোসাইটি ফর্ ফ্লোরাইড রিসার্চ-এর সহসভাপতি ডাঃ এ. কে. সুশীলা জানিয়েছেন ৬০ দশকের শেষ অব্দি ফ্লুরোসিস ভারতে ৪টি রাজ্যে ব্যাপক ছিল—বর্তমানে তা ১০টি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আড়াই কোটি ভারতীয় এ রোগে আক্রান্ত। এই ভয়াবহ বৃদ্ধির পেছনে ফ্লোরাইড টুথপেষ্টের ভূমিকাও অনেকখানি। (দি স্টেটসম্যান ; ২৮ ৪ ৮৭)।

আফ্রিকার কেনিয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলের পানীয় জলেও ফ্লোরাইডের মাত্রা নিরাপদ সীমার অনেক বেশী (কোথাও তা ৪৫ মি. গ্রা./লিটার)। কেনিয়াবাসী-দের ৬০%-ই ফ্লুরোসিসের শিকার। তা সত্ত্বেও এখানে কলগেট-পামোলিভ সহ নানা বহুজাতিক কোম্পানি ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্টেরব্যাপক প্রচারওপ্রসার করে। কেনিয়ান ডেণ্টাল ও মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। তারপর ১৯৮২ সালে কেনিয়া সরকার ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেষ্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা

জারী করেন। (মাসিক গণস্বাস্থ্য ; বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬) কিন্তু আমাদের দেশে এনিয়ে জনহিতকর কোন পদক্ষেপ এখনো নেওয়া হয় নি।

শুধু ফ্লুরোসিস নয়, সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় টুথপেস্টে এইভাবে ফ্লোরাইড মেশানোর আরো ভয়াবহ কথাও জানা গেছে। টোকিও (জাপান)-এর নিপ্পন ডেন্টাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তাকেকি সুৎসুউই প্রমুখ গবেষণায় দেখেছেন এধরনের ফ্লোরাইড DNA-এর ক্ষতি করে এবং টিউমারের সৃষ্টি করে। আমাদের শরীরের বহু এনজাইমের কর্মক্ষমতা ব্যাহত করে ফ্লোরাইড। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (সান ডিয়েগো) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এস এল এডোয়ার্ড প্রমুখরা লক্ষ্য করেছেন, ফ্লোরাইডের সংস্পর্শে সাইটোক্রোম সি পারঅক্সিডেজ নামক গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমের সক্রিয়তা ক্ষুন্ন হয় ও তার গঠনের পরিবর্তন ঘটে। এনজাইম অণুটির যে অংশ রাসায়নিক দিক দিয়ে সক্রিয় মূলতঃ সেখানেই ঘটে এই পরিবর্তন। তাঁরা অনুমান করেছেন একই পদ্ধতিতে ফ্লোরাইড DNA-এর থায়ামিন-এডেনিন সংযোগ স্থলেও পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে কোষ তার স্বাভাবিক ধর্ম হারায় এবং স্বাভাবিক কোষ টিউমার কোষে পরিণত হয়। (দেশ; ২২. ৩. ৮৬ থেকে সংগৃহীত) এবং এইভাবে ক্যান্সার ঘটাও অসম্ভব নয়। নানা ধরনের টিউমার-ক্যান্সার সৃষ্টিতে এইভাবে ফ্লোরাইড টুথপেস্টের ভূমিকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজলে যেমন ফ্লুরোসিস বা অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে তেমনি এটি, বিশেষতঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, কিছুটা খেয়ে ফেলে বা পেটে চলে গিয়েও ফ্লোরিন দূষণ (toxicity) ঘটাতে পারে। ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেস্টের দামও সাধারণ টুথপেস্টের চেয়ে বেশী। সব মিলিয়ে মিথ্যা বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত করে, দাঁতের সুস্বাস্থ্যের মোহ দেখিয়ে কোম্পানিগুলি আমাদের মত দেশের মানুষকে শারীরিক ও আর্থিক উভয় ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মেজে দাঁতের রোগ এড়ান যায়—সেটিরও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। বাস্তবতঃ দেখাগেছে টুথপেস্ট চালু হওয়ার আগে যে হারে দন্ত রোগ হত, পরেও এ রোগের হার প্রায় একই, বরং কোথাও কোথাও তা ক্রমবর্দ্ধমান। তা সত্ত্বেও সামান্য একটু পেস্ট নিয়ে ব্রাশ করাটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে তবু চলে, **কিন্তু আমাদের মত দেশে ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেস্ট নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত।**

(১৯)

চুলপাকা-চুলওঠা-টাকপড়ার হরেক দাওয়াই

মাথার চুল আমাদের কাছে একটি অতি সংবেদনশীল জিনিষ। শরীরের সৌন্দর্য রক্ষায় মাথার চুলে নান্দনিক গুরুত্ব পুরুষ-মহিলা সবার কাছেই রয়েছে। তরুণ বয়সে যদি মাথার চুল পড়ে যায়, কিংবা দু'একটি সাদা চুল দেখা যায়, টাকের আভাস দেখা দেয় তবে মানসিক দুশ্চিন্তা শুরু হয়—যেভাবেই হোক এ সব বন্ধ করা কিংবা টাকের অগ্রগতি আটকানর জন্য যে যা উপদেশ দেয় তা করতে কেউ পিছপা হয় না। আর এসবের সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা হাজারো ফাঁদ পেতে ফেলেছে। বিজ্ঞাপনের ঢক্কা নিনাদে নানা শ্যাম্পু, তেল মলম ইত্যাদি বিক্রি করে চলেছে। মাথার চুল সহ শরীরের নানা অংশের চুল আমাদের চামড়া থেকে সৃষ্টি হওয়া একটি অংশ চামড়ারভেতরে থাকে লোমকূপ। এই লোমকূপে থাকে সজীব কিছু কোষ যাকে বলা হয় হেয়ার ম্যাট্রিক্স। এই ম্যাট্রিক্স-এর কোষ গুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে কেরাটিন নামে প্রোটিন জাতীয় এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে এবং এটি লম্বা হয়ে চামড়ার বাইরে বেরিয়ে আসে—এটিই চুল। ম্যাট্রিক্স-এ মেলানিন তৈরী করতে সক্ষম মেলানোসাইট নামে এক ধরনের কোষও থাকে। এই মেলানিন কালো রঙের, চামড়ার কালো রঙও এর জন্যই। ম্যাট্রিক্স-এর মেলানোসাইট থেকে তৈরী হওয়া মেলানিন চুলে অর্থাৎ কেরাটিনের সাথেও মিশে যায়, তাই চুলের রঙ হয় কালো। (অনেক মানুষের চুলে হলদে-লাল রঙের রঞ্জক পদার্থ বেঞ্জোথায়াজাইলোলামিনও থাকে।) মাথার চুলের আয়ু গড় ৪ বছর, কিন্তু তা দশ বছর পর্যন্তও হতে পারে। চুল বৃদ্ধি পাওয়ার হার মোটামুটি দিনে ০.২-০.৩ মি মি।

পুং হরমোন এ্যাণ্ড্রোজেন-এর উপরেই মূলতঃ চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। এটি আবার শারীরিক পুষ্টি ও বিকাশ এবং বংশাণুর প্রভাব (genetic)-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চোখের ভুরুর চুল কোনভাবে এই হরমোনের উপর নির্ভরশীল নয়। এ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসরিত এ্যাণ্ড্রোজেন-এর উপর বগল ও যৌনাঙ্গের নীচের চুলের বৃদ্ধি নির্ভর করে। অণ্ডকোষ থেকে নিঃসরিত এ্যাণ্ড্রোজেনের উপর মুখের, কানের, হাতপায়ের ও যৌনাঙ্গের ওপরের চুলের বৃদ্ধি নির্ভর করে কিন্তু মাথার চুলের ক্ষেত্রে তার প্রভাব উল্টো। তাই এ্যাণ্ড্রোজেন বেশী হলে মাথায় টাক পড়ে যায়। মেয়েদের মেনোপজের (মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার) পরে স্ত্রী হরমোনের ক্ষরণ কম হয়ে যায়, ফলে মেয়েদের শরীরে সামান্য পরিমাণে থাকা পুং হরমোনের প্রভাব বেড়ে যায়, আর তাই এ বয়সে মেয়েদেরও টাক পড়তে শুরু করে। (অবশ্যি শুধু এ্যাণ্ড্রোজেন দিয়ে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা পুরোপুরি করা যায় না।) শারীরিক অপুষ্টি, কোন রোগের পর (যেমন টাইফয়েড ইত্যাদি) অপুষ্টি হলে,—একারণেও মাথার চুল পড়ে যায়। ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করলে এটি আবার ঠিক হয়। চুলের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি একটি জৈব প্রক্রিয়া। এটি

ঘটে শরীরের ভেতরে। বংশাণুগত প্রভাবও টাকপড়া ও চুলের বৃদ্ধির ওপর বিরাট ভূমিকা রাখে। এই কারণে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে টাক দুর্লভ, চীনা বা মঙ্গোলদের মধ্যে গোঁফদাড়ি কম থাকে ইত্যাদি। পরিবারের বিভিন্ন জনের মধ্যেও এই প্রভাব বিভিন্ন রকমের হয়। চুলের বৃদ্ধি ইত্যাদি আরো নির্ভর করে বয়সের উপর। এ্যাণ্ড্রোজেন ও আরো কিছু সর্তের মাধ্যমে এটি কার্যকরী। দেখা গেছে বাইরের তাপ ও আলো চুলকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু বাইরে থেকে দেওয়া অন্য কিছু নয়, তা সে—ডিম, লেবু, হেয়ার ভাইটালাইজার বা ফার্টিলাইজার, তেল, হেয়ার টনিক ইত্যাদি যাই হোক না কেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের গরুও গাছে চড়ে। তাই নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কিছু ওষুধ কোম্পানিও চুল পাকা বা পড়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য নানা মালকড়ি বাজারে ছেড়েছে।

যেমন এগ শ্যাম্পু। বলা হয় ডিমের প্রোটিন চুলের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়—তাই নিয়মিত এগ্ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুল সুপুষ্ট হয় তথা অকালে পড়ে যাওয়া বা পেকে যাওয়া রোধ করা যায়। এটি একটি বিরাট ধাপ্পা। চুল যেহেতু মৃত, কেরাটিন দিয়ে তৈরী তাই ডিম বা অন্য কোন কিছু থেকে প্রোটিন বা অন্য কিছু চুল শোষণ করতে তথা কাজে লাগাতে পারে না। চুলের গোড়া থেকেও এটি শোষিত হয় না। বড়জোর নেহাতই সাময়িকভাবে চুলকে একটু চকচকে রাখে। ঐ ডিম বরং মুখ দিয়ে খেলে শরীরের কাজে লাগত। কিন্তু চুলের চামড়ায় ঘসাঘসি করা অর্থের ও সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। চুলে বাইরের ধুলোবালি লাগলে সেটি বড়জোর শ্যাম্পু দিয়েও পরিস্কার করা যায়। এটি যে কোন সাবান বা সাধারণ শ্যাম্পু দিয়েও করা যায়। একই ভাবে চুলের স্বাস্থ্যের জন্য পেঁয়াজ, রসুন, লেবু, তেঁতুল ইত্যাদি ঘষাও নেহাতই হাস্যকর।

একই ভাবে নানা ধরনের তেলের প্রেস্‌ক্রিপশানও করা হয়। তৈল-জাতীয় পদার্থ (fat) চুলের গায়ে লেগে তাকে সাময়িকভাবে চকচকে করে তুলতে পারে। কিন্তু চুলের পুষ্টির জন্য তার কোন ভূমিকা নেই। নিয়মিত মাথায় তেল না দিলে চুল ভাল হয় না—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং যাদের মাথা বেশী ঘামে (মাথায় থাকা সেবেসিয়াস গ্ল্যাণ্ড থেকে সেবাম নামক ঘামের মত, কিন্তু ঘামের চেয়ে ঘন পদার্থ, যাদের মাথায় বেশী বেরোয়; এটি একটি রোগ—সেবোরিয়া, seborrhoea) তাদের ক্ষেত্রে বেশী তেল ব্যবহার ক্ষতিকরই। মাথার চামড়ার ঘা, বা সেবাম শুকিয়ে শক্ত হয়ে লেগে থাকা, খুস্কি বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি এর ফলে ঘটতে পারে।

মাথার চামড়ায় ঘষে ঘষে ম্যাসাজ করলে (এবং বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিশেষ কোন একটি শ্যাম্পু বা তেল দিয়ে) চুল ভাল থাকে, চুল বাড়ে বা পড়ে না ইত্যাদিও বলা হয়, কিন্তু এটিও ভুল। আমাদের মাথার চামড়ায় রক্ত সঞ্চালন যথেষ্ট বেশী। ম্যাসাজ করলে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন এমন কিছু হয় না বা হলেও তা চুলের উপর প্রভাব ফেলার মত নয়। আগে জন্তুজানোয়ারের ক্ষেত্রে দেখা গেছিল এধরনের ম্যাসাজ তাদের চুলের বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর কিছু প্রভাব ফেলে। কিন্তু

এখন জানা গেছে মানুষের ও জন্তুজানোয়ারের চুলের বৃদ্ধি ইত্যাদির পদ্ধতি আলাদা। মানুষের চুলের ক্ষেত্রে এধরনের ম্যাসাজের কোন প্রভাব নেই। একই ভাবে কার্বলিক এ্যাসিড পাৎলা করে বা ঐ ধরনের কোন পদার্থ চুলে দিলে চুল বাড়ে বলে একটি ধারণা রয়েছে। এটিও কোন কোন লোমশ জন্তুর ক্ষেত্রে ঘটে, মানুষের ক্ষেত্রে নয়।

পাকাচুলকে কালো করারও কোন ওষুধ এখনো আবিস্কৃত হয় নি। বড়জোর বাইরে থেকে কলপ বা কোন কালো রঙ লাগিয়ে তাকে সাময়িকভাবে ও আপাতভাবে কালো করা যেতে পারে। চুলের রঙ সাদা হলেই যে তা পরিপক্ক বা পাকাচুল—তা কিন্তু নয়। বয়সে তরুণ চুলও সাদা হতে পারে যদি ঐ চুলের ম্যাট্রিক্স থেকে কালো মেলানিন চুলে না যায়। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃই বংশাণু নির্ভর (genetic), এমনকি চামড়ার বিভিন্ন স্থানে চুলে মেলানিন ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিও। স্পষ্টতঃই এই বংশাণু নির্ভরতাকে কোন ওষুধ খাইয়ে বা লাগিয়ে সংশোধন করা যায় না—তা সে আয়ুর্বেদীয় বা আধুনিক কোন ওষুধ, তেল, হেয়ার ভাইটালাইজার ইত্যাদি যাই হোক না কেন। অতিরিক্ত চিন্তা করলে চুল পেকে যায়, এধরনেরও একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু চিন্তা করার সাথে চুলে মেলানিন ছড়ানোর কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চিন্তে থাকা লোকেদেরও চুল পাকে, চিন্তাবিদদের অনেকেরও চুল কালো থাকে।

আর নানা নামে নানা ওষুধ, তেল শ্যাম্পু ইত্যাদি আছেই যারা দাবী করে যে চুল পড়ে যাওয়া তথা টাক পড়া আটকাতে বা সারাতে পারে। স্বাভাবিকভাবে চুলের আয়ু নির্দিষ্ট। তাই এই আয়ু ফুরিয়ে যাবার পর কিছু চুল পড়বেই। এবং নতুন চুল গজায়ও, সুতরাং এর জন্য চিন্তিত হওয়াটা বোকামি। তবে হরমোনগত কারণে চুলের আয়ু কমে যেতে পারে যেমন গর্ভাবস্থার পরবর্তী কিছু সময়ে, মেয়েদের মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ে ইত্যাদি। কিন্তু এ অবস্থাকে পাল্টানোর জন্য চুলে কিছু লাগালে বা মাথায় কিছু ঘসলে শরীরের ভেতরে হরমোনের কিছু পরিবর্তন ঘটে না, তাই এসবের দ্বারাও চুল পড়া বন্ধ হওয়া বা বয়স্কা মহিলাদের টাকে চুল গজানো সম্ভব নয়।এছাড়া অপুষ্টি, দীর্ঘ রোগভোগের পর বা ক্যান্সারের ওষুধ খেলে চুল বেশী পড়ে যায়, এমনকি টাকও পড়তে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে চামড়ায় চুলের ম্যাট্রিক্স ঠিকই থাকে। তাই ওষুধ বন্ধ হলে বা পুষ্টির জোগান ঠিকমত হলে কিছুদিন পরে আবার চুলের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে যায়। স্টেরয়েড বা এই ধরনের হরমোন জাতীয় ওষুধ (দ্রষ্টব্য এনাবলিক স্টেরয়েড) খেলে চুল গজায় কিন্তু এর ফলে মাথায় নয়, শরীরের যত্রতত্র—দাড়ি, গোঁফ, গায়ে, মুখে লোম গজায়। সব মিলিয়ে পাকাচুল সাদা করার মত মাথায় টাক বা চুল পড়া বন্ধ করার জন্য কোন তেল, মলম হেয়ার ভাইটালাইজারই কার্যকরী নয়। মাথায় চামড়া পুড়ে বা কেটে যাওয়ার পর, ঘা হয়ে বা বেশী বয়সে চামড়ায় থাকা ম্যাট্রিক্স সম্পূর্ণ

নষ্ট হয়ে গেলেও ঐ জায়গায় চুল থাকে না বা টাক পড়ে যায়। এ অবস্থাকেও কোন তেল ঘষে বা ওষুধ খেয়ে পাল্টান যায় না। একে সংশোধন করার একমাত্র পদ্ধতি হল ত্বক সংস্থাপন (skin graft)—যা বাইরের কিছু কিছু দেশে হচ্ছে, আমাদের দেশেও দু'একটি জায়গায় করা হয় বলে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে কেওকার্পিন, ওয়েসিস ইত্যাদি অজস্র নামে বিজ্ঞাপিত হওয়া যে সব মালকড়ি দাবী করে যে, পরীক্ষিত প্রমাণিত, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তারা চুল পড়া বন্ধ করে ইত্যাদি, তাদের দাবী নিছক ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(তবে অতি সম্প্রতি একটি নতুন ধরনের, অপ্রত্যাশিত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা টাক-এ চুল গজানর ব্যাপারে সুফল পাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণালের (৭ই এপ্রিল, ১৯৮৪) পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী এটি বিশেষ ধরনের চুলহীনতা (Alopecia areata)-য় কার্যকরী। বলা হয়েছে—উচ্চ রক্ত চাপ কমানর জন্য ব্যবহৃত, রক্ত বহা নালী প্রসারণকারী (vasodilator) ওষুধ মিনোক্সিডিল (বাণিজ্যিক নাম লনিটেন) এভাবে যাদের মাথায় চুল উঠে যাচ্ছে তাদের মাথায় চুল গজাতে সাহায্য করে। ৫৩ জন রোগী তাদের টাক মাথায় ছয় মাস যাবৎ মিনোক্সিডিল ব্যবহার করে অত্যন্ত সুফল পেয়েছেন। তাঁদের শতকরা ৮০ জনের মাথায় চুল গজিয়েছে। যাঁদের রক্তচাপ স্বাভাবিক ছিল, তাঁদের রক্তচাপের অনুরূপ পরিবর্তন হয়নি। তবে একজন মহিলা অতিরিক্ত মিনোক্সি-ডিল ব্যবহারের দরুণ হৃৎপিণ্ডে অসুবিধা (palpitation) অনুভব করেন। অবশ্যই এটি এখনো গবেষণাসাপেক্ষ এবং বিশেষ ধরনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।)

সাদা চুলের জন্য কলপও অনেকে ব্যবহার করেন। এতে সাময়িকভাবে সাদা চুলে কালো রঙ লেগে থাকার দরুন সাদা চুলকে কালো দেখায়। কলপে গাছগাছড়ার বা অন্য কোন রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ থাকে। এটি মারাত্মক ক্ষতিকর না হলেও, অনেকের ক্ষেত্রে চামড়ার কিছু রোগ (contact dermatitis)-এর সৃষ্টি করে। অনেকে চুল খুব টানটান করে বাঁধেন, হয় 'স্টাইল' করে কিংবা চুল বাড়বে—এই আশায়। এটিও ঠিক নয়। বরং বেশী টানটান করার দরুণ চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে চুলের আয়ু কমে যেতে পারে। চুলের ডগা কেটে দিলে চুল বড় হবে—এ ধারণাও ভুল। চুল বড় হওয়া ইত্যাদি আগেই বলা হয়েছে, পুষ্টি, হরমোন, বংশাণু প্রভাব—এদের উপরেই নির্ভরশীল। লিভারের গণ্ডগোল বা হজমের গণ্ডগোল হলে চুল পড়ে যায় বা পেকে যায়, বলে ধারণা আছে। এই ধারণাটি কিছুটা ঠিকই। কারণ এর ফলে শরীরের পুষ্টি ব্যাহত হয়, চুলের ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু সত্যিই এ কারণেই যদি চুল পড়ে তবে সাথে পুষ্টির অভাবজনিত অন্যান্য শারীরিক লক্ষণ ও কষ্টগুলিও থাকবে। আর অনেক সময়ই লিভারের বা হজমের তথাকথিত গণ্ডগোল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে হওয়ার ব্যাপার—সঠিক কি হয়েছে তা নির্ধারণ করা হয় না। সব মিলে এ ধরনের

গণ্ডগোলের কারণে চুল পড়ে যাওয়ার ঘটনা, যতটা শোনা যায়, তার থেকে কমই। প্রায়শঃই যা হয়, স্বাভাবিকভাবে যে চুল পড়ে তার জন্য অহেতুক উদ্বেগের সাথে পেটের ছোটখাট কোন অস্বস্তিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

আর এ সব কারণেই চুল ওঠা, টাকপড়া, সাদা চুল ইত্যাদির জন্য বিজ্ঞাপনে ভুলে, 'কি হয় দেখাই যাক না' চিন্তা করে ব্যবসায়ীদের পকেট ভারি করাটা নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ। ক্রেতাদের চুলের প্রতি দরদের সুযোগ নিয়ে আর এই নির্বুদ্ধিতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে আরো অনেকের মত চুলের দাওয়াই-এর ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা চালাচ্ছে। আর ক্রেতারা একবার এ তেল, তাতে বিফল মনরথ হয়ে আর এক শ্যাম্পু—এ সব করে সব কোম্পানিকেই পয়সা দিয়ে যান। চুলের জন্য নিজের পুষ্টি ও শরীর ঠিক রাখুন, মাথায় মাঝে মাঝে সাধারণ কোন তেল (যেমন নারকেল তেল) মাখুন, আর ধুলোবালি পড়লে কখনো কখনো মাথায় সাবান বা পয়সা থাকলে বড়জোর সাধারণ কোন শ্যাম্পু দিন। শরীর ভাল থাকলে চুল ওঠা বা টাকপড়া বা দু'একটা সাদা চুলের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবহার করে পয়সা নষ্ট না করে ঐ পয়সায় ফলমূল কিনে খান—আখেরে লাভই হবে।

(২০)
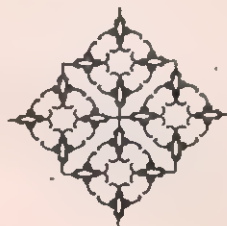
লোক ঠকানো চামড়া ব্যবসা

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ—শরীরের সব অংশের জন্যই ব্যবসায়ীরা পণ্য সাজিয়ে রেখেছে, কোনটি হয়ত প্রয়োজনে, কিন্তু অধিকাংশই অপ্রয়োজনে। আমাদের চামড়াও তার ব্যতিক্রম নয়। এ সবের কোনটি সরাসরি ওষুধ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, কোনটি আবার বিলাসদ্রব্য হিসেবে। কিন্তু এরাও দাবী করে, দ্রব্যটি চামড়াকে রক্ষা করবে, চামড়াকে সুস্থ-নরম-সুন্দর-উজ্জ্বল রাখবে, জীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেমন আমাদের এখানকার বাজারে খুব চালু এ ধরনের কয়েকটি মালকড়ি হচ্ছে বোরোলিন, বোরোক্যালেনডুলা, বোরোপ্লাস ইত্যাদি। এদের প্রধান আকর্ষণ সুন্দর একটি গন্ধ, এ কারণে বিশেষতঃ মহিলাদের কাছে এগুলি খুবই প্রিয়। দীর্ঘ ও ব্যাপক প্রচারে এগুলি ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মূল কারণ নিছক বিলাসদ্রব্য হিসেবে নয়, কাটাছড়া বা ত্বকের সুরক্ষার জন্যও তাদের প্রেসক্রিপশান করা হয়। ফলে ক্রেতারা এদের পেছনে পয়সা খরচ করার সুবিধাজনক যুক্তি পেয়ে মানসিক শান্তি পান। যেমন বোরোলিনের বিজ্ঞাপনে বলা হয় এটি "শুষ্কতা আর গা-হাত-পা ফাটা, র‍্যাশ বেরোনো বা রোদে ঝলসানোর থেকে ত্বককে রক্ষা করে। বোরোলিনের এ্যান্টিসেপটিক ক্ষমতা রোজকার সাধারণ কাটাছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।" এটি "সুরভিত এ্যান্টিসেপটিক ক্রিম।" শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ সব ঋতুতে যে এটি সমান প্রয়োজনীয় তা বড় বড় করে বলা হয়, যাতে সারা বছর এর ব্যবসা অক্ষুণ্ণ থাকে। বোরো ক্যালেনডুলাও "এ্যান্টিসেপটিক ক্রিম"। এটি নাকি "ক্যালেন-ডুলার ভেষজগুণে ভরপুর।" এর সাহায্যে "সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে আপনার ত্বকের পরিচর্যা করুন।" .... এটি "আপনার ত্বকের শুষ্কতা ও রুক্ষতাকে নমনীয় করে তোলে এবং ঠোঁট ফাটা, ছোটোখাটো কাটা-ছড়া ও পোড়ার ক্ষতকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।" "নিয়মিত" (হ্যাঁ, নিয়মিত — কারণ তা না হলে বিক্রি বাড়বে না) এটি ব্যবহার করে "আপনার ত্বককে সুস্থ, সতেজ ও কমনীয় করে তুলুন।" একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রতিষ্ঠানের এই দ্রব্যটিকে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হিসেবে গণ্য করা হয় ("a patent and proprietory Homoeopathic medicine of Hahnemann Laboratory")। অবশ্য হোমিওপ্যাথির জনক হ্যানিম্যান সাহেব হোমিওপ্যাথির এ ধরনের পেটেন্ট করা ওষুধের কথা শুনে আতঁকেই উঠবেন। কারণ এভাবে হোমিওপ্যাথির ওষুধ বানানো আর ব্যবহারের কথা তিনি আদৌ বলেননি। তবে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

উপরোক্ত পণ্যগুলিতে থাকে বোরিক এ্যাসিড, জিংক অক্সাইড ইত্যাদি যেগুলির জন্যই এদের উপর এ্যান্টিসেপটিক গুণ আরোপিত হয়। এছাড়া থাকে

ক্যালেণ্ডুলা নামে একটি গাছগাছড়ার ওষুধ। বোরিক এ্যাসিড ($H_3 BO_3$) গুঁড়ো আকারে বা সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ হিসেবে কিংবা গ্লিসারিণে (৩১%) মিশিয়ে এ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রকৃতপক্ষে এটি জীবাণুকে মারতে পারে না, শুধু তাদের বৃদ্ধি ও বিস্তারকে বাধা দেয় (feeble bacteriostatic)। কিন্তু এটি অত্যন্ত মৃদু ধরনের এ্যান্টিসেপটিক এবং উপরোক্ত পণ্য সম্ভারে যে অনুপাতে (১%) থাকে তাতে এর এই গুণ আরো কমে যায়, প্রায় কোন জীবাণুকেই তা আটকাতে সক্ষম নয়। বোরিক এ্যাসিডের এ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার এখন অনেক কমে গেছে, উন্নত দেশে প্রায় ব্যবহারই করা হয় না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় চামড়ার নানা রোগের জন্য বেশ কয়েকটি ওযুধের নাম থাকলেও বোরিক এ্যাসিডের (এবং জিংক অক্সাইড, ক্যালেণ্ডুলা ইত্যাদিরও) কোন উল্লেখ নেই। দুর্বল কার্যকারিতা ছাড়াও এর প্রধান কারণ এ থেকে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বোরিক এ্যাসিড অক্ষত চামড়া দিয়ে শরীরে ঢোকে না, কিন্তু কাটা-ছেঁড়া চামড়ায় লাগালে তা শরীরের ভেতর যায়—বোরোলিনে থাকা ল্যানোলিন (ভেড়ার লোম থেকে তৈরী এক ধরনের তৈল জাতীয় পদার্থ) এর শোষণ আরো বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে, যকৃৎ ও বৃক্ক (কিডনি) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ক্রমাগত শরীরে ঢুকলে মাথাধরা, অবসাদবোধ, বমিভাব, পাৎলা পায়খানা, পেটের নানা গণ্ডগোল ইত্যাদি দেখা যায়, যা প্রায়শঃই এই কারণে হচ্ছে তা বোঝা যায় না। যে পরিমাণ বোরিক এ্যাসিড শরীরে ঢুকলে মৃত্যুও ঘটতে পারে, সেটি বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১৫ গ্রাম ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৫ গ্রাম। কাটা-ছড়া চামড়া দিয়ে এ পরিমাণ শরীরে যেতে পারে, যদিও তা সচরাচর ঘটে না। বোরোলিন, বোরোপ্লাস, বোরোক্যালেণ্ডুলা জাতীয় পদার্থে বোরিক এ্যাসিড খুব সামান্য পরিমাণেই থাকে—এ কারণে জীবাণুর বিরুদ্ধে এর কার্যকারিতা যেমন অতি নগণ্য, তেমনি কাটাছেঁড়া দিয়ে শরীরে ঢুকলে, বিশেষতঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি বিপদ ঘটাতে পারে, যার প্রকাশ তাৎক্ষণিক না হয়ে ধীরে ধীরে ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে হয়। সবমিলিয়ে বিশেষতঃ বাচ্চাদের কাটাছেঁড়ায় এগুলি না লাগানোই নিরাপদ। এবং প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্মত নির্দেশই হচ্ছে, "বোরিক এ্যাসিডকে সবসময়েই বিষ (poison) বলে চিহ্নিত করা উচিত। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতাও এমন কিছু নেই, যা এর থেকে কম ক্ষতিকর পদার্থের দবারা পাওয়া যায় না। তাই হাসপাতাল ও বাড়ীর চত্বর থেকে একে দূরে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।" (Harrison) কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে ছদ্মবেশী বোরিক এ্যাসিড বহালতবিয়তেই রয়েছে। বোরিক এ্যাসিড ছাড়া আরেকটি যে উপাদান থাকে ল্যানোলিন, সেটি চামড়ায় একজিমা সৃষ্টি করতে পারে।

ক্যালেণ্ডুলা নামে পদার্থটি একটি ফুলগাছ (Calendula officinalis) থেকে পাওয়া যায়। জীবাণুর বিরুদ্ধে এর কোন কাজই নেই। মচকে গেলে বা আঘাত

লাগলে ঐ জায়গায় লাগান যেতে পারে, কিন্তু এর জন্য যে পরিমাণে লাগান দরকার পূর্বোক্ত পণ্যসম্ভারে তার তুলনায় নগণ্য পরিমাণই থাকে। বোরোপ্লাসে আরেকটি গাছের (Berberis aquifolium) নির্যাস থাকে বলা হয়, যা নাকি চামড়ার পুষ্টি, জীবাণু-আক্রমণ প্রতিরোধ, একজিমা ও ব্রণ সারিয়ে তোলা ইত্যাদি বিশাল বিশাল কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে এই পদার্থটির এই সব গুণাবলীও আদৌ প্রমাণিত নয়। জিংক অক্সাইডও জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী নয়, মলমে এর ব্যবহার চামড়ার রক্ষাকারী (protective) হিসেবেই। অন্যদিকে বারবার কাটা-ছেঁড়ায় ব্যবহার করলে, এটি শরীরের ভেতর ঢোকে এবং ধীরে ধীরে শরীরে জমা হয়ে নার্ভতন্ত্র ও মাংসপেশীকে আক্রান্ত করে।

সব মিলিয়ে বহুল বিজ্ঞাপিত এই সব পদার্থের এ্যান্টিসেপটিক হিসেবে যে বিরাট দাবী ও বহুল ব্যবহার রয়েছে তা নিছকই মিথ্যা। যে সাধারণ কাটাছেঁড়ার ক্ষেত্রে এদের ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়, ঐ ধরনের কাটাছেঁড়া কিন্তু সুস্থ যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই শরীরের নিজস্ব ক্ষমতায় সেরে যায়। দাড়ী কামানই হোক বা খেলার সময় হোক বা দৈনন্দিন নানা কাজের ফলেই হোক—এ ধরনের ছোটখাট কাটা-ছেঁড়া-ঘষা লাগা-চামড়া উঠে যাওয়ার ব্যাপারটিকে সামাল দেওয়ার জন্য তাই কোন ওষুধের দরকার হয় না। বরং এই ধরনের ক্রিম লাগালে তাতে ধুলোবালি তথা নানা জীবাণু আটকে ঝামেলা বাড়াতে পারে। সব চেয়ে বড় দরকার ঐ জায়গাটি পরিষ্কার ও শুকনো রাখা, আর যাতে ধুলো-বালি-ময়লা না লাগে তা দেখা। নানা রোগে যাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম, কিংবা যাদের ডায়াবিটিস (মেলাইটাস) রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের কাটাছেঁড়া শুকোতে দেরী লাগে, কিন্তু তার চিকিৎসা ঐ সব 'মলম' নয়; মূল রোগটির চিকিৎসা ও সাথে এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দরকার। ধুলোবালি যাতে আর না লাগে তার জন্য বড়জোর কিছু সময় ঐ জায়গাটি পরিষ্কার তুলো বা ন্যাকড়া কিংবা ব্যাণ্ড এইড জাতীয় জিনিষ দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। ব্যাণ্ড এডে আবার জীবাণু নাশক কিছু পদার্থ থাকে। এগুলির জন্য আদৌ নয়, ব্যাণ্ড এডের ভূমিকা থাকে এই ঢেকে রাখার জন্যই, পাশাপাশি এর ভেতর দিয়ে কিছু বায়ু চলাচল করতে পারে বলে ঘা'টা শুকোতেও পারে।

এ্যান্টিসেপটিক হিসেবে এই সব মালকড়ির ক্ষতিকর সম্ভাবনার ও মিথ্যাচারের পাশাপাশি এদের অন্যান্য দাবীগুলোও দেখা দরকার। বলা হয় এরা গ্রীষ্মের খরতাপ থেকে চামড়াকে রক্ষা করে। বাস্তবতঃ এক্ষেত্রে এদের কিছুটা ভূমিকা রয়েওছে। কিন্তু এ কাজটা পেট্রোলিয়াম জেলি জাতীয় অনেক সস্তার জিনিষ দিয়েই করা যায়, তার জন্য চড়া দাম দিয়ে পূর্বোক্ত বিলাসদ্রব্য কেনাটা নিছকই বিলাসিতা। একইভাবে শীতকালের শুকনো আবহাওয়ায় ঠোঁট বা চামড়া ফাটা আটকাতেও এদের ভূমিকা রয়েছে কারণ এরা চামড়ায় বা ঠোঁটে একটি প্রলেপ ফেলে ও বহিঃত্বকের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে পারে। কিন্তু এটিও পেট্রো-

লিয়াম জেলি কিংবা যেকোন সাধারণ তেল দিয়েই (নারকেল বা সর্ষের তেল ভালভাবে মেখে নিলে) করা সম্ভব। এর জন্য পূর্বোক্ত দামী বিলাসদ্রব্যগুলি অতিরিক্ত কিছু সুবিধা আদৌ এনে দেয় না।

সাধারণ এই কার্যকারিতার পাশাপাশি ব্রণ সারান ও চামড়ার পুষ্টি যোগানোর দাবীগুলিও কিন্তু এ্যান্টিসেপটিক দাবীর মত মিথ্যা কথা। চামড়ার পুষ্টি এই ভাবে বাইরের কোন ক্রিম বা মলম ইত্যাদি লাগিয়ে যোগান দেওয়া যায় না। চামড়ার নিজস্ব রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে শরীরের পুষ্টির সাথে সাথেই চামড়ার জীবিত কোষেরও পুষ্টি ঘটে। ভিটামিন-এ-র অভাবে চামড়ার যে অসুস্থ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার চিকিৎসা উপযুক্ত খাবার দাবারই, এ সব ক্রিম নয়। স্কলেরোডার্মা, মিক্সিডিমা বা এই ধরনের কিছু রোগের মোটা খসখসে চামড়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এ ধরনের ক্রিমের ভূমিকা শূন্য। অবশ্যি এগুলি লাগালে যে চটচটে ভাব হয় তা কারো ভাল লাগলে আলাদা কথা। কিন্তু এর জন্য তেল মাখাটাই সব দিক থেকে সুবিধাজনক।

এর পর আসে ব্রণের কথা—বিশেষত তরুণ তরুণীদের কাছে যা খুবই অস্বস্তিকর ও এর জন্য এরাও পূর্বোক্ত পণ্যসম্ভারের বিরাট খদ্দের। ব্রণ (acne) হচ্ছে সেবাম-গ্রন্হি বা সেবেসিয়াস গ্ল্যাণ্ডের অসুখ—ঘামের মত কিন্তু ঘামের চেয়ে আঠাল পদার্থ সেবাম এই সব গ্ল্যাণ্ড থেকে বেরোয়। মূলত মুখে ও মাথায়, যৌনাঙ্গের কাছে, চোখের পাতায়, শরীরের এদিক ওদিক চামড়ায় ঘর্মগ্রন্হির মত এ সেবামগ্রন্হি ছড়ান থাকে। এ সব গ্ল্যাণ্ড থেকে সেবামের নিঃসরণ সরাসরি পুং হরমোন (androgens) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষ থেকে নিঃসরিত পুং হরমোন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মূলতঃ এ্যাড্রেনাল গ্রন্হি থেকে নিঃসরিত পুং হরমোন ও ডিম্বাশয় থেকে নিঃসরিত সামান্য পরিমাণের পুং হরমোন এই নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। বয়ঃসন্ধির সময় যখন এই সব গ্ল্যাণ্ডের কাজের বিরাট পরিবর্তন আসতে থাকে তখন অন্যান্য শারীরিক রূপান্তরের মত সেবাম নিঃসরণও প্রভাবিত হয়। নিঃসরণের শুরুর দিকে ঘন সেবাম সেবাম-গ্রন্হির মুখ আটকে দেয় এবং জায়গাটি ফুলে উঠে ব্রণের সৃষ্টি করে। (কোন কোন ক্ষেত্রে এতে অল্প পুঁজও হয়—এতে Propionibacterium acnes নামে জীবাণুও থাকতে পারে।) সাধারণ ব্রণ বয়ঃসন্ধির বয়সে হরমোনগত কারণে দেখা দেয় এবং ২০ বছর বয়সের কাছাকাছি আপনা থেকেই চলে যায়—যদিও বিরল কারো কারো ক্ষেত্রে আরো বেশী বয়সেও থাকতে পারে বা দেখা দিতে পারে। ধারণা আছে বিশেষ কোন (যেমন তৈল জাতীয়) খাবার দাবার, পেটের বিশেষতঃ 'লিভারের গণ্ডগোল' থেকে ব্রণ হতে পারে। এটি ভুল ধারণা। ব্রণের জন্য চিন্তিত না হওয়াই ভাল, কারণ আগেই বলা হয়েছে দু'চার বছর পর আপনা থেকেই তা চলে যায়। তবে সাবান ও জল দিয়ে মুখটাকে পরিস্কার রাখা দরকার। কিন্তু পূর্বোক্ত

ক্রিমগুলি মাখলে বরং সেবাম গ্রন্থির মুখ আরো আটকে গিয়ে ব্রণ মেলানোর ব্যাপারটাই বিলম্বিত হয়। পুঁজ হয়ে গেলে এ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া (বা ইনজেকশান করা) যায় যেমন টেট্রাসাইক্লিন। এছাড়া তীব্র ক্ষেত্রে কিছু ওষুধও ব্যবহার করা যায়, যেমন শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি (ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টিনের মিশ্রণ) (অবশ্য এরও নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে), স্থানীয়ভাবে ক্লিণ্ডামাইসিন বা ইরিথ্রোমাইসিন এ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ ইত্যাদি। সম্প্রতি একটি নতুন ওষুধও (13-cis-retinoic acid) জানা গেছে যা নাটকীয়ভাবে জটিল ধরনের ব্রণ (severe cystic acne) নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এত সব জানা গেলেও ব্রণের জন্য বোরোলিন-বোরোপ্লাস জাতীয় দ্রব্যাদির বা তাদের উপাদানের ব্যবহার কিন্তু জানা যায় নি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোথাও বলাও হয় না। তাই ব্রণের ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার এ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহারের মতই হাস্যকর, মুখে ব্রণ হওয়ার মত একটি সংবেদনশীল ব্যাপারের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করার ধান্দা ছাড়া কিছু নয়।

সম্প্রতি আবার আগে থেকেই চালু 'রঙ ফর্সা করার দাওয়াই' ক্লীয়ার টোন "ভারতে সর্বপ্রথম ভিটামিন যুক্ত ক্লিনসিং মিল্ক" বাজারে ছেড়েছে। নির্মল হাসির খোরাক যুগিয়ে এদের দাবী "এতে দেওয়া ভিটামিন-ই আপনার ত্বকে এনে দেয় নতুন সজীবতা,......ত্বকের ভেতর থেকে টেনে আনে যতসব ক্ষতিকর ময়লা," এবং আরো নানা বিজ্ঞাপনী চটক, সুন্দরী মহিলার ছবি দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ভিটামিন-ই-এর এ ধরনের কোন অব্যর্থ গুণাবলী জানা যায়নি। খাবার দাবারে তা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, মানুষের শরীরে তার কোন অভাবই আজ অব্দি দেখা যায় নি। পরীক্ষাগারে কেবল জীবজন্তুর মধ্যে কৃত্রিমভাবে ভিটামিন-ই-এর অভাব ঘটিয়ে দেখা গেছে এর ফলে বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত, মাংসপেশী শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হয় ('টনিক' অংশ দ্রষ্টব্য),—কিন্তু চামড়ায় ময়লা জমে যাওয়ার মত কোন ঘটনা নয়। আসলে বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটির প্রতি সাধারণ মানুষের যেমন অজ্ঞতাপ্রসূত বিরাট ধারণা রয়েছে (তাই বিদ্যুৎবাহী তামার তারও আংটি করে, বালা করে অনেকে ধারণ করেন বাত ব্যথায়), তেমনি ভিটামিনের প্রতিও সাধারণ মানুষের যে মোহ রয়েছে তার সুযোগে ঐ ব্যবসায়িক চমক। চামড়ার কোষের ভেতরে মেলানিন নামক কালো রঞ্জক পদার্থ স্বাভাবিকভাবেই থাকে—কারোর কম, কারোর বেশী—তাই কেউ হয় ফর্সা, কেউ হয় শ্যামবর্ণ। একে ক্লীয়ার টোন বা অন্য কোন "রঙ ফর্সা করার ক্রিম" দিয়ে চামড়ার কোষের ভেতর থেকে দূর করার দাবী হাস্যকর—একেবারে চামড়া ছাড়িয়ে না ফেললে চামড়ার কালো মেলানিন দূর করা যায় না। আর বাতাসের ধুলোবালি চামড়ায় পড়লে তা এমন কিছু গভীরে ঢুকতে পারে না। তাই পরিষ্কার জল দিয়ে গা ধুলে, বড়জোর সাধারণ সাবান মেখে স্নান করলেই তা

দূর হয়। তবু বিজ্ঞাপনের গরুকে গাছে চড়িয়ে কি হাস্যকর ব্যবসায়িক দাবী। ফর্সা হবার প্রতি আমাদের দেশের মেয়েদের আগ্রহের সুযোগ নিয়ে অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। বুদ্ধু বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়ার এ আরেকটি জলন্ত উদাহরণ।

রং ফর্সা করার আজব দাওয়াই. সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলা ভিটামিন এবং এ্যান্টিসেপটিকের ধোঁকা

এই দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়াটা এদের মাত্রাতিরিক্ত দামের হিসেব থেকেও বোঝা যায়। এখন বোরোলিন বিক্রি হয় ৬ টাকারও বেশী দামে। বোরোপ্লাসের দামও এই ধরনের। সাধারণতঃ একটি টিউবে থাকে ২১ গ্রাম পদার্থ। এতে থাকে ১% বোরিক এ্যাসিড যার দাম বড়জোর ১-২ পয়সা। ২০ গ্রাম পেট্রোলিয়াম জেলি—দাম বড়জোর ৩০ পয়সা। জিংক অক্সাইড, ল্যানোলিন, কিছু সুগন্ধি জিনিষ—বেশী করে ধরলেও ১০ পয়সা। সব মিলিয়ে সর্বাধিক ৪০-৪৫ পয়সা। আর রয়েছে প্যাকিং, তৈরীর মজুরী। স্পষ্টতঃ টনিকের মত কি বিপুল পরিমাণ লাভ থাকে তা সহজেই অনুমেয়। আর এ লাভ টনিকেরই মত সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহারের সুপারিশ করে, বিপুল বিজ্ঞাপনে মিথ্যা কথা বলে এবং কখনো বা ক্ষতিকর সম্ভাবনার কথা চেপে গিয়ে। চামড়ার জন্য সাধারণ তেল বা ঠোঁট ফাটার জন্য পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদিও বাজার থেকে কিনলে

অনেক, অনেক কম দাম পড়বে।

চামড়া সংক্রান্ত এই সব ব্যবসার পাশাপাশি আরো নানা ধরনের জিনিষপত্র পাওয়া যায়। ঘা-এর জন্য একসময় সালফা জাতীয় ওষুধ ও পরে পেনিসিলিনের মলম ব্যবহৃত হত। এদের থেকে এ্যালার্জি (hypersensitivity)-র ব্যাপারটা ব্যাপক হতে থাকায় চামড়ার জন্য এদের মলম ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। এদের বদলে সোফ্রামাইসিন মলম বা আরো নানা নামে নানা তুলনা মূলক নিরাপদ ওষুধ পাওয়া যায়। এছাড়া চামড়ার নানা ধরনের রোগের জন্যও অনেক মলম, ওষুধ পাওয়া যায়, যার ব্যবহার চিকিৎসকের কাজের আওতার মধ্যে পড়ে। তবে এলোমেলোভাবে চামড়ায় নানাবিধ মলম লাগালে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিই হয়, যেমন স্টেরয়েড যুক্ত মলম (বেটনোভেট, বেক্লেট, কোটারিন-এইচ সি, ফ্লুকর্ট, কেনাকম্ব, লেডারকর্ট, লাইকর্টিন ইত্যাদি নানা নামে এ সব পাওয়া যায় ; ব্রণ, দাদ, চুলকুনি, যক্ষ্মার কারণে চামড়ার রোগ, ভাইরাস-ফাংগাস-জীবাণু-র সংক্রমণ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করা উচিত)।

চামড়ায় আরাম দায়ক পদার্থ হিসেবেও নানা জিনিষ ব্যবহৃত হয়। যেমন চামড়া ঠাণ্ডা, নরম রাখার নানা ধরনের মলম, মাথা যন্ত্রণা ইত্যাদির জন্য বাম্ জাতীয় ঝাঁঝালো গন্ধ যুক্ত জিনিষ ও আরো নানা কিছু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের মানসিক প্রভাবটাই গুরুত্বপূর্ণ (the psychologial effect is certainly important—Laurence)। তবে ব্যথা ইত্যাদির জন্য এগুলো ঘসলে স্থানীয় রক্তবহা নালীর প্রসারণ ও চামড়ার সূক্ষ্ম. নার্ভ তন্তুগুলি উত্তেজিত হয়ে কিছুটা কাজ করেও।

সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রে চামড়ার গুরুত্ব অনেকেরই কাছে রয়েছে। নিতান্ত গরীব মানুষেরা এই 'রঙ ফর্সা করার ক্রিম' বা 'সুরভিত এ্যান্টিসেপটিক ক্রিম' ইত্যাদির জন্য লালায়িত নয়। কিন্তু যাদেরই ক্রয় ক্ষমতা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ব্যবসায়ীরা চামড়ার ব্যবসা বেশ ভালই চালিয়ে যাচ্ছে।

(২১)

গাছে চড়া গরু—সেক্সটনিক

মানুষের অসহায়তা-অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আর বিজ্ঞাপনের জোরে গরুকে গাছে চড়ানোর আর একটি উদাহরণ নানা সেক্সটনিক ও 'বিশেষজ্ঞের' চিকিৎসা।

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সাথে মানুষের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল স্বাভাবিক যৌন জীবন। স্ত্রী ও পুরুষের সুস্থ যৌন মিলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে, তেমনি বিশেষ স্ত্রী বা পুরুষের শারীরিক-মানসিক সুস্থতাও রক্ষিত হয়। স্বাভাবিকভাবে যৌন উত্তেজিত পুরুষের লিঙ্গ উপযুক্ত ভাবে শক্ত হতে হবে। একই সাথে যৌন উত্তেজিত নারীর যোনিদ্বার থাকবে যোনিরসে সিক্ত ও পিচ্ছিল। এই অবস্থায় লিঙ্গ যোনিপথে কিছুক্ষণ থাকার পর, নির্দিষ্ট সময় পরে উভয়ের যৌন আবেগ চরমতম অবস্থায় পৌঁছায় এবং পুরুষের প্রস্রাবদ্বার দিয়ে বীর্য নারীর জরায়ুমুখে পড়ে, সেখান থেকে জরায়ুর ভেতরে ও ফ্যালোপিয়ান টিউবে যায়। নারীর ২৮ দিন ব্যাপী মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে নিঃসৃত একটি মাত্র ডিম্বকোষ পুরুষবীর্যে থাকা লক্ষ লক্ষ শুক্রকোষের একটির সাথে মিলিত হয়ে মানবশিশুর প্রাথমিক কোষ সৃষ্টি করে—এটিই মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি ও লালিত হওয়ার পর একসময় জন্ম নেয় মানবশিশু।* আমাদের বাবা-মা ও পূর্বপুরুষ—সবাইকেই এই অত্যাবশ্যক স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের জন্ম দিতে হয়েছে, আমরাও এইভাবে রেখে যাব আমাদের উত্তরসূরী।

এই গুরুত্বপূর্ণ যৌনমিলনে পুরুষের ভূমিকা স্পষ্টতঃই থাকে অধিকতর সক্রিয়। পুরুষের লিঙ্গ শক্ত না হলে যৌনমিলন আদৌ সম্ভব নয়। এবং তাই যৌনক্রিয়া সম্পর্কিত নানাবিধ গণ্ডগোলের জন্য তথাকথিত নানা ওষুধ ও চিকিৎসার প্রধান শিকার পুরুষরাই।

যৌনমিলনে পুরুষের ভূমিকার পাঁচটি অংশ রয়েছে।

প্রথমত, কাম ইচ্ছা (libido)। এ ইচ্ছা আদৌ না থাকলে লিঙ্গ শক্ত হবে না। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মূল নিয়ন্ত্রণে এবং ছোটবেলা থেকে অর্জিত নানা অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের প্রভাবে এটি ঘটে। আর অতি অবশ্যই এক্ষেত্রে অণ্ডকোষ নিঃসৃত হরমোন (testicular androgens) বিরাট ভূমিকা পালন করে। অণ্ডকোষ কেটে ফেললে (খোজা করা বা castration) যৌনইচ্ছা চলে যায় এবং হরমোন (testosterone) দিয়ে চিকিৎসা করলে এ ইচ্ছা সাময়িকভাবে অর্জিত হয়। এছাড়া অন্য কোন ওষুধ নেই যার সাহায্যে কামোত্তেজনা বাড়ান যায়।

দ্বিতীয়তঃ দরকার, লিঙ্গের শক্ত হওয়া (erection)। প্রাথমিক ভাবে এটি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের প্যারাসিমপ্যাথেটিক অংশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। আর ব্যাপারটি ঘটে লিঙ্গের মাংসপেশীতে অতিরিক্ত রক্ত জমা হওয়ার কারণে, উত্তেজিত অবস্থায় ধমনী দিয়ে রক্ত এই মাংসপেশীতে আসে কিন্তু শিরা দিয়ে পুরো

* এ ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত ধারণার জন্য এই লেখকের 'শরীর ঘিরে সংস্কার' বইটি দ্রষ্টব্য।

ফিরে আসে না (passive venous obstruction)। যৌনইচ্ছা ও আবেগগত গণ্ডগোলে অর্থাৎ মানসিক কারণেই প্রায়শঃ এই শক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ঠিকমত ঘটে না। এছাড়া আর যে সব কারণে এই শক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ঠিকমত হয় না (erectile impotence) তা হল—

(ক) হরমোনগত—

অণ্ডকোষের কাজ না হওয়া, হাইপার প্রোলেক্‌টিনিমিয়া

(খ) ওষুধ খেয়ে—

এ্যালার্জিবিরোধী ওষুধ—সাইমেটিডিন, ডাইফেনহাইড্রামিন, হাইড্রক্সিজিন

উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ—ক্লনিডিন, মিথাইলডোপা, রিসার্পিন, প্রপ্রানলল, স্পাইরোনোল্যাকটোন, থায়াজাইডস

এ্যান্টিকলিনার্জিক—এট্রোপিন, বেঞ্জট্রপিন, বিপেরিডিন, প্রোসাইক্লিডিন

এ্যান্টিডিপ্রেস্যান্টস্—এ্যামিট্রিপটিলিন, ডক্সিপিন, আইসোকার্বোক্সাজিড

এ্যান্টিসাইকোটিক্‌স্—ক্লোরপ্রোমাজিন, হ্যালোপেরিডল, থায়োরিডাজিন

প্রশান্তিদায়ক—ডায়াজিপাম, বার্বিচুরেট, ক্লোরডায়াজেপক্সাইড

নেশার ওষুধ—এ্যালকোহল, মেথাডোন, হিরোইন

(গ) লিঙ্গের অসুখ—আগে হওয়া প্রায়াপিজম (দীর্ঘক্ষণ ধরে লিঙ্গ শক্ত হয়ে থাকা), লিঙ্গে আঘাত, পিরনিজ ডিজিজ

(ঘ) নার্ভের রোগ—

মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব-এর সামনের অংশের রোগ

সুষুম্নাকাণ্ডের নানাবিধ রোগ

অনুভূতি গ্রহণের গণ্ডগোল—ডায়াবিটিস মেলাইটাস, পলিনিউরোপ্যাথি, টেবিস ডর্সালিস (সিফিলিস থেকে), ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ার রোগ

লিঙ্গের নার্ভের (nervi erigentes) রোগ—প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড কেটে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া, বৃহদন্ত্রের সিগময়েড কোলন ও মলাশয়ে অস্ত্রোপচার, এ্যাওর্টার অস্ত্রোপচার (aortic bypass) ইত্যাদির সময় এই নার্ভে আঘাত

(ঙ) রক্ত সংবহন তন্ত্রের রোগ—লেরিক সেণ্ড্রোম। (সূত্র ঃ Harrison) এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে স্পষ্টতঃ এর চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কারণগুলি দুর করা এবং এদের কোনটিরই চিকিৎসা তথাকথিত সেক্সটনিক নয়।

তৃতীয়তঃ হয় বীর্যস্খলন (ejaculation)। অনেকের ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয় খুব দ্রুত বীর্যস্খলন হয়ে যাওয়া। এটি প্রায় সব সময়ই ঘটে মানসিক কারণে। যৌনব্যাপারে দুশ্চিন্তা, অযৌক্তিক প্রত্যাশা বা আবেগগত অস্বাভাবিকত্বে এটি ঘটে। স্পষ্টতঃ কোন ওষুধ পত্রে এর সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। মানসিক আশ্বাস, যৌনমিলনের ব্যাপারটা পরিস্কার ভাবে অনুধাবন করা ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বড়জোর তীব্র অবস্থায় কিছু ওষুধ কিংবা ব্যায়াম বা

অন্য কোনভাবে মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি দূর করে এটিকে দূর করা যায়। বিরল ক্ষেত্রে বীর্যস্খলন আদৌ না হতে পারে। ডায়াবিটিস হলে বা মূত্রথলিতে অস্ত্রোপচারের কারণে বীর্যস্খলন বিপরীত দিকে (retrograde) হয়ে এটি ঘটতে পারে। পেটে পেছনের দিকে বড় কোন অস্ত্রোপচারের পর (extensive retro-peritoneal surgery) বা কোন কারণে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ কেটে গেলে বীর্যস্খলন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পুংহরমোন (androgen)-এর অভাবেও এটি ঘটতে পারে। আর দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ কিছু ওষুধ (যেমন guanethidine, phenoxybenzamine ও phentolamine) খেলেও বীর্যস্খলন বন্ধ হয়ে যায়। সবক্ষেত্রেই মূল কারণটি জেনে তার চিকিৎসা করা দরকার।

চতুর্থ অংশ হচ্ছে, রাগমোচন বা যৌনতৃপ্তির চরমতম মুহূর্ত (orgasm)—যা প্রায়শঃই বীর্যস্খলনের সময়ই ঘটে। যৌনইচ্ছা ও লিঙ্গের শক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ঠিকমত হলেও যদি এটি না ঘটে তবে বুঝতে হবে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মানসিক—মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, যৌনমিলনে অপরাধ বোধ, তাড়াহুড়ো করা ইত্যাদি নানা কারণে হতে পারে।

পঞ্চম ও শেষ অংশ হচ্ছে, লিঙ্গের নরম হয়ে যাওয়া (detumescence)—বিরল ক্ষেত্রে যৌনমিলনের পরও লিঙ্গ যন্ত্রণাদায়কভাবে শক্ত হয়ে থাকে (priapism)। লিঙ্গের রক্তের আংশিক জমাট বেধে যাওয়া (clotting)-এর ফলে এটি ঘটে বলে মনে হয়। এর সঠিক কারণ জানা যায় নি, তবে বিশেষ কিছু রোগেও (sickle cell anaemia, chronic granulocytic leukaemia, spinal cord injury) এটি ঘটতে পারে।

পুরুষের ক্ষেত্রে যৌনমিলনের এই পাঁচটি অংশ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বোল্লিখিত অজস্র কারণে এর অস্বাভাবিকত্ব ঘটতে পারে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তথা মানসিক কারণেই প্রায়শঃ ব্যাপারটি ঘটে। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে, এবং কাছাকাছি শোওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সঙ্কোচ ও উদ্বেগের কারণে যৌনইচ্ছা তথা লিঙ্গ দৃঢ় হওয়ার ব্যাপারটা কমে যেতে পারে। অনেকে এটিকেও বিশেষ কোন রোগ হিসেবে মনে করে চিকিৎসার জন্য ছোটাছুটি করেন। ছোট বেলা থেকে মায়ের অতি আদরের কিংবা আঁচল ধরা অনেক পুরুষও বিয়ের সময় স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক যৌন ব্যবহার করতে পারেন না। প্রায়শঃই এরা যাকে বিয়ে করে তার মধ্যে প্রিয়তমা মায়ের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তাকে ভালবাসে—অবচেতন মনে এই নারীর সাথে যৌনমিলনে অপরাধবোধ জাগে। এছাড়া সঙ্গিনীকে পছন্দ না হওয়া, নিজের যৌন অক্ষমতার ভয়, হীন মন্যতা, ক্লান্তি, উদ্বেগ, রুগ্ন স্বাস্থ্য ও শারীরিক দুর্বলতা, মনোমতভাবে বিয়ে না হওয়া ইত্যাদির জন্যও যৌন ইচ্ছা ও তৃপ্তির অস্বাভাবিকত্ব ঘটে। এইভাবে বহু বিচিত্র পরিস্থিতিতে ও বহুবিচিত্র কারণে যৌনইচ্ছা, লিঙ্গের উত্থান, বীর্যস্খলন বা

রাগমোচনের অস্বাভাবিকত্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া বেশী বয়সে পুংহরমোন প্রাকৃতিক নিয়মে কমে গিয়েও এটি ঘটতে পারে। স্পষ্টতঃ এগুলি কোন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা ভুল শুধু নয়, অনেক ক্ষেত্রে বিপদও ডেকে আনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গাছ (Corynanthe yohimbi) থেকে পাওয়া ওহিম্বিন নামক একটি পদার্থকে এক সময় কামোত্তেজক (aphrodisiac) হিসাবে কার্যকরী বলে ভাবা হত। নানা ওষুধপত্রে ব্যবহৃতও হত। এ গাছ নিয়ে অনেক রগরগে গল্প-উপন্যাসও লেখা হয়েছে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানসম্মত ভেষজবিজ্ঞানে এটি আর ব্যবহৃত হয় না, কারণ—প্রমাণিত হয়েছে এটি মানুষের যৌনক্রিয়ায় কোন ভূমিকা রাখে না। একইভাবে গণ্ডারের শিং-এর গুঁড়োর মত বহু বিচিত্র পদার্থও ব্যবহৃত হত বা হয়তো হয়ও। এরও কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। এছাড়া অজস্র ভিটামিন, লবণ, গাছগাছড়ার নির্যাস ইত্যাদি মিশিয়ে এবং কখনো বা পুংহরমোন মিশিয়ে অজস্র সেক্স টনিক বাজারে ছাড়া আছে। বহুল বিজ্ঞাপিত ওকাসা, থ্রিনটথ্রি ইত্যাদিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই দাবী করে। গয়া-কাশী-আগ্রার নানা আয়ুর্বেদিক সংস্থা পত্রপত্রিকা ও পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও এ ধরনের ব্যবসা চালায়। গাছগাছড়ার নির্যাসের সাথে কিছু ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ইত্যাদি মিশিয়ে বানান আরেকটি বহুল প্রচলিত পদার্থ হল নেভ্‌রোভিটামিন—৪ (ফ্রাংকো ইণ্ডিয়ান)। আধুনিক ওষুধের মোড়কে মোড়া এ ধরনের আরো দুটি আয়ুর্বেদিক পদার্থ হল স্পিম্যান ফোর্ট, টেণ্টেক্স ফোর্ট—সাথে পুরুষাঙ্গে লাগানোর জন্য হিমকোলিন মলমও রয়েছে এই একই কোম্পানির (হিমালয়ান ড্রাগস)। বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ (fixed dose combination) অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর হলেও এসবে মেশান থাকে অজস্র জিনিষ। স্থান সংক্ষেপ করার জন্য শুধু টেণ্টেক্স-এর উপাদানের উল্লেখ করা যায়। এতে আছে—স্যাফ্রন, মুস্কদানা, মকরধ্বজ, শিলাজুল, ত্রিভঙ্গ এবং Orchis mascula, Anacyclus pyrethrum, Withania somnifera, Sida cordifolia, Bombax malabaricum, Argyreia speciosa, Mucuna pruriens গাছের নির্যাস। এত বহু বিচিত্র উপাদান থেকেই ধোঁকাটা বোঝা যায়। এ যেন অন্ধের মত ঢিল ছুঁড়ে যাওয়া, যদি কোনটি লেগে যায়। কিন্তু বাস্তবে লাগার মত কোন পদার্থও এসবে নেই। আয়ুর্বেদ বা নানা দেশের প্রাচীন চিকিসাপদ্ধতিতে এসবের কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় এদের এ ধরনের কার্যকারিতার কথা এখনো জানা যায় নি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে উদ্ভিজ্জাত বহু রাসায়নিক পদার্থ স্বীকৃত ও গৃহীত হলেও এই উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত উপাদানগুলি এখনো কিন্তু ব্যবহৃত হয় নি।

হরমোন বাদ দিয়ে এই ধরনের নানা দাওয়াই-এর পাশাপাশি পুং হরমোন (টেস্টোস্টেরন) মিশিয়েও নানা ওষুধ বাজারে ছাড়া আছে। যেমন সাথে ভিটামিন বি-১২ দিয়ে হতাশাগ্রস্ত দুর্বল পুরুষদের ("depressed debilitated male

patients”) জন্য আছে একোয়াভাইরন বি-১২ ইনজেকশান (নিকোলাস কোম্পানির), স্নায়ু উত্তেজক ক্যাফিন মিশিয়ে আছে সেন্‌সো (ভিল্‌কো) ও পাসুমা স্ট্রং (মার্ক) ; আছে টেস্টানন ২৫ (ইনফার বা অর্গানন), ভিটামিন-ই ভিটামিন-৬ ও বি-১২ মিশিয়ে টেস্টোবায়ন (মার্ক), আছে টেস্টোভাইরন ও

“ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়

টেস্টোভাইরন ডিপো (জার্মান রিমেডিজ) ইত্যাদি ইত্যাদি। ঢালাও ভাবে এদের সবারই অন্যতম দাবী এরা লিঙ্গের দুর্বল উত্থান (impotence), দ্রুত বীর্যপাত (premature ejaculation) ইত্যাদি দূর করবে। কেউ আরো বলে যে, যৌন ইচ্ছা বাড়াবে (enhance sexual desire and vigour, improve performance,

correct functional-impotence) ; এমনকি ভ্যাসেকটমি ও রে (radiation) দেওয়ার পর যৌন দুর্বলতাও দূর করবে (টেন্টেক্স ফোর্ট)। (এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ভ্যাসেকটমির সাথে যৌন ক্ষমতা বা যৌন ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই, শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর অহেতুক উদ্বেগের কারণে মানসিক প্রভাব ছাড়া। স্পষ্টতঃ এর জন্যও ওষুধের ব্যবস্থা করা ক্ষতিকর। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ থেকে আইন করে জন্মনিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যাচার বন্ধ করা উচিত।) এইভাবে 'বিবাহের আগে ও পরেকার' নানা গণ্ডগোল দূর করতে এদের নাকি জুড়ি নেই।

সোনার প্রতি মানুষের আগ্রহ অতি পুরনো। প্রাচীন কাল থেকেই স্নায়ুদৌর্বল্য (neuroasthenia), সিফিলিস ইত্যাদির চিকিৎসায় সোনার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন জানা গেছে এসব ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা নেই। মাঝে যক্ষ্মার চিকিৎসায় এর প্রয়োগ করা হত, কিন্তু এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এতবেশী ও পাশাপাশি বিকল্প কার্যকরী ওষুধ জানা থাকায় এ ব্যবহারও বাতিল হয়েছে। শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের বাতে বিরল ক্ষেত্রে কেউ কেউ এর ব্যবহার করেন। (B. N. Ghosh's Pharmacology)। কিন্তু যৌন ক্ষমতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবু মকরধ্বজ, স্বর্ণ ভস্ম, সুবর্ণভঙ্গ (যেমন থাকে Speman Fort-এ) ইত্যাদি গালভরা নামের আড়ালে বহু কিছুতে সোনাও মেশান আছে অনাবশ্যাক ও ক্ষতিকরভাবে।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ ধরনের কোন পদার্থের অস্তিত্ব নেই যা কাম ইচ্ছা ও যৌন ক্ষমতা বাড়াবে বা সৃষ্টি করবে (aphrodisiac)। (Laurence) তাই যারাই এ দাবী করে তারাই নিছক লোক ঠকানো মিথ্যা কথাই বলে। এমনকি পুং হরমোন প্রয়োগেও সাধারণভাবে impotence-এ চিকিৎসা করা যায় না; বড়জোর এটি বিশেষ ব্যক্তির উপর মানসিক কিছু প্রভাব ফেলতে পারে ও কাজ না করেও আশ্বাস যোগায় ("placebo effect")। (Harrison) বিশেষ ক্ষেত্রে অণ্ডকোষের কাজ কমে গেলে (hypogonadal men) এর কিছু ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এ অবস্থাটি অতি বিরল এবং সঠিকভাবে রোগটি নির্ণীত না হলে এর প্রয়োগ বিপজ্জনক, ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় এই হরমোন (যেমন টেস্টোস্টেরন) ছাড়া এসব অবস্থায় ব্যবহারযোগ্য অন্য কোন পদার্থের কোন উল্লেখ নেই। আর এর উল্লেখ করেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে—সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় না করে, উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ছাড়া এর ব্যবহার করা উচিত নয়। বাংলাদেশে জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষিত হওয়ার পর নানা পদার্থের সাথে টেস্টোস্টেরন ইনজেকশান (ওয়েল্ডেমার), একোয়াভাইরণ বি-১২ (নিকোলাস—আমাদের দেশে এই একই কোম্পানি এই একই নামে একই ওষুধ

এখনো বাজারে ছেড়ে রেখেছে) ইত্যাদিও বাতিল করা হয়েছে। বাতিল করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে এদের "কার্যকারিতা সন্দেহজনক, অনুপস্থিত কিংবা একান্তই নগণ্য" এবং "অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও অপব্যবহার প্রচুর।" (বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও ওষুধ ; ডায়না মেলরোজ)

শরীরে সুনির্দিষ্ট অভাব না থাকলে টেস্টোস্টেরনের মত হরমোনের প্রয়োগ বিপজ্জনক, কারণ এটি অবাঞ্ছিত পুরুষালী ভাব এনে দেবে, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়, বিকৃত যৌন ইচ্ছার সৃষ্টি করতে পারে, সারা গায়ে লোম গজিয়ে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। উচ্চরক্ত চাপ থাকলে এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত, প্রস্টেট-এর ক্যান্সার থাকলেও। হরমোন বাদ দিয়ে যেগুলি বিক্রি হয় সেগুলি দু'চারটে খেলে সুস্থ লোকের ক্ষেত্রে উপকারও হয় না, বিরাট কোন বিপদও হয় না (সাধারণ টনিকের মত)—কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যদি লিভারের গণ্ডগোল থাকে তবে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

এদের সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা হল, গাল ভরা দাবীর আড়ালে মিথ্যে কথা ব'লে এরা সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসকদের বিভ্রান্ত করে। মানসিক ও পরিবেশগত দিকটি চাপা দিয়ে, নিছক ব্যবসার জন্য মানুষকে করে তোলে 'ওষুধ'-নির্ভর—একদিকে যেমন অনাবশ্যক পয়সা খরচ করায়, অন্যদিকে কারো কারোর ক্ষেত্রে ভিন্নতর অসুস্থতারও সৃষ্টি করে। আত্মার অস্তিত্ব না থাকায় পূর্বজন্ম, জন্মান্তরের সব তথাকথিত প্রচারই যে ভ্রান্ত তা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি যৌন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোন কিছু এখনো জানা না থাকায় এ ধরনের দাবী করা সব কিছুই প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। বিশেষ দু'একজন সাময়িকভাবে কিছু উপকার পান বলে জানান ; কিন্তু সত্যিই তা ঘটলে তা হয় নিতান্তই সাময়িক এবং প্রায়শঃই ব্যাপারটা মানসিক (placebo-effect)।

তথাকথিত সেক্স টনিকগুলি—যারা দাবী করে যে, যৌন ইচ্ছা তথা ক্ষমতা বাড়াবে তারা বড়জোর মানসিক কিছু আশ্বাস দেয় এবং এইভাবে মানসিক জোর পেয়ে আর কিছুদিন এগুলি খাওয়ার পর দু'চারজনের মধ্যে অসুবিধাগুলি নিজে থেকেই চলে যায়। কিন্তু এর ফলে মাহাত্ম্য বাড়ে এসব টনিকের। একই ভাবে পরম ঈশ্বরভক্ত বা গুরুভক্ত কেউ প্রসাদ, পাদোদক, প্রণামী ফুল ইত্যাদি খেয়ে কিংবা পূজা-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-আশীর্বাদ ইত্যাদির কারণে অনেক সময় সুস্থ বোধ করেন, এমনকি রোগমুক্তও হন। এসবের প্রকৃত কোন ক্রিয়া না থাকলেও, মানসিক কারণে এবং কখনো বা কাকতালীয়ভাবে উপকার পেয়েই মানুষ ব্যবসা ও মাহাত্ম্য বাড়ায় ঈশ্বর, গুরুবাবা বা আধ্যাত্মিক অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের—একইভাবে তথাকথিত সেক্স টনিক, সাধারণ টনিক এবং আরো নানা আধুনিক তথাকথিত 'বিজ্ঞানসম্মত' পণ্য পদার্থেরও।

(২২)

থ্যালিডোমাইড—একটি অবহেলিত শিক্ষা

বাবা-মা-র দুশ্চিন্তা আর দীর্ঘ প্রতাশ্যার অবসান ঘটিয়ে নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হল। বাড়ীতে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা। কিন্তু না, মুহূর্ত পরেই সে আনন্দ পরিণত হল বিস্ময় ও বেদনায়। এ শিশুতো কাম্য ছিল না,—বিকলাঙ্গ, হাত-পা অতিক্ষুদ্র, কখনো বা বিকৃত নাক-চোখ নিয়ে বিভৎস চেহারার!

১৯৬০ সাল নাগাদ ইউরোপের পশ্চিম জার্মানীতে এ ধরনের শিশু জন্ম হতে থাকে।—জন্মগত এই বিকলাঙ্গ অবস্থাটির নাম ফোকোমেলিয়া (Phocomelia; phoke—সীলমাছ ; সীলমাছের ছোট্ট পাখনার মত হাত-পাগুলো গায়ে লেগে থাকে বলে এই নাম)। এমনিতে এটি খুবই দুর্লভ। কিন্তু ১৯৫৯ সালে পশ্চিম জার্মানীর ১০টি চিকিৎসা কেন্দ্রে ১৭ জন এ ধরনের বাচ্চার জন্ম হল, ১৯৬০ সালে ১২৬ জন, ১৯৬১-তে ৪৭৭ জন।

চারিদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শুরু হল কারণ অনুসন্ধান। ভাইরাস-এর আক্রমণ, মায়ের এক্স-রে, খাবার দাবার ও তাদের সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পদার্থ, হরমোন, জন্মনিরোধের বড়ি—নানা সম্ভাবনা নিয়েই ব্যাপক কাজ করা হল। অবশেষে একজন চিকিৎসক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন মায়েদের ২০% জন গর্ভাবস্থার প্রথমদিকে কণ্টারজেন (Contergen) নামে একটি ওষুধ খেয়ে ছিলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে ৫০% মা-ই স্বীকার করলেন এই ওষুধ খাওয়ার কথা ; এঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে, ওষুধটি এতই সাধারণ ও নিরাপদ মনে হয়ে ছিল যে এর উল্লেখ করার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি। ১৯৬১ সালে শিশু চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে এই চিকিৎসকই ৩৪টি ফোকোমেলিয়ার শিশুকে হাজির করে আলোচনা করলেন ; কারণ হিসেবে কোন একটি ওষুধের ভূমিকার কথা বললেন। সুনিশ্চিত না হওয়ায় ও আইনগত কারণে তিনি ওষুধটির নাম উল্লেখ করেননি। ঐ রাতেই অন্য এক চিকিৎসক ঐ চিকিৎসকের সাথে দেখা করে জিগ্যেস করলেন, "ওষুধটি কি কণ্টারজেন? আমার স্ত্রী-ও এটি খেয়েছিলেন এবং আমাদেরও এমন একটি বাচ্চা হয়েছে।" শিগ্গিরই চারদিক থেকে প্রশ্নের স্রোত আসতে থাকলো। ক্রমশঃ এটি স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, ওষুধটি কণ্টারজেন-ই। ওষুধটির জেনেরিক নাম থ্যালিডোমাইড (2, 6-dioxo-3-phthalimidopiperedine)। বেশ আরাম দায়ক স্নায়ু নিস্তেজক ঘুমের ওষুধ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য অনেক ঘুমের ওষুধের মত এটি বেশী খেলে জ্ঞান হারান বা বহুক্ষণ ধরে গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকার ব্যাপার ঘটে না, থ্যালিডোমাইড খেয়ে আত্মহত্যাও করা যায় না। এটি প্রচার করে ওষুধ কোম্পানি এর অবাধ বিক্রি শুরু করেছিল। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি নানা ব্র্যাণ্ড (বাণিজ্যিক) নামে এটি বিক্রি করেছে যেমন কণ্টারজেন, ডিস্টাভাল, কেভাডন, টালিমল, সফ্টেনন। ব্যাপক পরীক্ষায় দেখা গেল ৪৬ জন ফোকোমেলিয়া-শিশুর মায়েদের

৪১ জন সুনিশ্চিতভাবে থ্যালিডোমাইড খেয়েছিলেন, ৩০০টি স্বাভাবিক শিশুর মায়েদের কেউই গর্ভাবস্থায় বিশেষত ৪র্থ-৯ম সপ্তাহের মধ্যে থ্যালিডোমাইড খাননি।

শুধু পশ্চিম জার্মানিতেই নয় ডিস্টাভাল নামে ইংল্যাণ্ডেও এটি বিক্রি হয়েছে, সেখানেও জন্ম নিয়েছে থ্যালিডোমাইড-শিশু। ১৯৫৬ সালে কণ্টারজেন নামে পশ্চিম জার্মানিতে এটি প্রথমে বাজারে বিক্রি শুরু হয়, ১৯৫৮ সালে ইংলণ্ডে। পঃ জার্মানীর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী এখানে অন্তত ১০০০০ এধরনের বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিয়েছে; এদের মধ্যে ৫০০০ শিশু মারা গেছে, বাকীদের ১৬০০ জনকে কৃত্রিম হাত-পা লাগান হয়েছে। ইংলণ্ডে জন্ম হয়েছে কম পক্ষে ৫০০ জন, মারা গেছে ২২৫ জন। আমেরিকাতেও এ ধরনের শিশুর জন্ম হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ওখানে তখনও থ্যালিডোমাইড-কে (কেভাডন বাণিজ্যিক নামে) বাজারে ছাড়ার অনুমতিই দেওয়া হয়নি। ১৯৬০-৬১ সালেই জানা গিয়েছিল থ্যালিডোমাইড বেশীদিন ব্যবহার করলে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কাজ কমে যায় এবং নার্ভের প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এই কারণেই আমেরিকায় তখনো এটির ব্যবহারের আইনগত অনুমোদন আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ওষুধ কোম্পানি বসে ছিল না। বাজারজাত করার আগে পরীক্ষামূলক ভাবে এটির ব্যবহার করা হয়েছিল। আমেরিকার ১২৭০ জন চিকিৎসকের মাধ্যমে অন্তত ২০৭ জন গর্ভবতী মহিলা সহ ২০৭৭১ জন রোগীর উপর এটির প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ ওখানেও ফোকো-মেলিয়া নিয়ে কিছু শিশু জন্মায়। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, পূর্ব জার্মানি, মিশর, ইজরায়েল, লেবানন, পেরু, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডেও এ ধরনের থ্যালিডোমাইড-শিশু জন্মায়; এসব দেশের কোনটিতেই কিন্তু থ্যালিডোমাইড বাজারে আসে নি। তবু এ ঘটনা ঘটার কারণ নতুন ওষুধের প্রতি মানুষের বিদ্‌ঘুটে আগ্রহ। বিদেশে চালু হওয়া নতুন ওষুধ প্রচুর দাম দিয়ে, নানা কায়দা করে, আনিয়ে খেয়ে অনেকেই বেশ তৃপ্তি অনুভব করেন, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও প্রেস্টিজ বাড়ান।

তবু পশ্চিম জার্মানিতেই এ ওষুধটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মৃদু ঘুমের ওষুধ হিসেবে প্রায় সব হাসপাতালেই নিয়ম করে বহু জনের উপর ব্যবহৃত হয়েছে; এমনকি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাচ্চাদেরও দেওয়া হয়েছে—যাতে তারা বাড়ীতে নতুন পরিবেশে চুপচাপ থাকতে পারে। এছাড়া নানা ধরনের কাশির ওষুধ, ব্যথা ও জ্বর কমানোর ওষুধের সাথে মিশিয়েও একে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন গ্রিপ্পেক্স, পলিগ্রিপান, পেরাকান এক্সপেকটোর‍্যাণ্ট, ভালগিস, টেনসিভাল, ভালগ্রেইন, এ্যাজমাভাল ইত্যাদি নানা বাণিজ্যিক (ট্রেড) নামের ওষুধের অন্যতম উপাদান হিসেবে মেশানো ছিল থ্যালিডোমাইড। শুধু ডাক্তাররাই থ্যালিডোমাইড বা এসব ওষুধের প্রেসক্রিপশান করতেন না, সাধারণ

মানুষও দোকান থেকে কোন প্রেসক্রিপশান ছাড়াই কিনে খেতেন।

আর থ্যালিডোমাইড-এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পর আতংকিত মানুষ আন্তরিকভাবেই যখন থ্যালিডোমাইড পরিহার করতে চাইলেন, তার পরেও বহুদিন তাঁরা এটিকে ব্যবহার করে যান। কারণ বাজারে থ্যালিডোমাইড এই জেনেরিক নামে ওষুধটি পাওয়া যায় না ; পাওয়া যায় নানা ব্রাণ্ড নামে এবং ওষুধের গায়ে ব্রাণ্ড নামটি বড় করে লেখা,—জেনেরিক নাম (থ্যালিডোমাইড) হয় লেখা নেই, নয়তো লেখা ক্ষুদে হরফে। এছাড়া ছিল মিশাল দেওয়া ওষুধের অন্যতম উপাদান হিসাবে ঐ থ্যালিডোমাইড।

থ্যালিডোমাইড খেয়ে ফোকোমেলিয়াযুক্ত শিশুর জন্ম সবচেয়ে বেশী হয়েছে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ও ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারের মত পেশার লোকেদের মধ্যে। এরও স্বাভাবিক কারণ—এঁদের ওষুধ কেনার প্রচুর আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে এবং নতুন ওষুধ সম্পর্কে সচেতনতা ও আগ্রহ এঁদের বেশী। তবে গর্ভাবস্থায় (বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার ৩৭-৫৪ দিনের মধ্যে ; ভ্রূণের উপর থ্যালিডোমাইডের প্রতিক্রিয়া এই সময়ই সর্বাধিক) যেসব মহিলা এটি খেয়েছেন তাঁদের সকলেরই যে বিকলাঙ্গ বাচ্চা হয়েছে তা নয়—মোটামুটি ২০%-এর ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে, কিন্তু এই হিসেবটাও অসম্পূর্ণ।

থ্যালিডোমাইডের ঘটনা ওষুধ সম্পর্কে মানুষকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। আগে নতুন ওষুধের প্রভাব গর্ভাবস্থার উপর পরীক্ষা প্রায় করাই হত না। কিন্তু এর পর থেকে তা বাধ্যতামূলক করা হয়। ওষুধ বাজার জাত করণের সরকারী নিয়ন্ত্রণের শিথিলতাও অনেকটা দূর হয়েছে। অবশ্যি আমাদের দেশে কতটা হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

কিন্তু থ্যালিডোমাইডের সব শিক্ষাই যে অনুসরণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তা নয়। ওষুধের নামে প্রচলিত পদার্থের উপর অহেতুক নির্ভরতা এখনো কমেনি। অন্যের কাছে—এখনো সহজলভ্য নয়, নতুন বা শুধু বিদেশে পাওয়া যাচ্ছে, এ ধরনের ওষুধও অনেকে নানাভাবে জোগাড় করে খেয়ে ও অন্যদের টেক্কা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে যান। যেসব কষ্ট আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায় (self limiting) বা নেহাৎ অনিবার্য না হলে যেখানে ওষুধ অনায়াসে এড়ান যায়, সেসব ক্ষেত্রেও সামান্য প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ওষুধের প্রতি মোহ মানুষের কমেনি। অনেক চিকিৎসকও এসব ক্ষেত্রে কিছু ওষুধ প্রেসক্রিপশান করার লোভ সামলাতে পারেন না। থ্যালিডোমাইডের ক্ষেত্রে যেমন—গর্ভাবস্থায় মানসিক দুশ্চিন্তার কারণে বা অন্য কোনভাবে ঘুম একটু কম হওয়া বা মানসিক অস্থিরতার জন্য ওষুধ খাওয়া এমন কিছু জরুরী নয়! তবু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সৃষ্টি করা পণ্য নির্ভরতার মানসিকতায় এখনো এধরনের ওষুধ খাওয়া হয়, তখনো খাওয়া হয়েছে। আর এই মানসিকতার ফলেই অন্যান্য প্রমাণিত ক্ষতিকর অপ্রয়োজনীয়

পদার্থের ব্যাপক ব্যবহারের কিছু উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

থ্যালিডোমাইড প্রসঙ্গে এ ধরনের বহুল প্রচলিত—আরো নানা ওষুধের কথা বলা যায়। একটি হল যেমন মেপ্রোব্যামেট,—ইজোয়াজেসিক, ইকোয়ানিল, ইকোয়া নাইট্রেট, মিলটাউন, নেওকর, সর্বিট্রেট ইত্যাদি নানা বাজারী নামে এটি পাওয়া যায়, হয় আলাদাভাবে, নয় অন্য অনেক কিছুর সাথে মিশিয়ে। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে ঘুমের জন্য বা মানসিক উত্তেজনা-অস্থিরতার জন্য এটি ব্যবহার করলে শিশুর জড়বুদ্ধি হয়ে বা কম বুদ্ধ্যংক নিয়ে জন্ম হওয়ার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে বুদ্ধির ব্যাপারটা চট করে চোখে পড়ে না; মাপাও মুস্কিল ও তুলনামূলক বিচার করেই ক্ষান্ত হতে হয়। তাই কিছু সতর্কতার কথা বলা হলেও কঠোরভাবে এ ধরনের ওষুধ গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয় নি, চলেছে অবাধ ব্যবহার—রোগী নিজে কিনে খান বা দু'একজন ডাক্তারও হয়তো দিয়ে দেন। কিছু ওষুধ রয়েছে যেগুলো বাবা খেলেও জীনগত (genetic) রূপান্তরের ফলে অসুস্থ বিকলাঙ্গ বা জড়বুদ্ধি শিশুর জন্ম হতে পারে। (মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারটি এখনো গবেষণার স্তরে রয়েছে; তবে জীবজন্তুর উপর পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত)। আর সার্বিকভাবে ওষুধটি যে খাচ্ছে, তার নিজস্ব ক্ষতির সম্ভাবনা তো বহু ওষুধের ক্ষেত্রে রয়েইছে।

ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষা না করে, চটজলদি মুনাফার লোভে ওষুধ বাজারে, ছাড়ার প্রতিযোগিতাও অব্যাহত। আমাশার জন্য ক্লিওকুইনল যুক্ত ওষুধ বা শিশুদের জন্য এ্যানাবলিক স্টেরয়েড, টেরামাইসিন সিরাপের মত বহু কিছুর ব্যবহার এখনো চলছে বা এই কিছুদিন আগে অব্দিও চলেছে। লাভের জন্য ব্যাপক বিজ্ঞাপন করে চিকিৎসক ও রোগীদের বিভ্রান্ত করা এবং তাড়াতাড়ি বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা বন্ধ হয় নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তথা ওষুধ ও মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যকে নিয়ে ব্যবসা করার ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এটি পুরোপুরি বন্ধ হওয়াও মুস্কিল। পাশাপাশি প্রয়োজন সবার সচেতনতা ও রোগীদের প্রতি মমত্ব বোধ।

বহু চিকিৎসকও ওষুধ সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে, উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে, ওষুধ কোম্পানির প্রচার শুনেই ওষুধ লিখতে শুরু করেন, কেউ বা তাদের দালালে পরিণত হন। থ্যালিডোমাইড সম্পর্কে যেমন, এখনো তেমনি মানসিকতা অব্যাহত। এঁদের কেউ কেউ আবার ওষুধ কোম্পানির কাছ থেকে নানা উপায়ে ঘুষ নিয়ে ঐ কোম্পানি ও তার পণ্যের সপক্ষে নানা তথ্য ও বিভ্রান্তিকর গবেষণা চালিয়ে যান। ডায়ারিয়ার জন্য ক্লোরামফেনিকল ও স্ট্রেপ্টোমাইসিনের মিশ্রণ, লিভারের জন্য লিভ্-৫২ জাতীয় পদার্থ, বাত ব্যথায় অক্সিফেনবিউটাজেন-এর মত জিনিষের উপর নানা নামী-অনামী চিকিৎসকের তথাকথিত গবেষণাপত্র প্রায়ই চোখে পড়ে। সামান্য কিছু

তথ্য ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এঁরা ওষুধ কোম্পানির বিক্রি ও মুনাফা বাড়ানোর কাজ করেন ("Doctors, who write testimonials on inadequate evidence, thus encouraging over-promotion" —Laurence)। কোন কোম্পানি বাজারে নতুন ওষুধ (বা নতুন নাম দিয়ে পুরনো ওষুধও) ছাড়লে অনেক চিকিৎসকই রোগীদের চমক দেওয়ার জন্য এবং সাম্প্রতিকতম 'জ্ঞানের'

থ্যালিডোমাইড-শিশু

সাথে নিজেদের পরিচিতি প্রমাণ করার জন্য উপযুক্ত কারণ না থাকলেও এসব ওষুধ দিয়ে যান। থ্যালিডোমাইডের ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে এবং এখনো এ মানসিকতা বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়া হলেই তার ব্যবহার করতে হবে তার কোন মানে নেই। পুরনো ওষুধের চেয়ে বেশী কার্যকরী ও অধিকতর নিরাপদ নতুন কিছু এলে তা ব্যবহার করা অবশ্যই দরকার। অন্যথায় নতুনত্বই ব্যবহারের প্রধান কারণ হতে পারে না।

সংবাদপত্র-এর মত নানা গণমাধ্যমও কিছু কিছু সময় এ ধরনের নতুন ওষুধ সম্পর্কে সাংবাদিক-সুলভ সত্য নির্ধারণের চেষ্টা না করেই, নানা উপাদেয় তথ্য প্রকাশ করে ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। থ্যালিডোমাইডের ক্ষেত্রেও প্রথমে

তাই-ই হয়েছিল। বিস্ময় ওষুধ (wonder drug), ছেলে সামলানোর ওষুধ (West Germany's baby sitter) ইত্যাদি নানা অভিধায় মহীয়ান হয়েছে এটি। সাধারণ মানুষও স্রোতের মত বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছে। এ ধারণাও এমন কিছু পরিবর্তিত হয় নি। গণমাধ্যমগুলি অনেকেই যেমন, সঠিক অনুসন্ধান করে সত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন, কেউ কেউ অতিরঞ্জিত, মিথ্যা খবরও দেন। কিছুদিন আগে হোমিওপ্যাথি আর এ্যালোপ্যাথি ওষুধের সংমিশ্রণে ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের ঘটনা প্রচার কিংবা সর্বরোগহর আকুপ্রেসার চপ্পলের সপক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি ধরনের ঘটনা এই কলকাতাতেই ঘটেছে। মানুষকে গল্প খাওয়ানো আর চমক দিয়ে বিক্রি বাড়ানোর এই অসাংবাদিক মানসিকতাও সর্বনাশ করে ("the press which so ably satisfies and stimulates the public appetite for wonder-drugs."—ঐ)।

ব্রাণ্ড নামের ব্যাপক ব্যবহার, জেনেরিক নামের প্রায় অব্যবহার, একই ওষুধের নানা ব্রাণ্ড নাম ব্যবহার করে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা করা, নানা ওষুধে মিশাল দিয়ে 'নতুন' ওষুধ বানানো, ডাক্তারের বিনা প্রেসক্রিপশানে প্রায় সব ওষুধ কিনতে পারা ইত্যাদি সব কিছুই এখনো অব্যাহত। থ্যালিডোমাইডের ক্ষেত্রে এগুলি কিভাবে বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে তা আগে বলা হয়েছে। এখনো কেউ যদি ক্লিওকুইনলযুক্ত আমাশার ওষুধ নাও খেতে চান, তবু হাজারো নামে বিভ্রান্ত হয়ে ঐ জিনিষই খেয়ে যাবেন। ওষুধের দোকানে গিয়ে আমাশার ওষুধ চাইলে দোকানদার যদি তাকে এমিক্লিন, ক্লোরামবিন, বা সারিল বা ট্রাইমিবা-কো ট্যাবলেট দেন তবে খদ্দেরের বোঝার কোন উপায় নেই। একই ভাবে ভারত সরকারেরই নিষিদ্ধ করা—ব্যথা বা প্রদাহ কমানোর ওষুধের সাথে ভিটামিন ও ঘুমের ওষুধের মিশ্রণ (fixed dose combination of vitamins with anti-inflammatory agents and tranquillisers)-ও নিষিদ্ধ জেনেই অনেকে খেয়ে যাবেন; দোকান থেকে তাঁকে ইকোয়াজেসিক, ওয়ালাজেসিক বা সাইক্লোপাম ট্যাবলেট দিলে বোঝা মুস্কিল।

তাই থ্যালিডোমাইডের মত ঘটনা ঘটার সমস্ত পরিস্থিতিই এখনো টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে চললে যে কোন সময় যে কোন দেশে ওষুধ তথা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আশীর্বাদের পরিবর্তে তার অভিশাপের খড়গ নিয়ে নেমে আসবে। সাধারণ আমাশার ওষুধ থেকে কিছুদিন আগে জাপানে ব্যাপকভাবে ঘটা SMON-এর ঘটনা তার আরেকটি প্রমাণ। বিজ্ঞান আর আধুনিকতার মোড়কে ঢাকা সোনার সিঁদকাঠি দিয়ে পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদকে তার শাসন-শোষণ চালিয়ে যেতে দিলে এমন মহামারী আরো ঘটবে। আর বিচ্ছিন্ন বহুজনের বিপদ তো হামেশাই ঘটে চলেছে।

সব মিলিয়ে থ্যালিডোমাইড আর ফোকোমেলিয়ার ঘটনা থেকে প্রকৃত শিক্ষা

এখনো নেওয়া হয়নি। থ্যালিডোমাইড এখন নিষিদ্ধ ওষুধ, সাধারণভাবে পাওয়াও যায় না।* কিন্তু ওষুধের নামে ব্যবহৃত হচ্ছে, ক্ষতিকর আরো নানা পদার্থ, একই ভাবে চলছে ওষুধের ব্যবসা।
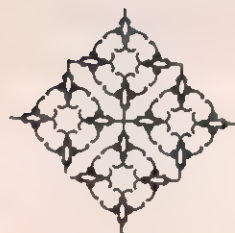
* তবে কুষ্ঠের দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার শেষের দিকে ইরিথিমা নডোসাম লেপ্রোসাম (ENL) নামে যদি প্রতিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে একে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া অস্থি সংস্থাপনের পর গ্রাফ্‌ট ভার্সাস হোস্ট ডিজিজ (GVHD) নামে বিরল, কিন্তু প্রাণঘাতী অবস্থার মোকাবিলায় এর ইতিবাচক ভূমিকার ইঙ্গিতও সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওষুধ থেকে অসুখ—ওষুধের নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ওষুধ নানা রোগের চিকিৎসায় যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি অবশ্যম্ভাবী রূপে রয়েছে তাদের নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। তা সত্ত্বেও রোগীর জীবন বাঁচানো বা রোগ নিরাময়ের স্বার্থে এসব ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। ওষুধ ব্যবহার করলে রোগীর উপকার না অপকার—কোন্ দিকে পাল্লা ভারী হবে তার বিচার অবশ্যই করা দরকার। তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সতর্কতা, অপ্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে ওষুধ ব্যবহার না করা এবং বিপজ্জনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত ওষুধ নিষিদ্ধ করা বা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।এখানে শারীরিক নানা কষ্ট বা বিপদ যে সব ওষুধ থেকে হতে পারে তার একটি প্রাথমিক তালিকা দেওয়া হল।

(১) ছেলেদের স্তন স্ফীতি (gynecomastia) :-

ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন, স্পাইরোনোল্যাকটোন, ডিজিট্যালিস, রিসার্পিন, মিথাইলডোপা, আইসোনায়াজিড, ইথিওনামাইড, গ্রিসিওফুলভিন।

(২) স্তন থেকে অস্বাভাবিক পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসরণ (galactorrhoea) ও মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া (amenorrhoea) :-

মিথাইল ডোপা, ফেনোথায়াজিন, রিসার্পিন, ডেক্সএ্যামফিটামিন, কিছু হতাশাবিরোধী ওষুধ (tricyclic antidepressants)।

(৩) যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ :-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, ঘুমের ওষুধ, উত্তেজনা প্রশমণকারী ওষুধ (tranquillisers), লিথিয়াম, মিথাইল ডোপা, ক্লোনিডিন।

(৪) বীর্যক্ষরণের গণ্ডগোল (impaired ejaculation) :-

গুয়ানেথিডিন, ডেব্রিসোকুইন, বিথানিডিন, থায়োরিডাজিন।

(৫) জ্বর ; গা গরম :-

প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড, পেনিসিলিন, নোভোবায়োসিন, এ্যামফোটেরিসিন-বি, এ্যান্টিহিস্টামিন (এলার্জিবিরোধী ওষুধ), কেফালো-স্পোরিন বার্বিচুরেট, ফেনিটয়েন, কুইনিডিন, সালফোনামাইড, আয়োডাইড, থায়োইউরাসিল, ফেনল্ফ্থ্যালিন, মিথাইল ডোপা, প্রোকেনামাইড।

(৬) এনাফাইলেক্সিস (ওষুধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ রক্তচাপ কমে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, এমনকি মৃত্যু) :-

পেনিসিলিন, কেফালোস্পোরিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ব্রোমসালফোথ্যালিন, ডেক্সট্রান, আয়রন ডেক্সট্রান, প্রোকেন, ইনসুলিন, ডেমেক্লোসাইক্লিন, আয়োডিন যুক্ত ওষুধ (এক্সরের জন্য ওষুধ,) লিডোকেইন।

(৭) লুপাস ইরিথিম্যাটোসাস (চামড়ায় প্রদাহ, মুখে প্রজাপতি আকারের দাগ, মাথায় টাক পড়া ইত্যাদি) :-

হাইড্রালাজিন, প্রোকেনামাইড, আইসোনায়াজিড।

(৮) সেরাম ডিজিজ (ওষুধ প্রয়োগের ৮-১২ দিন পরে, জ্বর, আমবাতের মত চুলকুনি, গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হাত-পা ফোলা, গাঁটে ব্যথা, কখনো বা প্রস্রাবে এলবুমিন বেরোন ইত্যাদি) :-

এস্‌পিরিন, পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, সালফোনামাইড, প্রপাইল থায়োইউরিয়াসিল।

(৯) থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডগোল :-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, ব্রোমসালফোথ্যালিন, ফেনিনডায়োন, আয়োডাইড, টলবুটামাইড, ক্লোরপ্রপামাইড, লিথিয়াম, এসিটাজোলামাইড, গোল্ড সল্ট, ডাইমার্কাপ্রল, ক্লোফাইব্রেট, ফেনোথায়াজিন, ফিনাইলবিউটাজোন, সালফোনামাইড, ফেনিটয়েন।

(১০) এডিসনস ডিজিজ-এর অনুরূপ রোগ (Addisonian like syndrome) :-

বুসালফান।

(১১) রক্তে সোডিয়াম কমে যাওয়া :-

ভিনক্রিশটিন, সাইক্লোফসফামাইড, ক্লোরপ্রপামাইড, ডায়ুরেটিক (প্রস্রাব বাড়ানোর ওষুধ), স্টেরয়েড (বিশেষতঃ ওষুধটি বন্ধ করার সময়ে), ম্যানিটল, এনেমা (enema) দেওয়া।

(১২)রক্তে পটাসিয়াম বেড়ে যাওয়া :-

স্পাইরোনোল্যাকটোন, ট্রায়ামটেরিন, এমিলোরাইড, ক্যান্সারের ওষুধ, স্টেরয়েড (বিশেষতঃ ওষুধটি বন্ধ করার সময়ে), সাক্সিনিল কোলিন, ডিজিট্যালিস (বেশি মাত্রায়), পটাসিয়াম যুক্ত লবণ বা ওষুধ, লিথিয়াম।

(১৩) রক্তে পটাসিয়াম কমে যাওয়া :-

ডায়ুরেটিক, পায়খানা করানোর ওষুধ (বেশি পরিমাণে), স্টেরয়েড, এমফোটোরিসিন-বি, ইনসুলিন, কার্বোনোক্সোলোন, এলকালিযুক্ত ওষুধ থেকে এলকালোসিস হয়ে গেলে, জেণ্টামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন (বিশেষতঃ ওষুধটি পুরনো হয়ে খারাপ হয়ে গেলে), ভিটামিন বি-১২।

(১৪) এসিডোসিস (metabolic acidosis) :-

প্যারালডিহাইড (বিশেষতঃ ওষুধটি পুরনো হয়ে খারাপ হয়ে থাকলে), ফেনফর্মিন, এসিটাজোলামাইড, স্পাইরোনোল্যাকটোন, স্যালিসিলেট (যেমন এসপিরিন)।

(১৫) রক্তে ক্যালসিয়াম বেড়ে যাওয়া :-

অম্লরোধী ওষুধ (antacids with absorbable alkali যেমন সোডিবাইকার্ব যুক্ত), ভিটামিন-ডি, থায়াজাইড।

(১৬) রক্তে ইউরিক এ্যাসিড বেড়ে যাওয়া :-

থায়াজাইড, ক্লোরথ্যালিডোন, ইথাক্রাইনিক এ্যাসিড, ফুরোসেমাইড, এসপিরিন, ক্যান্সারের ওষুধ (cytotoxics), ফ্রুকটোজ।

(১৭) ব্লাড সুগার বেড়ে যাওয়া :-

স্টেরয়েড, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, ক্লোরথ্যালিডোন, ইথাক্রাইনিক এ্যাসিড, থায়াজাইড, ফুরোসেমাইড, ডায়াজক্সাইড, গ্রোথ হরমোন।

(১৮) রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে যাওয়া :-

রিফামপিন, নোভোবায়োসিন।

(১৯) পরফাইরিয়া বেড়ে যাওয়া (রক্তে হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিক বিপাকীয় ক্রিয়ায় জাত পরফাইরিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া) :-

বার্বিচুরেট, ক্লোরডায়াজেপক্সাইড, মেপ্রোব্যামেট, সালফোনামাইড, ইস্ট্রোজেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, ক্লোরপ্রপামাইড, ফেনিটয়েন, গ্লুটেথিমাইড, গ্রিসিওফুলভিন, রিফামপিন।

(২০) চামড়ার প্রদাহ, আঁশের মত ওঠা (exfoliative dermatitis) :-

পেনিসিলিন, সালফোনামাইড, বার্বিচুরেট, ফেনিটয়েন, ফিনাইলবুটাজোন, গোল্ডসল্ট, কুইনিডিন।

(২১) চামড়ার বহিঃত্বকের কোষসমূহের মৃত্যু, ফোস্কা (toxic epidermal necrolysis—bullous) :-

বার্বিচুরেট, ফিনাইলবিউটাজোন, ফেনিটয়েন, সালফোনামাইড, ফেনলফ্থ্যালিন, পেনিসিলিন, এলোপিউরিনল, আয়োডাইড, ব্রোমাইড, ন্যালিডিক্সিক এ্যাসিড।

(২২) চামড়ায় লাল চাকা চাকা দাগ :-

সালফোনামাইড, বার্বিচুরেট, ফিনাইলবুটাজোন, ক্লোরপ্রপামাইড, থায়াজাইড, সালফোন, ফেনিটয়েন, ইথোসাক্সিমাইড, স্যালিসিলেট, টেট্রাসাইক্লিন, কোডিন, পেনিসিলিন।

(২৩) পায়ের সামনের দিকে যন্ত্রণাদায়ক গুটি, চামড়ার প্রদাহ (erythema nodosum) :-

পেনিসিলিন, সালফোনামাইড, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি।

(২৪) চামড়ায় ইরাপশান :-

ফেনল্ফ্থ্যালিন, বার্বিচুরেট, সালফোনামাইড, স্যালিসিলেট, ফিনাইল বিউটাজোন, কুইনিন, ক্যাপটোপ্রিল।

(২৫) চামড়ায় রোদ লাগলে প্রদাহের সৃষ্টি :-

টেট্রাসাইক্লিন (বিশেষতঃ ডিমেক্লোসাইক্লিন), গ্রিসিওফুলভিন, সালফোনামাইড, সালফোনিল ইউরিয়া, থায়াজাইড, ফুরোসেমাইড, ফেনোথায়াজিন, ন্যালিডিক্সিক এ্যাসিড, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, ক্লোরডায়াজেপক্সাইড।

(২৬) আমবাত :-

এ্যাসপিরিন, পেনিসিলিন, সালফোনামাইড, বার্বিচুরেট।

(২৭) চামড়ায় অনির্দিষ্ট র‍্যাশ :-

এ্যামপিসিলিন, বার্বিচুরেট, এলোপিউরিনল, ফেনিটয়েন, মিথাইল ডোপা।

(২৮) চামড়ার রঙ কালো হয়ে যাওয়া :-

এড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন, বুসালফান, ফেনোথায়াজিন, অতিরিক্ত ভিটামিন-এ, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, গোল্ড সল্ট, ক্লোরোকুইন ও ম্যালেরিয়ার অন্যান্য ওষুধ, সাইক্লোফসফামাইড, ব্লিওমাইসিন।

(২৯) চুল পড়ে যাওয়া :-

ক্যান্সারের ওষুধ, ইথিওনামাইড, হেপারিন, মুখে খাওয়ার জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি (বন্ধ করার সময়)।

(৩০) চামড়ায় লাল লাল ছোট ছোট ফোঁটা (purpura) :-

স্টেরয়েড, এ্যাস্পিরিন।

(৩১) একজিমা :-

জীবাণুবিরোধী মলম, স্থানীয় অবেদক মলম, এ্যান্টিহিস্টামিনিক মলম, ল্যানোলিন, মলম ও লোশনের ভিত্তি উপাদান।

(৩২) ব্রণ :-

এনাবোলিক ও এণ্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড, কর্টিকোস্টেরয়েড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, আইসোনায়াজিড, ট্রক্সিডোন।

(৩৩) রক্তের সমস্ত কোষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া (এপ্লাস্টিক এনিমিয়া) (pancytopenia) :-

ক্লোরামফেনিকল, ফেনিটয়েন, মেফেনিটয়েন, ট্রাইমেথাডায়োন, ফিনাইলবুটাজোন, অক্সিফেনবুটাজোন, গোল্ড সল্ট, মেপাক্রিন, কুইনাক্রিন, পটাসিয়াম পারক্লোরেট, ক্যান্সারের ওষুধ।

(৩৪) এগ্র্যানুলোসাইটোসিস (শ্বেতকণিকার নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল-এর সংখ্যা হ্রাস) :-

ক্লোরামফেনিকল, সালফোনামাইড, ফিনাইলবুটাজোন, অক্সিফেনবুটাজোন, গোল্ড সল্ট, ইণ্ডোমেথাসিন, প্রপাইল থায়োইউরিয়াসিল, মেথিমাজোল, কার্বিমাজোল, ফেনোথায়াজিন, ক্যান্সারের ওষুধ, টলবুটামাইড, কোট্রাইমক্সাজোল, ক্যাপটোপ্রিল, হতাশারোধী ওষুধ (tricyclic—যেমন, ইমিপ্রামিন, ডেসিপ্রামিন ট্রাইমিপ্রামিন, এমিট্রিপ্টিলিন ইত্যাদি)।

(৩৫) অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস (thrombocytopenia) :-

কুইনিডিন, কুইনিন, ফুরোসেমাইড, ক্লোরথ্যালিডোন, থায়াজাইড,. গোল্ড সল্ট, কোট্রাইমক্সাজোল, এ্যাস্পিরিন, ইণ্ডোমেথাসিন, ফিনাইল বিউটাজোন, অক্সিফেনবিউটাজোন, ক্লোরপ্রপামাইড, এসিটাজোলামিন, ফেনিটয়েন ও ঐ জাতীয় ওষুধ, মিথাইলডোপা, কার্বামাজেপিন, ডিজিটক্সিন, নভোবায়োসিন, কার্বেনাসিলিন।

(৩৬) বিশেষ ধরনের রক্তহীনতা, যেখানে অপরিণত লোহিতকণিকা বা মেগালোব্লাস্টের সংখ্যাধিক্য ঘটে (megaloblastic anemia) :-

কোট্রাইমক্সাজোল, ফেনিটয়েন, প্রিমিডোন, ফেনোবার্বিটাল, ট্রায়ামটেরিন, ট্রাইমেথোপ্রিম, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, লিউকিমিয়ার কিছু ওষুধ যা ফোলিক এ্যাসিডবিরোধী (যেমন, অ্যামাইনোপ্টেরিন, অ্যামিথোপ্টেরিন ইত্যাদি)।

(৩৭) বিশেষ ধরনের রক্তহীনতা, যেখানে লোহিতকণিকা ভেঙ্গে যায় (hemolytic anemia) :-

মিথাইল ডোপা, লিভোডোপা, মেফেনামিক এ্যাসিড, মেলফালান, আইসোনায়াজিড, রিফামপিন, সালফোনামাইড, পেনিসিলিন, কেফালোস্পোরিন, ইনসুলিন, কুইনিডিন, ক্লোরপ্রমাজিন, ফেনাসেটিন, প্যারাএ্যামাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড, ড্যাপসোন।

(৩৮) হিমোলাইটিক এনিমিয়া, যখন ব্যক্তির শরীরে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎকেচকের অভাব থাকেঃ—

ম্যালেরিয়ার ওষুধ (যেমন প্রাইমাকুইন), ক্লোরামফেনিকল, ড্যাপসোন, ন্যালিডিক্সিক এ্যাসিড, নাইট্রোফুরাণ্টয়েন, সালফোনামাইড, এস্পিরিন, ফেনাসেটিন, প্যারা এ্যামাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড, কুইনিডিন, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-কে, কোট্রাইমক্সাজোল, প্রোবেনেসিড, প্রকেনামাইড।

(৩৯) সারা শরীরে লিম্ফ নোডের স্ফীতি :-

ফেনিটয়েন, প্রিমিডোন।

(৪০) রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি :-

লিথিয়াম, কর্টিকোস্টেরয়েড।

(৪১) ইওসিনোফিলের সংখ্যা বৃদ্ধি:-

ইরিথ্রোমাইসিন (এস্টোলেট), সালফোনামাইড, ক্লোরপ্রোপামাইড, প্যারাএ্যামাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড, ইমিপ্রামিন, নাইট্রোফুরাণ্টয়েন, প্রোকার্বাজিন, মিথোট্রেক্সেট।

(৪২) হৃৎপিণ্ডের ব্যথা(angina) বেড়ে যাওয়া:-

ভেসোপ্রেসিন, অক্সিটোসিন, আর্গোটামিন, মেথিসার্জিক, প্রোপ্রানলল বন্ধ করার সময়, থাইরক্সিন (বেশি পরিমাণে), হাইড্রালাজিন, আলফা-ব্লকার ওষুধ (টোলাজোলিন, ফেণ্টোলামিন, ফেনক্সিবেঞ্জামিন, থাইমক্সামিন ইত্যাদি)।

(৪৩) হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর রোগ সৃষ্টি হওয়া (cardiomyopathy) :-

ইমেটিন, সিমপেথোমাইমেটিক (যেমন এড্রেনালিন, আইসো প্রেনালিন, ডোপামিন, ফিনাইল এফ্রিন, এমফিটামিন, মেফেনটারমাইন, মেটারামিনল, ইফেড্রিন ইত্যাদি), ফেনোথায়াজিন, লিথিয়াম, সালফোনামাইড, ডনোরুবিসিন, এড্রিয়াসাইমিন।

(৪৪) হৃদপিণ্ড আবরণীর প্রদাহ (pericarditis) :-

প্রোকেনামাইড, হাইড্রালাজিন, মেথিসার্জাইড, ইমেটিন।

(৪৫) হার্টফেল (congestive cardiac failure বা fluid retention) :-

ইস্ট্রোজেন, স্টেরয়েড, কার্বেনেক্সোলোন, ফিনাইলবুটাজোন, ইণ্ডোমেথাসিন, প্রপ্রানলল, ম্যানিটল, ডায়াজোক্সাইড, মিনোক্সিডিল।

(৪৬) হার্টরেট-এর গণ্ডগোল (arrhythmias) :-

সিমপেথোমাইমেটিক, থাইরয়েড হরমোন, ডিজিট্যালিস, কুইনিডিন, প্রকেনামাইড, ভেরাপামিল, এট্রোপিন, প্রপ্রানলল, গুয়ানেথিডিন, ইমেটিন, এরোসল (যেমন শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য নিঃশ্বাসে নেওয়ার ওষুধ), হতাশারোধী ওষুধ (tricycle antidepressants), ফেনোথায়াজিন (থায়োরিডাজিন), লিথিয়াম, পাপাভেরিন, ডনোমাইসিন, এড্রিয়ামাইসিন, লিনকোমাইসিন (শিরা দিয়ে দিলে), এন্টিকলিনএস্টারেজ (যেমন নিওস্টিগমিন)।

(৪৭) রক্তচাপ কমে যাওয়া :-

নাইট্রোগ্লিসারিন, ফেনোথায়াজিন, মরফিন, প্রস্রাব বাড়ানোর ওষুধ (ডাইয়ুরেটিক), লিভোডোপা, সাইট্রেটযুক্ত রক্ত।

(৪৮) রক্ত চাপ বেড়ে যাওয়া :-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, সিমপেথোমাইমেটিক, ক্লনিডিন (বন্ধ করার সময়), সিমপ্যাথোমাইমেটিকের সঙ্গে মনোএ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর, সিমপ্যাথোমাইমেটিকের সঙ্গে ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেস্যান্ট, কর্টিকোস্টেরয়েড, এ সি টি এইচ, ফিনাইলবুটাজোন।

(৪৯) রক্তবহানালিকায় রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া (thromboembolism) :-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি।

(৫০) নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া :-

রিসার্পিন, গুয়ানেথিডিন, আইসোপ্রোটেরেনল, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, নাক বন্ধ দূর করার ওষুধের অপব্যবহার তথা অতিব্যবহার।

(৫১) শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যাওয়া :-

পলিমিক্সিন, এমাইনোগ্লাইকোসাইড, ট্রাইমেথাফেন, ওপিয়েট (মরফিন ইত্যাদি), ঘুমের ওষুধ, আবেশকারী ওষুধ (hypnotics)।

(৫২) শ্বাসকষ্ট :-

স্টেরয়েড নয় এমন প্রদাহরোধি ওষুধ (যেমন এস্পিরিন, ইণ্ডোমেথাসিন ইত্যাদি), বিটাব্লকার (যেমন, প্রপ্রানলল, এলপ্রেনলল, অক্সিপ্রেনলল ইত্যাদি), কলিনার্জিক ওষুধ (যেমন কার্বাকল, মেথাকলিন, পাইলোকার্পিন, ফাইসোস্টি

গমিন, নিওস্টিগমিন ইত্যাদি), হলুদ রঙের ওষুধের হলুদ রঞ্জক পদার্থ অর্থাৎ টার্ট্রাজিন, পেনিসিলিন, কেফালোস্পোরিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, পেণ্টাজোসিন।

(৫৩) ফুসফুসের প্রসারণ ঘটা :-

বুসালফান, নাইট্রোফুরাণ্টয়েন, মেথিসার্জিড, ক্লোরামবুসিল, প্রোকার্বাজিন, মেলফালান, সাইক্লোফসফামাইড, এজোথায়োপ্রিন, ব্লিওমাইসিন, মিথোট্রেক্সেট, সালফোনামাইড।

(৫৪) ফুসফুসে জল জমা (pulmonary edema) :-

হিরোইন, মিথাডোন, হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড, প্রপক্সিফেন, এক্সরে করার ওষুধ (contrast media)।

(৫৫) দাঁতে কালো ছোপ পড়া :-

টেট্রাসাইক্লিন।

(৫৬) মাড়ি ফুলে যাওয়া :-

ফেনিটয়েন।

(৫৭) মুখে ঘা :-

এ্যাস্পিরিন, আইসোপ্রটেরেনল (জিভের নীচে রাখলে), ক্যান্সারের ওষুধ, প্যানক্রিয়াটিন, জেনশিয়ান ভায়োলেট।

(৫৮) জিভে স্বাদ গ্রহণের গণ্ডগোল :-

পেনিসিলামিন, বাইগুয়ানাইড, গ্রিসিওফুলভিন, মেট্রোনিডাজোল, লিথিয়াম, রিফামপিন, ক্যাপটোপ্রিল।

(৫৯) মুখ শুকিয়ে যাওয়া :-

এ্যাণ্টিকলিনার্জিক ওষুধ, লিভোডোপা, ট্রাইসাইক্লিক এ্যাণ্টিডিপ্রেস্যাণ্ট, ক্লনিডিন, মিথাইল ডোপা।

(৬০) লালাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া :-

ফিনাইলবুটাজোন, গুয়ানেথিডিন, বিথানিডিন, ব্রেটিলিয়াম, ক্লনিডিন, আয়োডাইড।

(৬১) পেপটিক আলসার ও আলসার থেকে রক্তপাত :-

এস্পিরিন, ফিনাইলবুটাজোন, ইণ্ডোমেথাসিন, ইথাক্রাইনিক এ্যাসিড, রিসার্পিন (বেশি পরিমাণে)।

(৬২) অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া :-

পটাসিয়াম ক্লোরাইডের ক্যাপসুল (enteric coated)।

(৬৩) বমি বা বমিভাব :-

ডিজিট্যালিস, ওপিয়েট, ইস্ট্রোজেন, লিভোডোপা, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ফেরাস সালফেট, এমাইনোফাইলিন, টেট্রাসাইক্লিন।

(৬৪) কলাইটিস ও ডায়ারিয়া :-

লিনকোমাইসিন, ক্লিণ্ডামাইসিন, ব্রডস্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক (যেমন, এম্পিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি), অম্বলবিরোধী ওষুধে ম্যাগনেসিয়াম, গুয়ানেথিডিন, ডেব্রিসোকুইন, মিথাইলডোপা, রিসার্পিন, ডিজিট্যালিস, কলচিসিন, পায়খানার ওষুধ (purgatives), ল্যাকটোজযুক্ত ওষুধে ল্যাকটোজের জন্য ব্যবহৃত ভিত্তি উপাদান (lactose excipients)।

(৬৫) কোষ্ঠবদ্ধতা (বা ileus) :-

ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসাণ্ট, গ্যাংলিয়ন ব্লকার (যেমন, মেকামাইলেমাইন, পেম্পিডিন, হেক্সামেথোনিয়াম ইত্যাদি), ফেনোথায়াজিন, ওপিয়েট, এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, বেরিয়াম সালফেট, আয়ন-এক্সচেঞ্জ রেসিন, ফেরাস সালফেট।

(৬৬) খাদ্য শোষণের গণ্ডগোল (malabsorption) :-

ব্রডস্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক, নিওমাইসিন, কলিস্টিরামিন, কলচিসিন, প্যারাঅ্যামাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড, বাইগুয়ানাইড, ফেনিটয়েন, প্রিমিডোন, ফেনোবার্বিটাল, ক্যান্সারের ওষুধ (cytotoxics)।

(৬৭) প্যানক্রিয়াসের প্রদাহ :-

কর্টিকোস্টেরয়েড; থায়াজাইড, এজাথায়োপ্রিন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, সালফোনামাইড, ওপিয়েট, ফুরোসামাইড, ইথাক্রাইনিক এ্যাসিড।

(৬৮) যকৃৎ কোষের ক্ষয় বা মৃত্যু :-

হ্যালোথেন, মেথক্সিফ্লুরেন, মিথাইলডোপা, আইসোনায়াজিড, রিফামপিন, এমাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড, ইথিওনামাইড, ফেনিটয়েন ও অন্যান্য হাইড্যাণ্টয়েন, প্যারাসিটামল (এসিটামিনোফেন), স্যালিসিলেট (যেমন এস্পিরিন), এলোপিউরিনল, সালফোনামাইড, টেট্রাসাইক্লিন, ইরিথ্রোমাইসিন এস্টোলেট, প্রপাইল থাওইউরিয়াসিল, মেথিমাজোল, অক্সিফেনিস্যাটিন, মেথোট্রেক্সেট; পাইরিডিয়াম, প্রপক্সিফেন, মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর, সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েট।

(৬৯) পিত্তনালিকার পথ বন্ধ হয়ে জণ্ডিস :-

ফেনোথায়াজিন, এস্ট্রোজেন, এনাবলিক স্টেরয়েড, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, ইরিথ্রোমাইসিন এস্টোলেট, ক্লোরপ্রপামাইড, গোল্ড সল্ট, মেথিমাজোল, এসিটোহেক্সামাইড।

(৭০) নেফ্রোটিক সিণ্ড্রোম (কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রস্রাব কমে যাওয়া, শরীর ফুলে যাওয়া, প্রস্রাবে এলবুমিন ইত্যাদি) :-

পেনিসিলামাইন, গোল্ড সল্ট, ফেনিনডায়োন, প্রবেনেসিড, ক্যাপটোপ্রিল।

(৭১) কিডনির টিউবুল অংশের ক্ষতি (tubular necrosis) :-

এমফোটেরিসিন-বি, এমাইনোগ্লাইকোসাইড (অর্থাৎ স্ট্রেপটোমাইসিন, নিওমাইসিন, কানামাইসিন, এমিকাসিন, জেণ্টামাইসিন, টোব্রামাইসিন, ফ্রেমিসেটিন ইত্যাদি), পলিমিক্সিন, কেফালোরিডিন, টেট্রাসাইক্লিন, কলিস্টিন, সালফোনামাইড, এক্সরে করার জন্য রেডিও-আয়োডিন যুক্ত ওষুধ (radio-iodinated contrast media), মেথক্সিফ্লুরেন।

(৭২) কিডনির বিশেষ ধরনের প্রদাহ (interstitial nephritis) :-

পেনিসিলিন (বিশেষত মেথিসিলিন), সালফোনামাইড, ফেনিনডায়োন, ফুরোসেমাইড, থায়াজাইড।

(৭৩) সমগ্র কিডনির নানা ধরনের অস্বাভাবিকত্ব (nephropathies) :-

ব্যথা কমানোর ওষুধ (যেমন, ফেনাসেটিন)।

(৭৪) ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া (concentrating defect with polyuria বা nephrogenic diabetes insipidus) :-

ভিটামিন-ডি, লিথিয়াম, ডেমেক্লোসাইক্লিন, মেথক্সিফ্লুরেন।

(৭৫) রেনাল টুবুলার এসিডোসিস (যার থেকে মূত্রপাথুরী, রিকেট ও খর্বাকার চেহারা ইত্যাদি ঘটে) :-

টেট্রাসাইক্লিন (খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে), এমফোটেরিসিন-বি, এসিটাজোলামাইড।

(৭৬) মূত্র পাথুরী :-

ভিটামিন-ডি, এসিটাজোলামাইড।

(৭৭) মূত্রপথ বন্ধ হয়ে গিয়ে কিডনির রোগ :-

ক্যান্সারের ওষুধ (cytotoxics) (কিডনির ভেতরে গণ্ডগোল ঘটায়), মেথিসার্জাইড (কিডনির বাইরে গণ্ডগোল ঘটায়)।

(৭৮) মূত্রথলির প্রদাহ, প্রস্রাবে রক্ত :-

সাইক্লোফসফামাইড।

(৭৯) মূত্রথলির কাজের গণ্ডগোল :-

এন্টিকলিনার্জিক ওষুধ, মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর, ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসান্ট, ডাইসোপাইরামাইড।

(৮০) মেয়েদের যোনিতে ক্যান্সার :-

ডাইইথাইল স্টিলবেস্টেরল।

(৮১) জনন কোষ সৃষ্টিতে অস্বাভাবিকত্ব :-

ক্যান্সারের ওষুধ (cytotoxics)।

(৮২) হাতে-পায়ের নার্ভের রোগ (peripheral neuropathy) (নার্ভে ব্যথা, হাত-পা ঝিনঝিন করা, প্যারালিসিস বা অবশভাব ইত্যাদি) :-

আইসোনায়াজিড, হাইড্রালাজিন, নাইট্রোফুরাণ্টয়েন, ভিনক্রিষ্টিন, মুস্টিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, পলিমিক্সিন, কলিস্টান, ক্লিওকুইনল, ফেনেলজিন, ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসাণ্ট, ক্লোরামফেনিকল, প্রোকার্বাজিন, ইথামবিউটল, ইথিওনামাইড, গ্লুটেথিমাইড ডেমেক্লোসাইক্লিন, ন্যালিডিক্সিক এসিড, টলবুটামাইড, ক্লোরপ্রোমামাইড, মেথিসার্জাইড, ফেনিটয়েন।

(৮৩) মায়েস্থেনিয়া বেড়ে যাওয়া (মাংস পেশীর দুর্বলতা) :-

এমাইনো গ্লাইকোসাইড (স্ট্রেপটোমাইসিন, জেণ্টামাইসিন ইত্যাদি),

পলিমিক্সিন।

(৮৪) হাত-পা কাঁপা, কথা জড়িয়ে যাওয়া, চলাফেরার অসুবিধা ইত্যাদি (extrapyramidal effects) :-

ফেনোথায়াজিন, ট্রাইসাইক্লিক এ্যান্টিডিপ্রেসান্ট, মিথাইলডোপা, বিউটিরোফেনোন (যেমন হ্যালোপেরিডল), লিভোডোপা, রিসার্পিন, মেটোক্লোপ্রামাইড, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি।

(৮৫) খিঁচুনি :-

এ্যামফিটামিন, এনালেপ্টিক (যেমন নিকেথামাইড, ডোক্সাপ্রাম ইত্যাদি), ফেনোথায়াজিন, আইসোনায়াজিড, লিডোকেইন, থিওফাইলিন, পেনিসিলিন, ন্যালিডিক্সিক এসিড, ফাইসোস্টিগমিন, ট্রাইসাইক্লিক এ্যান্টিডিপ্রেসাণ্ট, ভিনক্রিস্টিন, লিথিয়াম।

(৮৬) স্ট্রোক :-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি।

(৮৭) মস্তিস্কের অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি (এর থেকে খিঁচুনি, প্যারালিসিস বা হাতে পায়ে অবশ ভাব, মাথার যন্ত্রণা, চোখে কম দেখা, বমি ইত্যাদি) :-

কর্টিকোস্টেরয়েড, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, টেট্রাসাইক্লিন, অতিরিক্ত ভিটামিন-এ।

(৮৮) মাথার যন্ত্রণা :-

হাইড্রালাজিন, ব্রোমাইড, গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট, আর্গোটামিন (বন্ধ করার সময়),ইণ্ডোমেথাসিন।

(৮৯) চোখে কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (চোখে ঝাপসা দেখা) :-

ভিটামিন-ডি, মেপাক্রিন, ক্লোরোকুইন, ইণ্ডোমেথাসিন।

(৯০) কর্ণিয়ার শোথ (corneal edema) :-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি।

(৯১) ছানি :-

ফেনোথায়াজিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, বুসালফান, ক্লোরামবুসিল।

(৯২) গ্লকোমা (চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি) :-

চোখের তারা প্রসারণকারী ওষুধ, সিমপ্যাথোমাইমেটিক।

(৯৩) রেটিনার রোগ (retinopathy) :-

ক্লোরোকুইন, ফেনোথায়াজিন।

(৯৪) চোখের নার্ভের প্রদাহ (এর থেকে অন্ধত্ব বা চোখে কম দেখা ইত্যাদি) :-

ক্লিওকুইনল, ক্লোরামফেনিকল, স্ট্রেপটোমাইসিন, আইসোনায়াজিড, ইথামবিউটল, কুইনিন, ফেনোথায়াজিন, পেনিসিলামিন, প্যারাএ্যামাইনো স্যালিসিলিক এসিড, ফিনাইলবুটাজোন।

(৯৫) রঙ চেনার অসুবিধা :-

ট্রক্সিডোন, সালফোনামাইড, স্ট্রেপটোমাইসিন, মেথাকোয়ালোন, বার্বিচুরেট, ডিজিট্যালিস, থায়াজাইড।

(৯৬) বধিরতা বা কানে কম শুনতে পাওয়া :-

এ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড (যেমন স্ট্রেপটোমাইসিন, জেণ্টামাইসিন ইত্যাদি),

ইথাক্রাইনিক এসিড, কুইনিন, ফুরোসেমাইড, ব্লিওমাইসিন, ক্লোরোকুইন, মুস্টিন এস্পিরিন, নরট্রিপটিলিন।

(৯৭) কানে ভেস্টিবুল অংশের রোগ (কান ভোঁ ভোঁ করা, শরীরের ব্যালেন্স রাখার অসুবিধা ইত্যাদি) :-

এমাইনোগ্লাইকোসাইড, কুইনিন, মুস্টিন।

(৯৮) মাংসপেশীর ব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি :-

কর্টিকোস্টেরয়েড, ক্লোরোকুইন, ক্লোফাইব্রেট, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি, এমফোটেরিসিন-বি, কার্বেনেক্সোলোন।

(৯৯) হাড়ের ক্ষয় (osteoporosis) :-

হেপারিন, কর্টিকোস্টেরয়েড।

(১০০) হাড়ের বৃদ্ধির গণ্ডগোল :-
মৃগীর ওষুধ, গ্লুটেথিমাইড, এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড।

(১০১) সিজোফ্রেনিয়ার মত মানসিক রোগ :-

এমফিটামাইন, লাইসার্জিক এসিড, লিভোডোপা, ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসান্ট, মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর, ব্রোমাইড, কর্টিকোস্টেরয়েড।

(১০২) হতাশাবোধ :-

রিসার্পিন, মিথাইলডোপা, ক্লোনিডিন, প্রপ্রানলল, কর্টিকোস্টেরয়েড, এমফিটামাইন (বন্ধ করার সময়), লিভোডোপা।

(১০৩) উত্তেজনা, নিস্তেজনা, ম্যানিয়া ইত্যাদি :-

লিভোডোপা, সিমপ্যাথোমাইমেটিক, কর্টিকোস্টেরয়েড, মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটার, ট্রাইসাইক্লিক এ্যান্টিডিপ্রেসান্ট।

(১০৪) ভ্রান্ত অনুভূতি (hallucination) :-

এ্যামান্টাডিন, ঘুমের বা অজ্ঞানকরার ওষুধ, পেন্টাজোসিন, প্রপ্রানলল, লিভোডোপা, ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসান্ট, মেপেরিডিন।

(১০৫) ভুল বকা, মানসিক বিভ্রান্তি :-

ডিজিট্যালিস, এ্যান্টিকলিনার্জিক, ব্রোমাইড, ঘুমের ওষুধ, আবেশকারী ওষুধ (hypnotics), ফেনোথায়াজিন, হতাশারোধী ওষুধ, কর্টিকোস্টেরয়েড, আইসোনায়াজিড, লিভোডোপা, এমান্টাডিন, পেনিসিলিন, এমাইনোফাইলিন, মিথাইলডোপা।

(১০৬) ঘুমের গণ্ডগোল :-

লিভোডোপা, মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটার, সিমপ্যাথোমাইমেটিক।

(১০৭) ঘুমঘুম ভাব :-

উদ্বেগ দূরকারী ওষুধ (anxiolytic drugs—যেমন, ডায়াজিপাম, ক্লোর ডায়াজেপক্সাইড, মেপ্রোব্যামেট, বার্বিচুরেট, বেঞ্জোক্টারিন ইত্যাদি), ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেস্যান্টস (যেমন ইমিপ্রামিন, ডেসিপ্রামিন, এমিট্রিপটিলিন ইত্যাদি), ঘুমের ওষুধ, এন্টিহিস্টামিন (এলার্জিরোধী ওষুধ), মিথাইলডোপা, ক্লোনিডিন, রিসার্পিন।

• • •

স্পষ্টতঃ সাধারণভাবে ব্যবহার্য সব ওষুধই শরীরের নানা অংশেরই নানা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব ওষুধের অনেকগুলিই প্রাণদায়ী ও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সব ওষুধ বাদ দিয়ে ওষুধ-হীন আদিম মানবসভ্যতায় ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একান্তই প্রয়োজন প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে চূড়ান্ত সর্তকতা নেওয়া।
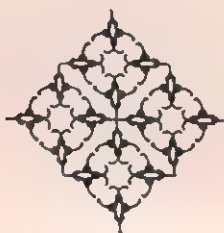
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারত সরকারের নিষিদ্ধ করা ওষধ

ওষুধের নামে প্রচলিত নানা ক্ষতিকর, অপ্রয়োজনীয় বা কার্যকারিতাহীন পদার্থের প্রচলন মাত্রাতিরিক্ত, দৃষ্টিকটু পর্যায়ে পৌছনর পর ভারত সরকারের টনক নড়ে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রথম আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে সুষ্ঠু জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষিত হওয়ার ফলে ২৮২টি ওষুধকে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ধরে বাকী অজস্র ওষুধ বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল ও মালয়েশিয়াতেও এধরনের বহু ওষুধ নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকও ২২ ধরনের বুনিয়াদী ওষুধ ও পরবর্তীকালে আরো তিনটি বুনিয়াদী ওষুধ বাতিল ঘোষণা করে। বলা হয়েছে এই সব ওষুধ "মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা যে দাবী করা হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসব দাবী মিথ্যে বা যে অনুপাতে যে সব উপাদান মিশিয়ে তৈরী করা হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের কোন যৌক্তিকতা নেই" ; তাই এদের "তৈরী ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা" হল। (Notification No X–11014/1/83 –DMS & PFA: X–11014/8/83 ও No X-11014/7/87)

এখানে এই তালিকা প্রকাশ করা হল এবং যে সব বাণিজ্যিক (ব্র্যাণ্ড) নামে এগুলি বাজারে পাওয়া যায় তা দেওয়া হল। এদের "তৈরী ও বিক্রি নিষিদ্ধ করার" অন্তত বছর তিনেক পরেও যেগুলি বাজারে পাওয়া যায় বা যাচ্ছিল তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর বাইরেও বাণিজ্যিক নামের নানা নিষিদ্ধ ওষুধ বাজারে হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু অসামর্থ্যের জন্যই এদের সবগুলিকে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। ভারতবর্ষের নানা রাজ্য মিলিয়ে ৬০০০০-এরও বেশী বাণিজ্যিক নামের ওষুধ পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃ এখানে যাদের নাম উল্লেখ করা হল তা প্রতীকী উদাহরণের অংশ মাত্র। তাছাড়া এ বই ছাপা হয়ে বেরোতে বেরোতেই এই সব ওষুধের কোম্পানিগুলি তাদের কিছু ওষুধ থেকে ক্ষতিকর উপাদানগুলি বাদ দিতে পারে। ফলে পরীক্ষা করে দেখলে উল্লেখিত ওষুধের কয়েকটিকেও নির্দোষ বলে দেখা যেতে পারে ; কারণ ব্যবসার স্বার্থে কোম্পানিগুলি প্রায়শঃই তাদের ওষুধের উপাদান পাল্টায় কিন্তু সঙ্গে সেগুলির বাজার চলতি ব্র্যাণ্ড নাম বাতিল করে না।

বাতিল করা ওষুধ—

১। এ্যামিডোপাইরিন—ব্যথা কমানর ওষুধ হিসেবে প্রচলিত ছিল। এর ক্ষতিকর প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। আমেরিকায় এটি প্রায় ৫৫ বছর আগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, ইটালি, নেপাল, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি বহু দেশেও এটি অনেক আগেই নিষিদ্ধ। অবশ্যি ভারতবর্ষের মত দেশের মানুষ বিষ খেয়েও ধুঁকে ধুঁকে হয়তো বেঁচে থাকে।

তাই দীর্ঘদিন অবাধে চলেছে এটি। এখন ঠিক এ্যামিডোপাইরিন যুক্ত ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় না। তবে এর সমগোত্রীয় এ্যানালজিন যুক্ত যেসব ওষুধ পাওয়া যায় তাদের কয়েকটির নাম আগে বলা হয়েছে। আগে এসজিপাইরিন, এ্যারিস্টোপাইরিন, অপটালিডন, বুটাপাইরিংগা, সিবালজিন, নিও-স্প্যাজমিগুন ইত্যাদি নানা নামের ওষুধে অ্যামিডোপাইরিন থাকত। কিন্তু এখন তা নেই যেমন এসজিপাইরিন-এ এখন আছে এ্যানালজিন (সাথে ফিনাইলবিউটাজোন ও লিডোকেইন), বুটাপাইরিংগা-তে আছে শুধু ফিনাইলবিউটাজোন ইত্যাদি।

২। **প্রদাহবোধী ওষুধের সাথে ভিটামিন ও প্রশান্তিদায়ক ওষুধের মিশ্রণ** (Fixed dose combinations of Vitamins with antiinflammatory agents and tranquillisers)—এধরনের মিশ্রণ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত কিছু সুবিধা হয় না, কিন্তু দাম বাড়ে। এছাড়া প্রশান্তিদায়ক ওষুধের প্রতি আসক্তিরও সৃষ্টি হয়।

বিটাক্রেম, সাইক্লোপাম, ডলোপার প্লাস, স্প্যাজমিজল, **ওয়ালাজেসিক, পামাজিন, পাইরিস্প্যাজম, সেডিন ফোর্ট, প্রক্সিভন, বুটাপ্রক্সিভন, ফ্লামার-পি, ম্যাক্সিজেসিক, কোডোলসিক, ইকোয়াজেসিক প্যারক্সি-ডি, পারভন ফোর্ট, জমাগিন** ইত্যাদি নামের এ জাতীয় ওষুধ এখনো বাজারে পাওয়া যায়। তবে এসবে ভিটামিন আর নেই; যথাসম্ভব আইন বাঁচানোর জন্য ভিটামিন বাদ দিয়ে প্রদাহবিরোধী ও প্রশান্তিদায়ক ওষুধ, মেশান আছে (তাছাড়া কেউ অম্লনাশক ওষুধ ও প্রদাহবিরোধী একাধিক ওষুধ মিশিয়েছে)। তাই নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এদের ক্ষেত্রে একই রকম বর্তমান আছে। আগে কিছু ওষুধ—যেমন বিদেশী কোম্পানি মার্ক-এর ডলোনিউরোবিয়ন—পাওয়া যেত ভিটামিনের সাথে প্রদাহরোধী ওষুধ মিশিয়ে। এখন এটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। ওষুধ নিয়ে এধরনের 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলার উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে।

৩। বেদনাহর ও জ্বরনিবারক ওষুধে এ্যাট্রোপিনের মিশ্রণ (fixed dose combinations of atropine in analgesics and antipyretics)—

শরীরের অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর অস্বাভাবিক সংকোচন-জনিত যে ব্যথা হয় (যেমন অন্ত্রে, পাকস্থলীতে, মূত্রনালী বা পিত্তথলিতে 'কলিকি' ব্যথা) ঐ ব্যথা কমানর ক্ষেত্রে এ্যাট্রোপিন ও এই জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন আছে, যেমন হায়োসায়ামিন, হাওসিন, হোমাট্রোপিন, ডাইসাইক্লোমিন, প্রপানথেলিন, অক্সিফেনোনিয়াম ইত্যাদি। অন্যদিকে সাধারণ ব্যথা ও জ্বর কমানোর ওষুধ (যেমন এ্যাস্পিরিন, প্যারাসিটামল, ইবুপ্রফেন ইত্যাদি) এই ধরনের ব্যথায় অকার্যকারী; এরা পেশীর ব্যথা, গাঁটের ব্যথা ও অন্যান্য প্রদাহজনিত (inflammatory) ব্যথা উপশম করে, প্রদাহজনিত জ্বরও কমায়। কিন্তু এ্যাট্রোপিন ও সমগোত্রীয় ওষুধগুলি গায়ের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়; মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঘুম না হওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, ইত্যাদি নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে

এদের। ঘাম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জ্বর কমতেও দেরী হয়। সবমিলিয়েএধরনেরমিশ্রণ ক্ষতিকর, অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। তবু ব্যথা ও জ্বর কমানোর ওষুধের সাথে এ্যাট্রোপিন বা তার সমগোত্রীয় ওষুধেরএধরনের মিশ্রণ এখনো বাজারে পাওয়া যায়। স্প্যাজমোলাইসিন, পাইরিস্প্যাজম, স্প্যাজমিজল স্প্যাজমোপ্রক্সিভন, বুসকোপ্যান কম্পোজিটাম, প্রাইডোনাল সাইনালজেসিকইত্যাদি নামে এসব বাজারে চালু রয়েছে। এদের কোন কোনটিতে আবার জ্বর ও ব্যাথা কমানোর ক্ষতিকর ওষুধ এ্যানালজিনও মেশান আছে। বহুল ব্যবহৃত ব্যারালগান-এ আবার এ্যানালজিনের সাথে এধরনের ওষুধ মেশান আছে। জটিল রাসায়নিক নাম ব্যবহার করার ফলে চিকিৎসকরাও বিভ্রান্ত হন। এ ধরনের কৌশল আরো অনেকেই অবলম্বন করে, এখন নতুন করেও অনেকে তা করছেন। যেমন ব্যারালগানের উপাদান বলা হয়েছে—analgin 500 mgm ; p-piperi-dinoethoxy-O-carbmethoxy benzophenone hydrochloride 5 mgm ; diphenylpiperidinoethylacetamidebrom-O-methylate 0.1 mgm. সাধারণ মানুষ তো বটেই, সাধারণভাবে ডাক্তাররাও এ রহস্যের ভেতরে ঢুকতে সময় ও উৎসাহ পান না।

৪। টনিকে স্ট্রিকনিন ও ক্যাফিন-এর মিশ্রণ—ক্যাফিন পাওয়া যায় চা, কফি থেকে। এটি একটি স্নায়ুউত্তেজক—চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর মূল্যবান কোন ভূমিকা নেই। সাধারণ অবসাদ ইত্যাদি কাটানর জন্য বিশ্রাম ও উপযুক্ত পরিবেশই দরকার। তার জন্যও অহেতুক বেশীবেশী চা-কফি খেয়ে যাওয়াও শারীরিক ক্ষতিই করে। তবু এর জন্য দু'এক বার চা বা কফি খেলেই যথেষ্ট। টনিকে গাঁট গচ্চা দিয়ে তা খাওয়াটা পয়সা নষ্ট করা এবং এটি কৃত্রিম স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিয়ে সামগ্রিক ক্ষতিই করে। স্ট্রিকনিন ক্যাফিনের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর। এটি কৃত্রিমভাবে অনেক বেশী স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটায়, বেশী খেলে খিচুঁনি ও মৃত্যুও ঘটে। অনেক সময় হিংস্র জন্তু, যেমন উত্তেজিত কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি মারার জন্য স্ট্রিকনিন ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন অনেক উন্নত দেশে স্ট্রিকনিনের এধরনের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে অনেক আগেই। টনিকে খিদে বাড়ান, স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি. ইত্যাদির (অসৎ-) উদ্দেশ্যে স্ট্রিকনিন মেশান হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকাই নেই ("Valueless in therapeutics"—Laurence)। স্ট্রিকনিন স্নায়বিক উত্তেজনা বা অনুভূতি তীক্ষ্ম করে ("sharpen the special senses")। এর জন্য যে পরিমাণ স্ট্রিকনিন ব্যবহার করার দরকার হয় সেটি খিচুঁনি যে মাত্রায় হয় তার কাছাকাছি ("too near the convulsant dose for safety"—ঐ)। তাই অনেক, অনেক দেরীতে হলেও এধরনের পদার্থ আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (তবে সার্বিক ভাবে সব টনিককেই নিষিদ্ধ করা উচিত—কারণ আগেই বলা হয়েছে। টনিক বাজারে চালু রেখে তার একটি

উপাদান—যেন নিমরাজি হয়ে—বাতিল করা আদৌ জনস্বার্থবাহী নয়।)

নেকটারিন-এর নেকটারিন টনিক, বেঙ্গল ইমিউনিটির কুইনোহিমোজেন, এডকো কোম্পানির ভিনো লেসিথিন এর মত দু'একটি টনিক ছাড়া টনিক থেকে স্ট্রিকনিন এখন প্রায় তুলেই দেওয়া হয়েছে। আর MSD কোম্পানির কাশির সিরাপ ভিটমল কম্পাউণ্ডে স্ট্রিকনিন আছে। তবে ক্যাফিন আছে অজস্র ওষুধে। যেমন টনিক নামে প্রচলিত স্যাণ্টেভিনি, সিলটন, অরহেপটাল, ইউনোভা, এরিথ্রোটোন,বিটাহেক্সট,টেনিয়াজল ইত্যাদিতে। আগে টেনোফস, র‍্যানবেক্সিজ কম্পাউণ্ড ইত্যাদি টনিকে ক্যাফিন মেশান থাকত, এখন তা বাদ দেওয়া হয়েছে। (টনিক ছাড়া ব্যথা-শ্বাস কষ্ট কমানর, ও আরো নানা ধরনের 'ওষুধে'ও ক্যাফিন মেশান আছে, যেমন এ্যানাসিন, এপিডিন, এজমাক, এজমোটোন, এসথালাক, বোড্রিল, ক্যাফিয়াস্পিরিন, ক্যাপ্রামিন, ক্যারিসোমা কম্পাউণ্ড, কোসাভিল, ডিকঞ্জিন, মাইক্রোপাইরিন, পাসুমা 'স্ট্রং' ট্যাবলেট, প্রোমালজিন, প্রেগনিডক্সিন, রেফাগান, ট্রুক্সিন, জিমালজিন-এ ইত্যাদি অজস্র ওষুধে।)

৫। **ওহিম্বিন ও স্ট্রিকনিনের সাথে টেস্টোস্টেরন ও ভিটামিনের মিশ্রণ**—এই ধরনের মিশ্রণ যৌনক্ষমতা বাড়ানো বা বার্ধক্য রোধ করার মহতী (!) উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়। নিছকই ধাপ্পা। এই ভাবে ক্ষমতা বাড়ানো বা বার্ধক্য রোধ করা যায় না—যদিও প্রচারের জোরে বিক্রিও হয় এবং অনেক চিকিৎসকও রোগীকে আপাত শান্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। ভিটামিনের ব্যবহার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনি স্ট্রিকনিনের ব্যবহার যে বিপদ ডেকে আনতে পারে তা আগেই বলা হয়েছে। আর যৌনহরমোন টেস্টোস্টেরন এভাবে ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক, এমনকি তা পুরুষদের প্রস্টেটের ক্যান্সারের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। ওহিম্বিন (yohimbine) পশ্চিম আফ্রিকার গাছ থেকে পাওয়া এক উপক্ষার। ইঁদুরের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে দেখা গেছে বীর্যপাত ঘটে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে-এটি কোন ভাবে যৌন উত্তেজনা বা ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটায় না বলেই প্রমাণিত, বড়জোর প্রস্রাব বাড়ায় ও ঘুম না হওয়ার মত কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এখন ওহিম্বিন যুক্ত কোন স্বীকৃত ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় না। তবে নেকটারিন পার্ল, ভিগোট্যাব, ওহিম্বিন, টেস্টোফস, ইত্যাদি ওষুধের নামে প্রচলিত কিছু জিনিষে ওহিম্বিন থাকে।

কিন্তু টেস্টোস্টেরন ও ভিটামিনের মিশ্রণ এখনও বাজারে চালু যেমন, এ্যাকোয়া-ভাইরন বি-১২, টেস্টোবায়ন (ভিটামিন ই, বি-৬ ও বি-১২ মিশিয়ে)। পুরুষদের অণ্ডকোষের কাজ সুনিশ্চিতভাবে কমে গেলে টেস্টোস্টেরন ব্যবহার করা যায়। এছাড়া লিভারের সিরোসিস, ইস্ট্রোজেন নির্ভর ক্যান্সারের প্রসার, অস্থি মজ্জার কাজ কমে গিয়ে রক্তহীনতার মত কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এর ব্যবহার করা যায়। তবু পূর্বোক্ত দুটি ওষুধ বা শুধু টেস্টোস্টেরনযুক্ত ওষুধগুলি এসব রোগ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয় অবলীলায়।

যেমন নিকোলাস কোম্পানির এ্যাকোয়াভাইরন বি-১২ কে দুর্বল, হতাশাগ্রস্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে (depressed debilitated male patients), মার্ক কোম্পানির টেস্টোবায়নকে ওজন বাড়ান (promotion of weight gain) ইত্যাদির জন্য এবং প্রায় সবগুলোকেই মানসিক কিছু রোগ (psychosis), যৌনক্ষমতা কমে যাওয়া (climacteric and sequelae), অত্যধিক বীর্যপাত, বয়স্কদের ডায়াবিটিস, চুলকুনি, বয়স্কদের বধিরতা, প্রোটিনের ক্ষয় (protein depletion) ইত্যাদি নানা মজার মজার ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা বলা হয়। হরমোন নিয়ে বিপজ্জনক ব্যবসার এ আরেক উদাহরণ।

৬। **লৌহগঠিত লবণের সাথে স্ট্রিকনিন, আরসেনিক ও ওহিম্বিনের মিশ্রণ**—সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বলে এধরনের ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন স্বীকৃত ওষুধ—নিষিদ্ধ করার অনেক আগে থেকেই—বাজারে নেই। তবে **কুইনোহিমোজেন,নেকটারিন পার্ল** ইত্যাদিতে আর্সেনিক আছে।

৭। **সোডিয়াম ব্রোমাইড ও ক্লোরাল হাইড্রেটের সাথে অন্য ওষুধের মিশ্রণ**—**আবেশকারী** (hypnotic) ও প্রশান্তিদায়ক (sedative) ওষুধ হিসেবে ক্লোরাল হাইড্রেট বা ক্লোরাল ঘটিত পদার্থ(dichloralphenazone)ব্যবহারের কথা বলা হয়; সোডিয়াম ব্রোমাইডের ব্যবহারও প্রায় একই। কিন্তু এদের ব্যবহার বহু আগেই নানা দেশে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ। ক্লোরাল হাইড্রেট পাকস্থলীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, স্বাদও ভয়াবহ ("horrible")। ঘুম পাড়ানোর ক্ষেত্রে এটি বেশ কার্যকরী, যদি আদৌ ঘুম পাড়ানর দরকার থাকে, যেমন অস্ত্রোপচারের পরে। বড়জোর অতি বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা যায় কারণ এ বয়সে বার্বিচুরেট জাতীয় ওষুধ মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। লিভার বা কিডনির রোগ থাকলে একে কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়; পেপটিক আলসার যুক্ত রোগীর পক্ষেও এটি বিপজ্জনক। সোডিয়াম ব্রোমাইড এখন অচল (obsolete) হয়ে গেছে। প্রশান্তিদায়ক হিসাবে এর ব্যবহার আর করাই হয় না। শুধু মৃগীর খিঁচুনি অন্য কিছুতে না কমলে একে ব্যবহার করা যায়। শরীরে বারবার প্রয়োগ করলে এটি শরীরের ভেতর জমতেই থাকে এবং একসময় মারাত্মক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্পষ্টতঃই বিরল ও বিশেষ দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া এ দুটির ব্যবহার নেই এবং ব্যবহার করলেও বিশেষ সতর্কতা নিয়ে, নিরূপায় হয়ে বিশেষজ্ঞদের দবারা করা উচিত।

তবু জগাখিচুড়ি করে ওষুধ বানানোর প্রতিযোগিতায় এগুলিও কিছু কিছু ওষুধে মেশান থাকত। এখন এদের সংখ্যা কম, কিন্তু আছে। যেমন, জ্বর ও ব্যথা কমানোর ওষুধ প্যারাসিটামলের সাথে ক্লোরাল ঘটিত ডাইক্লোরাল ফেনাজোন মিশিয়ে বাজারে ছাড়া আছে **সেডেকিড ট্যাবলেট** (ইপ্‌কা কোম্পানির)—জ্বরের সাথে অস্থিরতা থাকলে এর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এখন অচল হওয়া সোডিয়াম ব্রোমাইড রয়েছে রিটর্ট কোম্পানির **এ্যাস্থালেক** ট্যাবলেট ও

ক্যাপসুলে, আরো অনেককিছুর সাথে মিশিয়ে ; হাঁপানি, ব্রংকাইটিসে ব্যবহারের জন্য এটি তৈরী। এই একই কোম্পানির ওষুধ **গাইনোডেক্সে-ও** এটি রয়েছে ; জরায়ুর টনিক ও প্রশান্তিদায়ক হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করার সুপারির্শ করা হয়েছে। এছাড়া **ব্রোমোসেডন,ব্রোমো ভ্যালিরেট** ইত্যাদি ওষুধেও এটি রয়েছে।

৮। **ফেনাসেটিন**—লিভার-কিডনির ভয়াবহ ক্ষতি এবং রক্তের মারাত্মক ত্রুটির সম্ভাবনার জন্য এর কোন ধরনের চিকিৎসাগত প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূলত ব্যথা কমানোর জন্য বহু ট্যাবলেটের অন্যতম উপাদান হিসেবে এর প্রয়োগ করা হত, কিন্তু এখন প্রায় সবগুলি থেকে একে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে **এপিসি ট্যাবলেটের** (এস্পিরিন,ফেনাসেটিন ওকোডিন)অন্যতম উপাদান হিসেবে ফেনাসেটিন এখনো বাজারে পাওয়া যায় বা অনেক হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া**এণ্টাডোন,এণ্টাডোন-পি এইচ,এণ্টিস্প্যাম,কোড্রাল, ইন্ফ্লুয়েনঞ্জা ট্যাবলেট, ইনগাসিন, স্যালুরিন ফোর্ট** ইত্যাদি নামের কিছু ওষুধে ফেনাসেটিন আছে এবং দেশের কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়।

৯। **এ্যাণ্টিহিস্টামিনিকের সাথে ডায়ারিয়া বিরোধী ওষুধের মিশ্রণ** (Fixed dose combinations of antihistaminics with antidiarrhoeals)—

—এ্যাণ্টিহিস্টামিনিক ওষুধ ডায়ারিয়া না সারিয়ে তার লক্ষণ কমাতে পারে আর এভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ভয়াবহ ভাবে জটিল হয়ে পড়ে আগে AFD কোম্পানির ক্লোরাম্বিন-এ এধরনের মিশ্রণ ছিল। তবে ডায়ারিয়া-বিরোধী বহু ওষুধই অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর নানা উপাদানের মিশ্রণে তৈরী। কিন্তু এ্যালার্জি-বিরোধী এ্যাণ্টিহিস্টামিনিক কোন উপাদানের সাথে মিশিয়ে কোন ডায়ারিয়া-বিরোধী ওষুধ—সরকারী নিষেধাজ্ঞার অনেক আগে থেকেই—বাজারে পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত ক্ষতিকর ডায়ারিয়াবিরোধী তথাকথিত ওষুধগুলি নিষিদ্ধ করলে বরং কাজের কাজ হত।

১০। **পেনিসিলিনের সাথে সালফোনামাইডের মিশ্রণ**—আলাদা ভাবে দু'টিই অত্যাবশ্যক ওষুধ, কিন্তু দুটির কার্যকারিতা আলাদা। পেনিসিলিন জীবাণুকে মেরে ফেলে, সালফোনামাইড (সালফা ড্রাগস) জীবাণুর বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। উভয়ের মিশ্রণে উভয়ের কার্যকারিতাই কমে যায়। ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও থাকে, অনর্থক দামও পড়ে বেশী। আগে পেনিট্রায়াড, পেণ্টিড সালফা, স্ট্যানপেন-এস ইত্যাদি নানা নামে এধরনের মিশ্রণ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন এধরনের ওষুধ বাজারে আছে বলে জানা নেই। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সারাভাই কোম্পানির বহুল প্রচলিত পেণ্টিড্স্ ট্যাবলেট-এ থাকে পেনিসিলিন-জি যেটি মুখে খেলে অর্ধেকের বেশী অংশই পাকস্থলীতে নষ্ট হয়। অথচ পেনিসিলিন-ভি-এর ব্যবহার করলে এই অপচয় বন্ধ করা যায়।)

১১। **ভিটামিনের সাথে ব্যথা কমানোর ওষুধের মিশ্রণ**—সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটি মিশ্রণ, চিকিৎসক ও রোগীদের ধোঁকা দিয়ে ব্যবসা করার প্রচেষ্টা মাত্র।

নিকোলাস কোম্পানির মাইক্রো পাইরিন-সি ট্যাবলেটে এ্যাস্পিরিনের সাথে ভিটামিন-সি মেশানো আছে ও পাওয়া যায়। আগে ডলোনিউরোবায়ন, ক্যালসিস্পিরিন (ভিটামিন-সি মিশিয়ে) ইত্যাদি এধরনের ওষুধ বেশ বাজার করেছিল। কিন্তু এখন এ জাতীয় মিশ্রণ ওষুধের নামে বাজারে খুব কমই পাওয়া যায়।

১২। **টেট্রাসাইক্লিনের সাথে ভিটামিন-সি এর মিশ্রণ**— এটিও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটি মিশ্রণ, নিছক দাম বাড়ে। নিষিদ্ধ করার পর এধরনের ওষুধ কমে গেছে। তবু **সিডক্স, সাইক্লোডক্স, টেট্রাভিট-২৫০, ট্রাইসাইক্লিন-সি** কিংবা সায়ানামাইড কোম্পানির **এ্যাক্রোমাইসিন** ইনজেকশানে (I.M. ও I.V.) টেট্রাসাইক্লিনের সাথে ভিটামিন-সি এখনো মেশান আছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও সারাভাই কোম্পানির রেস্টেক্লিনে, ফাইজারের টেরামাইসিন-এস-এফ-এ টেট্রাসাইক্লিনের সাথে ভিটামিন-সি মেশান থাকত। এখন রেস্টেক্লিন থেকে ভিটামিন-সি বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফাইজার তা করেনি। আবার এথিকো কোম্পানি ডক্সিসাইক্লিনের সাথে ভিটামিন-সি মিশিয়ে মিনিক্লিন নামে বাজারে ছেড়ে রেখেছে। (তবে আরো বহু ওষুধে অপ্রয়োজনীয় ভাবে ভিটামিন-সি মেশান আছে। অজস্র টনিক ছাড়া এধরনের আরো কয়েকটি উদাহরণ হল, অ্যালার্জি বিরোধী ওষুধের সাথে মিশিয়ে কোহিস্টিন, ক্যালসিলুভিন ; রক্তপাত বন্ধ করার ওষুধে যেমন স্টেপ্টোবায়ন, স্টিপ্‌টোসিড, সি ভি পি, গাইনি-সি ভি পি, ক্যাডিস্পার-সি ইত্যাদি।)

১৩। **ডায়ারিয়া-ডিসেণ্ট্রি ও চামড়ায় ব্যবহারের জন্য ছাড়া অন্যত্র হাইড্রোক্সিকুইনোলিন গ্রুপের ওষুধের মিশ্রণ**—এ জাতীয় পদার্থের বিপদের কথা আগে বলা হয়েছে ('আমাশার ওষুধে পঙ্গু' দ্রষ্টব্য)। ১৯৮২ সালে ভারত সরকার হাইড্রোক্সিকুইনোলিন গ্রুপের ওষুধকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু একবছর পরে আবার এগুলিকে ডায়ারিয়া-ডিসেণ্ট্রি ও চামড়ায় ব্যবহারের জন্য রাখা হল। 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।'

আর এই ধরনের নিষিদ্ধ বাণীর কোন অর্থও হয় না। বাস্তবত ডায়ারিয়া-ডিসেণ্ট্রি ও চর্মরোগে ছাড়া এ জাতীয় পদার্থের অন্যত্র কার্যকারিতার কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও প্রচলিত প্রয়োগের সুনিশ্চিত উদাহরণও নেই।

১৪। **স্ট্রেপটোমাইসিনের সাথে ছাড়া অন্যত্র ক্লোরামফেনিকলের সাথে অন্য ওষুধের মিশ্রণ** (fixed dose combinations of chloramphenicol for internal use except combination of chloramphenicol with streptomycin)—এধরনের মিশ্রণও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং শেষ অর্থে ক্ষতিকর। এখন এধরনের মিশ্রণ বাজারে নেইও। আগে রেক্লোর, ভিটামাইসিন ইত্যাদিতে ক্লোরামফেনিকলের সাথে ভিটামিন মেশান থাকত। এখন ভিটামিন বাদ দেওয়া হয়েছে। (প্রকৃতপক্ষে স্ট্রেপটোমাইসিনের সাথে কোরাফেনিকলের

মিশ্রণও নিষিদ্ধ করা দরকার—এলোপাথাড়ি এন্টিবায়োটিক দ্রষ্টব্য।)

১৫। **হাঁপানির জন্য ছাড়া অন্যত্র শরীরের ভেতরে গ্রহণ করার জন্য স্টেরয়েডের সাথে অন্য ওষুধের মিশ্রণ**—স্টেরয়েডের বিপদ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। হাঁপানিতেও নিতান্ত বাধ্য না হলে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

যাই হোক অন্য রোগের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পরও স্টেরয়েডের জগাখিচুড়ি মিশ্রণওষুধ হিসেবে বিক্রি হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন এথনর কোম্পানির **প্রেডনিফ্লেক্স** (ক্লোরজোক্সাজোন ও এসিটামিনোফেন তথা প্যারাসিটামল মিশিয়ে; বাত ব্যথা, প্রদাহ, রিউম্যাটিক ডিজিজের জন্য), ওয়ায়েথ কোম্পানির **হিস্টাপ্রেড** (এ্যালার্জি-বিরোধী ওষুধের সাথে মিশিয়ে) কিংবা অন্যান্য কোম্পানির **কোর্টোফেন, বিটাক্লোর, কস্টিমাল, ডোকাবোলিন** ইত্যাদি। তবে আইন বাঁচানোর জন্য এদের অনেকগুলিকে এখন শুধু হাপানির জন্য দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। (এছাড়া চামড়ায় প্রয়োগের জন্য বহু মলম ও চোখ-কানের ড্রপে স্টেরয়েড মেশান রয়েছে—এগুলিও সতর্কভাবে ও অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা দরকার।)

১৬। **আরগটের সাথে অন্য পদার্থের মিশ্রণ**—উদ্ভিজ্জাত ওষুধ আরগট আধকপালী (migraine) ও কখনো প্রসবের পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য পদার্থের সাথে মেশালে কাজ বেশী তো হয়ই না, বরং দাম বাড়ে, অপব্যবহার ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এমনকি এর থেকে গ্যাংরিনও হয়ে যেতে পারে।

একারণে এধরনের মিশ্রণ নিষিদ্ধ করা হলেও এখনো তা তৈরী হচ্ছে। যেমন, **ক্যাফারগট** (কাফিনের সাথে মিশিয়ে) (স্যাণ্ডোজ), কুইনিন ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে **আর্গোট্যাবহরমোন** (জ্যাগশন পাল), বেলাডোনা ও ফেনোবার্বিটোন মিশিয়ে ইংগা কোম্পানির **আর্গোফেন**, ক্যাফিন-বেলাডোনা-প্যারাসিটামল মিশিয়ে এই কোম্পানিরই **মাইগ্রিল**,, সাইক্লিজিন ও ক্যাফিন মিশিয়ে ওয়েলকাম কোম্পানির **মাইগ্রানিল**, ক্যাফিন-প্যারাসিটামল-প্রোক্লোরপেরাজিন মিশিয়ে ক্যাডিলা-র **ভেসোগ্রেইন**, স্যাণ্ডোজ-এর **ভেসোগ্রেইন**, ইত্যাদি।

১৭। **ভিটামিনের সাথে যক্ষ্মার ওষুধের মিশ্রণ (আইসোনায়াজিডের সাথে ভিটামিন-৬ ছাড়া)**—এধরনের মিশ্রণ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও দাম বাড়ানোর কৌশল। শুধু ভিটামিন বি-৬-এর তবু কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবু অন্য ভিটামিন মেশানোর উদগ্র নেশা (অবশ্যই তথাকথিত গুণাবলীর তালিকা বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর ধান্দার জন্য) আগে যথেষ্ট ছিল। এখন এধরনের ওষুধ প্রায় নেই। কিন্তু দু'একটি আছে যেমন ডুফার কোম্পানির **থায়োসেভিট** (ভিটামিন বি-১, বি-৬ ও নিকোটিনামাইড) মিশিয়ে।

১৮। **পেনিসিলিনের মলম (চামড়া ও চোখের জন্য)**—এধরনের মলম থেকে

অনেকেরই তীব্র এ্যালার্জির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই একে বাতিল করা হয়েছে। এখন এধরনের 'ওষুধ' আর পাওয়া যায় না। (আগে পেনিসিলিন মলম বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, বহু ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে উপকারও পেয়েছেন। আর অ্যালার্জি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে দু'চারজনের ক্ষেত্রে। তবু তাকে নিষিদ্ধ করা থেকে বোঝা যায় যে, এধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা-যুক্ত সব ওষুধই বাতিল করা উচিত—বিশেষতঃ যখন বিকল্প এবং একই ভাবে বা আরো কার্যকরী ওষুধ বাজারে আছে। এ্যানালজিন, আমাশার ক্লিওকুইনল যুক্ত ওষুধ, ফিনাইলবিউটাজোন ইত্যাদি এসব কারণেই বাতিল হওয়া উচিত।)

১৯। **মুখে খাওয়ার জন্য টেট্রাসাইক্লিনযুক্ত তরল ওষুধ** (Tetracycline liquid oral preparations)—বিশেষতঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিনের বিপদ সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। টেট্রাসাইক্লিন সিরাপ এই বাচ্চাদের জন্যই বাজারে ছাড়া হয়েছিল। হোস্টাসাইক্লিন, এ্যালসাইক্লিন, রেস্টেক্লিন, সুবামাইসিন, স্যাণ্ডোসাইক্লিন, এ্যাক্রোমাইসিন ইত্যাদি নানা নামে এ সিরাপ এই কিছুদিন আগেও পাওয়া যেত।

২০। **নায়ালামাইড** (Nialamide)—হতাশার (depression) চিকিৎসায় এ পদার্থের ব্যবহারের কথা বলা হত। কিন্তু এটির ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বেশী এবং এতই বেশী যে, যে রোগী এটি ব্যবহার করবেন তাঁকে সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ সম্বলিত একটি কার্ড অবশ্যই ওষুধের সাথে দেওয়ার কথা বলা হয়। তবে নিষিদ্ধ করার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এধরনের ওষুধ ভারতের বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না।

২১। **প্র্যাকটোলল**—ভারতের বাজারে ওষুধ হিসেবে এটি পাওয়া যায় বলে জানা নেই।

২২। **মেথাপাইরিলিন** (Methapyrilene, its salts)—ঘুমের ওষুধ হিসেবে ১৯৮৪ সাল অব্দিও ভারতের বাজারে পাওয়া যেত। এর থেকে ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু দেশে বহু আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে।

২৩। **মেথাকোয়ালোন**—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন (!) নেশার ওষুধ ম্যানড্রেক্সের উপাদান। নিদ্রাকর্ষক ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের কথা বলা হয়। কিন্তু এর চেয়ে নিরাপদ ও অধিকতর কার্যকরী ওষুধ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আগে কাশি কমানো ও খিচুঁনি বন্ধ করার জন্যও এর ব্যবহার করা হত। কিন্তু এর ভয়াবহ নেশা সৃষ্টির ক্ষমতা আর নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়ার জন্য বহু দেশের বিজ্ঞানসম্মত ও স্বীকৃত ওষুধের তালিকায় এর নাম অনেক আগে থেকেই নেই। ভারতে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও সিপলা কোম্পানি **রেস্টিল** নামে, স্ট্যাডমেড **কোয়েল** নামে ও কার্টার ওয়ালেস প্রোডর্ম নামে একে বাজারে চালু রেখেছে।

২৪। **অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ**

২৫। **ডিমেক্লো সাইক্লিনের মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ**— (১৯)-এর মত।

এধরনের ওষুধ এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগেও অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বাণিজ্যিক টেরামাইসিন, এ্যালসাইক্লিন ও অটসিন, এ্যামিক্লিন প্লাস ইত্যাদি নামে এবং ডিমেক্লোসাইক্লিন বাণিজ্যিক লেডারমাইসিন নামে বাজারে সিরাপ আকারে পাওয়া যেত। নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার কয়েকমাস পরেও ফাইজার কোম্পানি টেরামাইসিন সিরাপ বিক্রি করেছে তার প্রমাণ আছে। বলা হয়েছে বাচ্চাদের ওজনের প্রতি কিলো গ্রাম পিছু ২০-৫৫ মি গ্রা খাওয়াতে। বিক্রি হচ্ছিল টেরামাইসিন সলিউবল ট্যাবলেটও।

টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ডিমেক্লোসাইক্লিন-এর সিরাপ নিষিদ্ধ করার একটি বড় কারণ যাতে এটি বাচ্চাদের জন্য না দেওয়া যায়। কমপক্ষে ১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য (এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্যও) ওষুধটি যে বিপজ্জনক তা আগে বলা হয়েছে ('এলোপাথাড়ি এ্যান্টিবায়োটিক' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এদের জন্য নিষিদ্ধ না করে শুধু সিরাপ নিষিদ্ধ করার ফলে আসল উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কারণ ওষুধ কোম্পানিগুলি সিরাপের পরিবর্তে ক্যাপসুল বা ইনজেকশান আকারেই এগুলি যে শিশুদের সেব্য তা প্রচার করে চলেছে। যেমন ফাইজার তার টেরামাইসিন (অক্সিটেট্রাসাইক্লিন) ইনজেকশান বাচ্চাদের জন্য ৭-১০ মি. গ্রা. শরীরের প্রতি প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু, লেডারলে তার লেডারমাইসিন (ডেমেক্লোসাইক্লিন) ক্যাপসুল বাচ্চাদের জন্য ৬-১২ মি গ্রা. শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু, হেক্সট তার হোস্টাসাইক্লিন(টেট্রাসাইক্লিন) ক্যাপসুল বাচ্চাদের জন্য ২০-৪০ মি গ্রা. শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু ব্যবহারের কথা বলে। (CIMS ; Jan-April. 1988)

২৬। এনাবলিক স্টেরয়েডের সাথে অন্য ওষুধের মিশ্রণ— —এনাবলিক **স্টেরয়েড এমনিতেই বিপজ্জনক—বিশেষতঃ বাচ্চাদের জন্য।** এছাড়া এর অপপ্রয়োগও ঘটে প্রচুর। ('মহিলার পুরুষে রূপান্তর' দ্রষ্টব্য) এর সাথে অন্যান্য মালকড়ি মিশিয়ে এই বিপদ, এই অপপ্রয়োগ আরো বাড়ে। দামও বাড়ে অপ্রয়োজনে। নিষিদ্ধ হওয়ার এতদিন পরও সিপলা কোম্পানি **এনাবোলেক্স বি-১২**(মিথেনডাইনোন-এর সাথে ভিটামিন-বি১২, ফেরিক এমোনিয়াম সাইট্রেট. মিশিয়ে) মুখে যাওয়ার ফোঁটা ওষুধ (oral drop) হিসেবে বিক্রি করছে—আরো বিপজ্জনক হল এরা ওষুধটিকে বাচ্চাদের বৃদ্ধির গণ্ডগোল, ক্ষুধামন্দ্য, ওজন কমে যাওয়া, রক্তহীনতা ইত্যাদিতে ব্যবহার যোগ্য বলে প্রচার করছে। (CIMS ; Jan-April, 1988) ইউনিকেম কোম্পানি **ট্রাইনার্জিক** ক্যাপসুল ও ইনজেকশানও বিক্রি করছে—এতেও মিথেনডাইনোনের সাথে ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-১২ মেশানো রয়েছে। এটিকেও এরা অপুষ্টি, কম পুষ্টি, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর দুর্বল অবস্থা, বৃদ্ধ বয়স, নার্ভাস হয়ে ক্ষুধা কমে যাওয়া, নার্ভের বিভিন্ন গণ্ডগোল ইত্যাদির জন্য ব্যবহারের কথা বলেছে।(ঐ) সরকারের নাকের ডগায় বসে এবং

সরকারী আইনকানুনের সাহায্য নিয়ে এদের এধরনের মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক ও বিপজ্জনক প্রচার বা কথাবার্তার বহর দেখে সরকারী নিষেধাজ্ঞার পেছনের বলিষ্ঠতা ও সদুদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে।

সরাসরি নিষিদ্ধ করা এধরনের ওষুধ ছাড়া আরো কয়েকটি ওষুধকেও আংশিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন—

(১) ১২ বছরের কমবয়সী শিশুদের জন্য এস্পিরিনযুক্ত কোন ওষুধ—

এস্পিরিনের সামগ্রিক বিপদ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে ('ব্যথা কমানোর ওষুধ' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে ওষুধটির বিপদ আরো ভয়াবহ। পাকস্থলীর ক্ষত ও রক্তপাত, এলার্জি, শ্বাসকেন্দ্রকে উত্তেজিত করা, এসিডোসিস ইত্যাদি ছাড়াও এস্পিরিন ১৫ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে রেইজ সিণ্ড্রোম (Reye's Syndrome নামে আরেকটি প্রাণঘাতী অবস্থার সৃষ্টি করে। এতে যকৃৎ ও কিডনির কোষ সমূহ ক্রমবর্ধমান হারে মারা পড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (মস্তিস্ক)-ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে যায়। বমি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, খিঁচুনি ইত্যাদি ঘটে। জণ্ডিস সাধারণতঃ থাকে না। তবে যকৃৎ, কিডনি ও মস্তিস্কের ক্ষয়জনিত নানা লক্ষণ দেখা দেয়। দু'জনের মধ্যে একজন বাচ্চাই মারা পড়ে। বাচ্চাদের জ্বর হলে হয়তো এস্পিরিন দেওয়া হল। এই জ্বর প্রায়শঃই ঘটে কোন ভাইরাসের কারণে। ভাইরাস ও এস্পিরিন (অর্থাৎ স্যালিসিলেট) মিলে যকৃৎ-কিডনি-মস্তিস্কের কোষসমূহের মাইটোকণ্ড্রিয়াকে নষ্ট করতে থাকে। এর ফলে এই ভয়াবহ অবস্থার(Reye's Syndrome এর) সৃষ্টি হয়। অবশ্যই সব বাচ্চার ক্ষেত্রে এটি ঘটে না। ভাইরাসের আক্রমণ ও তার সাথে এস্পিরিন দেওয়া হলে বাচ্চাদের বিশেষ কিছুজন আক্রান্ত হয়—যারা এর প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল তারাই। কিন্তু হলে মৃত্যুর সংখ্যা যেহেতু ব্যাপক তাই বাচ্চাদের জন্য এস্পিরিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রেয়িজ সিণ্ড্রোমের চিকিৎসার প্রধান দিক হচ্ছে শিরা দিয়ে গ্লুকোজ, ম্যানিটল ও প্লাজমা (fresh frozen plasma) দেওয়া। ১৯৮৬ সালে ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার নির্দেশ দিয়েছেন, এস্পিরিন যুক্ত সমস্ত ওষুধের গায়ে—"চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ ছাড়া ১২ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করা চলবে না"—এ কথাগুলি লিখে দিতে হবে। এখন ওষুধ কোম্পানিগুলি তা লেখেও, তবে অতি ক্ষুদে হরফে, ইংরেজিতে। আর নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য বিশুদ্ধ এস্পিরিনের বড়ি বিক্রি হয় মেজোরাল নামে (CFL কোম্পানির) (এছাড়া এসাবাফ, ড্যাপ্রিসাল-পি, ডিসপ্রিন, ডাইনাস্প্রিন, ইকোয়াজেসিক, মাইক্রোপাইরিন মাইক্রোপাইরিন-সি, সোলজার, টাপাল, ট্রিউপেল, টুক্সিন ইত্যাদি ওষুধে এস্পিরিন অর্থাৎ এসিটাইল স্যালিসিলিক এসিড রয়েছে।)

(২) এংকাইলোজিং স্পণ্ডিলাইটিস ও গাউটি আর্থ্রাইটিস ছাড়া অন্য যে কোন

অবস্থার জন্য **ফিনাইলবুটাজোন ও অক্সিফেনবুটাজোন**—১৯৮৪ সালের বিলি করা একটি সার্কুলারে ভারতের ড্রাগ কণ্ট্রোলার এই আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং খেলে ৭ দিনের বেশী না খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটি ওষুধ বিভিন্ন গাঁট, মাংসপেশী ইত্যাদির ব্যথা কমাতে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেশিদিন খেলে এর ফলে এপ্ল্যাস্টিক এনিমিয়ার মত প্রাণঘাতী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ দুটি ওষুধের প্রধান প্রস্তুতকারক, বহুজাতিক সংস্থা সিবা-গেইগি-র তরফ থেকেই বলা হয়েছে—"(ক) এদুটি ওষুধ ১৪ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য নিষিদ্ধ ও ৪০ বছরের বেশী বয়সী লোকেদের মধ্যে, বৃদ্ধ বয়সে, সাবধানে ব্যবহার করতে হবে।(খ) হার্ট-এর রোগ (হার্ট ফেলিওর), লিভার ও কিডনির রোগ, পেপটিক আলসার ও পরিপাক তন্ত্রে প্রদাহ, রক্তের রোগ—এসব থাকলে ঐ রোগীর জন্য এ দুটি ওষুধ একেবারেই নিষিদ্ধ। (গ) এনালজিন ও কর্টিকোস্টেরয়েডের মত যে সব ওষুধ একইভাবে বিপজ্জনক তাদের সঙ্গে এ দু'টি ওষুধ একসঙ্গে দেওয়া নিষিদ্ধ। (ঘ) জীবজন্তুর মধ্যে করা পরীক্ষায় দেখা গেছে এর থেকে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। (ঙ) রক্তের ক্ষেত্রে এ ওষুধ এগ্র্যাণুলোসাইটোসিস, প্যানসাইটোপিনিয়া (রক্তের সব কোষ কমে যাওয়া), এপ্লাস্টিক এনিমিয়া (রক্তকোষ তৈরী বন্ধ হওয়া বা কমে যাওয়া), হিমোলাইটিক এনিমিয়া (লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যাওয়া)—এসব ঘটাতে পারে। (চ) চোখের ক্ষেত্রে এ ওষুধ থেকে ঝাপসা দেখা, চোখের নার্ভের প্রদাহ, রেটিনায় রক্তপাত, রেটিনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, চক্ষু গোলক নাড়ায় যে সব মাংসপেশী তার প্যারালিসিস ইত্যাদি ঘটতে পারে। (ছ) থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কাজ কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া, প্যানক্রিয়াসের প্রদাহ, প্রাণঘাতী স্টিভেন্‌স্‌-জনসন সিণ্ড্রোম সহ চামড়ার নানা ধরনের রোগও এ দুটি ওষুধ থেকে হতে পারে। লিউকিমিয়া হওয়ার পেছনেও এর ভূমিকা থাকতে পারে।"

স্পষ্টতঃ বাত ব্যথার এই তথাকথিত ওষুধটি একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বাত, স্পণ্ডিলাইটিস ইত্যাদি রোগ নিরাময়েও এর কোন ভূমিকা নেই। শুধু ব্যথা সাময়িকভাবে কমায় মাত্র। তাই তুলনামূলক ভাবে কিছু নিরাপদ অন্য ওষুধ (যেমন প্যারাসিটামল, ইবুপ্রফেন ইত্যাদি) ব্যবহার করা যায়। এভাবে নিষিদ্ধ করলেও ব্যাপকভাবে বা অন্য ওষুধের সাথে মিশাল হিসেবে এটি এখনো নানা ধরনের ব্যথা কমানোর জন্য ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে। বুটাকর্টিণ্ডন, বুটা প্রক্সিভন, ডিসিফ্লাম, ইনফ্লাভান, আইসোডরফেক্স, কিলপেন, ম্যাক্সিজেসিক, অক্সালজিন, অক্সিট্রায়াকটিন, রিডিউসিন-এ, রেপারিল, সায়োরিল, সুগানরিল, ট্রোমাজেসিক, ট্রোমালজিন ইত্যাদি ওষুধে অক্সিফেনবুটাজোন আছে। ফিনাইলবুটাজোন আছে এরিস্টোপাইরিন, বুটাপ্রেড, ইবেফ্লেম, এসজিপাইরিন, প্যারাজোলাণ্ডিন, জোলাণ্ডিন, জোলাণ্ডিন এলকা ইত্যাদি ওষুধে।

নিষিদ্ধ হয়েও যে সব ওষুধ নিষিদ্ধ নয়—ভারতের ড্রাগ কণ্ট্রোলার এক সময় কিছু ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষনা করে ছিলেন। কিন্তু পরে নিজেরাই নিজেদের এ নিষেধাজ্ঞা মানেননি বা মানতে পারেননি। যেমন—

(১) **অতি মাত্রায় ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টেরনের মিশ্রণ** (combination of oestrogen and progesteron in a high dose ; E-P drugs)—একসময় এ ধরনের ওষুধ গর্ভাবস্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ও মহিলাদের বিলম্বিত মাসিকের চিকিৎসায় সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ এর ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়। মাসিক বন্ধ হওয়ার পরে ওষুধটি দিলে যদি মাসিক শুরু না হয় এবং মহিলা যদি গর্ভবতী থাকেন ও গর্ভপাত না ঘটান হয়, তবে শিশুটি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে ; হৃদপিণ্ড, হাত-পা, মস্তিস্ক, পরিপাক তন্ত্র ইত্যাদির অস্বাভাবিকত্ব থাকে—বিকলাঙ্গ জড়বুদ্ধি শিশু পুরো পরিবার ও সমাজের কাছে মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে থাকে, তার নিজের জীবনও হয় অতি করুণ। এছাড়া দেখা গেছে শতকরা ১০ ভাগ ক্ষেত্রে এর থেকে অবাঞ্ছিত গর্ভপাতও হতে পারে। গর্ভাবস্থা নিরূপণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে শতকরা প্রায় ২০ জনের ক্ষেত্রে এটি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ফলাফল দেয়। যেমন, গর্ভাবস্থা নয়, অন্য কোন কারণে মাসিক বন্ধ আছে, এমন মহিলাকে ওষুধটি দিয়েও তার ৭-১০ দিনের মধ্যে মাসিক না হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে ভুলভাবেই তাঁকে গর্ভবতী বলে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে গর্ভবতী হওয়ার জন্য মাসিক বন্ধ আছে এবং তা সত্ত্বেও ওষুধটি দেওয়ার ৭-১০ দিনের মধ্যে 'মাসিক' শুরু হতে পারে। এর ফলে বাচ্চাটি মায়ের পেটে বড় হতে থাকে—জন্ম নেয় বিকলাঙ্গ শিশু। এটি আরো ভয়াবহ। গর্ভাবস্থা নয় এমন কোন কারণে মাসিক বন্ধ থাকলে বা বিলম্বিত হলে তারও আদর্শ চিকিৎসা এটি নয়। এর প্রয়োগে, মূল রোগ চাপা পড়ে যাওয়া, পরবর্তীকালে মাসিকের আরো গণ্ডগোল দেখা দেওয়া ইত্যাদি ঘটতে থাকে। এসব কারণে ১৯৭৫ সাল থেকেই এধরনের ওষুধ পৃথিবীর নানা দেশে নিষিদ্ধ হতে শুরু করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও ১৯৮১ সালে এর বিরুদ্ধে মতামত দেয়। ভারতে সরকারীভাবে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮২-এর পরে এ ওষুধ তৈরী করা এবং ৩০শে জুন, ১৯৮৩-এর পরে বাজারে বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়। (এ ভাবে দুটি আলাদা তারিখ করার উদ্দেশ্য—এই ছ'মাসে যাতে ওষুধ কোম্পানি আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকা তাদের এ ধরনের ওষুধ বিক্রি করে ব্যবসায়িক ক্ষতি এড়াতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে ওষুধ কোম্পানির স্বার্থই সরকারীভাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।) কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশের এমনই আইনকানুন ও ব্যবস্থা যে,—জনগণের চেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেই আইন ভালভাবে সুরক্ষিত করে। ফলে সরকারী নিষেধাজ্ঞার পর অর্গানন (এমন নাম পাল্টে ইনফার ইণ্ডিয়া), ইউনিকেম, নিকোলাস ল্যাবরেটরি—এ সব ওষুধ কোম্পানি যারা ওষুধটি তৈরী ও বিক্রি

নিকোলাস ল্যাবরেটরি—এ সব ওষুধ কোম্পানি যারা ওষুধটি তৈরী ও বিক্রি করত, তারা কলকাতা ও বোম্বাই-এর হাইকোর্টে মামলা করে, সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে 'স্টে অর্ডার' আদায় করে; ফলে এখনো এরা নির্বিঘ্নে এসব ওষুধ বিক্রি করে চলেছে। ডাইসেক্রন ফোর্ট, ই পি ফোর্ট, লুট-ইস্ট্রন ফোর্ট, মেনস্ট্রোজেন, মেনস্ট্রোজেন ফোর্ট, ওরাসেক্রন ফোর্ট, অর্গালুটিন, অস্টেরন ইত্যাদি এই ধরনের ওষুধের উদাহরণ। এরা নিষিদ্ধ হয়েও নিষিদ্ধ নয়।

তবে ১৯৮৪ সালেই শ্রী ভিনসেণ্ট পানিকুলাঙ্গারা নামে কেরলের জনৈক এডভোকেট সুপ্রীম কোর্টে এ ওষুধ বিক্রির বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১৯৮৬-এর নভেম্বরে সুপ্রীম কোর্টে এ বিষয়ে 'হিয়ারিং' হয় এবং এভাবে 'স্টে অর্ডার' দেওয়াতে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়; নিষ্ক্রিয়তা ও টালবাহানার জন্য ভারতের ড্রাগ কণ্ট্রোলারকে ভর্ৎসনাও করা হয় এবং সারা দেশের বিভিন্ন মহলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে মতামত নিয়ে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ অনুযায়ী কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে 'পাবলিক হিয়ারিং' হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো জানা যায় নি।

গত ৩০শে জুন, ১৯৮৮ তারিখে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত এ ধরনের ওষুধকে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ড্রাগ এ্যাণ্ড কসমেটিক্স্ অ্যাকট-এর অধীনে ঘোষিত এই নিষেধাজ্ঞায়,—জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি ছাড়া, অন্য উদ্দেশ্যে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের মিশ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০ মাইক্রোগ্রাম ও ৩ মি. গ্রা.-এর বেশি না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশান দেখালে তা পাওয়া যাবে এবং আলাদাভাবে ওষুধ দুটি (basic form-এ) পাওয়া যাবে।

(সন্দেহজনক ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা **নিরূপণের** জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলার প্রস্রাব পরীক্ষা করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। 'ন্যানসি কিট'—এর সাহায্যে প্রস্রাবে হিউম্যান করিওনিক গোনাডোট্রপিন নির্ধারণ করে এটি করা হয়। তবে আমাদের মত দেশে আপামর **সর্বসাধারণের** কাছে **এর** সুযোগ **যথেষ্টই** সীমিত। সরকারীভাবেই দেশের প্রতি হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এর ব্যবস্থা করা উচিত। তা না করে, বিপজ্জনক ই-পি ড্রাগ চালু রাখাটা মোটেই জনস্বার্থবাহী নয়।)

(২) **ক্লিওকুইনল যুক্ত ওষুধ**—ক্লিওকুইনল যুক্ত ওষুধের বিপদের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে ('আমাশার ওষুধে পঙ্গু' দ্রষ্টব্য)। ১৯৮২ সালে ভারতের ড্রাগ কণ্ট্রোলার এ ওষুধ নিষিদ্ধ করেন কিন্তু পরবর্তী কালের নতুন ঘোষণায় (১৯৮৩) একে বাদ রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদেও আগে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩)**ক্লোরামফেনিকলও স্ট্রেপটোমাইসিনের মিশ্রণ**-১৯৮২ সালে এ ধরনের মিশ্রণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৮৩-এর নতুন ঘোষণায় এ মিশ্রণকে

চালু রেখে, ''স্ট্রেপটোমাইসিনের সাথে ছাড়া অন্যত্র ক্লোরামফেনিকলের সাথে অন্য ওষুধের মিশ্রণ'' নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এ ধরনের মিশ্রণও অপ্রয়োজনীয়, ও বিপজ্জনক। ('এলোপাথাড়ি এন্টিবায়োটিক' দ্রষ্টব্য।)

সরকারী নিষেধাজ্ঞা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এ পদক্ষেপ বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল এবং এ পদক্ষেপ অতি দুর্বল, নিতান্তই অসম্পূর্ণ। বহু ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থই রয়েছে যা ওষুধের নামে বিক্রি হচ্ছে এবং তাদের অপব্যবহার চলছে। আগের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা যায়।

এছাড়া এই নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা কতটা আন্তরিক তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কারণ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও, নানা ওষুধ কোম্পানি সরকারের নাকের ডগায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষেই এসব ওষুধ বাজারে চালু রেখেছে। এর কিছু উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ করাটাই যথেষ্ট নয়—তা যাতে কার্যকরী হয়, তার দায়িত্বও সরকারকেই নিতে হবে এবং এ সম্পর্কে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও জনসাধারণকে ওয়াকিবহালও করতে হবে। সামান্য সরকারী সাফল্য বিপুল বিজ্ঞপনে ঘোষিত হয় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। কিন্তু ওষুধ সম্পর্কিত সরকারেরই নিজের এধরনের 'জনমুখী' কর্মসূচী সে তুলনায় আদৌ যে বিজ্ঞাপিত নয় তা সবার জানা। সাধারণ মানুষ দূরের কথা বহু চিকিৎসকই এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন—অথচ '২০ দফা কর্মসূচী' বা কমপিউটারের ব্যাপক প্রয়োগের মত নানা সরকারী 'উদ্যোগের' কথা কে না জানেন ? ওষুধ সম্পর্কিত সরকারের এই ঘোষণার এক বছরেরও কিছু বেশী সময় পরে, কেরালার আদালতে এক চিকিৎসক নিষিদ্ধ ওষুধ প্রেসক্রিপশান করা ও 'তার জন্য' রোগীর মৃত্যু ঘটানোর দায়ে অভিযুক্ত হন। এঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কেরালা স্টেট হেল্‌থ্‌ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক ডাঃ শশীকুমার নির্মম সত্যটি জানান,—'এ ওষুধটি আইনত যে নিষিদ্ধ তা আমাদের কেউ জানায় নি।' এ জানার দায়িত্ব চিকিৎসকেরও আছে, কিন্তু সরকারী ফাইলে তা যদি চাপা-ই থাকে, প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত না হয় তবে চিকিৎসকরাই বা জানতে পারবেন কি করে। আসলে কৌশলটা নানা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের মত। আর এ ব্যবসাকে সুরক্ষিত করতে আমাদের দেশের আইনকানুন ও সামাজিক ব্যবস্থা বদ্ধপরিকর। গুরুত্বের বিচারে জনস্বার্থ সেখানে দ্বিতীয় স্থানে।

> **টাকা দিয়ে বিছানা কেনা যায়, ঘুম নয়,**
> **বই কেনা যায়, মেধা নয়,**
> **বিলাসিতা কেনা যায়, সংস্কৃতি নয়,**
> **মজা কেনা যায়, সুখ নয়,**
> **খাবার কেনা যায়, ক্ষুধা নয়,**
> **ওষুধ কেনা যায়, স্বাস্থ্য নয়।**

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ও হাথী কমিটি) ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা এবং আমাদের দেশের বাজারে যে বাণিজ্যিক নামে তা পাওয়া যায়

পৃথিবীর নানা দেশে ওষুধ ব্যবহারের চূড়ান্ত বৈষম্য লক্ষ্য করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সাধারণ রোগের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথম প্রতিবেদন বেরোয় ১৯৭৭ সালে। তারপর ১৯৭৯ ও ১৯৮৩-তে সাম্প্রতিকতম গবেষণা ও তথ্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে একে আপাতত চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রায় ২৫০টি উপাদান রয়েছে যাকে একটি আদর্শ নমুনা হিসেবে বলা হয়েছে। এসব ওষুধের সাহায্যে সারা পৃথিবীর সব মানুষের প্রধান প্রধান রোগগুলির চিকিৎসা সম্ভব। ওষুধের নামে ব্যবহৃত হওয়া চূড়ান্ত ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে এটি সব দেশের পক্ষে চূড়ান্ত অবশ্যই নয়। বলা হয়েছে—বিভিন্ন দেশ তাদের প্রয়োজন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঠামো ও অগ্রগণ্যতার উপর ভিত্তি করে এবং এ তালিকাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় ওষুধ নির্বাচন করবেন, তবে অবশ্যই তা ওষুধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা বিচার করেই করতে হবে। যেমন যক্ষ্মার জন্য, অধিকতর কার্যকরী ও কম বিরূপ প্রতিক্রিয়াযুক্ত বিকল্প ওষুধ থাকায় প্যারাএ্যামাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড উন্নতদেশে আর ব্যবহৃত হয় না, এ তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত নয়। তবু আমাদের দেশে এর ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে। এ তালিকায় যেসব উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিকল্প, প্রায় একই ধরনের কোন উপাদান থাকতে পারে—যা হয়তো ক্ষতিকর নয় এবং একইভাবে কার্যকরী। এ ধরনের সব উপাদানকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করে তালিকা অহেতুক বাড়ানো হয় নি। কিছু ওষুধ হয়তো প্রয়োজনীয়, কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার অংশ নয়। বিরলক্ষেত্রে ব্যবহার্য এধরনের কিছু উপাদানও এ তালিকায় নেই। তালিকায় আবার কিছু ওষুধ বাধ্য হয়েই আছে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে, কিন্তু চূড়ান্ত নিরাপদ বিকল্প নেই, তাই প্রয়োজনীয় সর্তকতার কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত এই প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় (জুন, ১৯৮৪)। এখানে এই অনুবাদ থেকেই প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। (তবে বাংলা পরিভাষার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তা মূলত ঢাকার বাংলা একাডেমীর 'চিকিৎসাবিজ্ঞান পরিভাষা' অনুযায়ী।)

কিন্তু আমাদের দেশে (আরো বহু দেশেও) এই তালিকায় যে জেনেরিক নাম

ব্যবহৃত হয়েছে সেই নামে বাজারে ঐগুলি (দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া) পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি ব্যবসায়ের স্বার্থে নিজেদের দেওয়া বাণিজ্যিক নামে অর্থাৎ ব্র্যাণ্ড নামে তা বাজারে ছেড়েছে। বাণিজ্যিক নামের প্রতি নীতিগত বিরোধিতা থাকলেও, পাঠকের সুবিধার জন্য ঐ ধরনের বাজারচলতি বাণিজ্যিক নামের কিছু উদাহরণও দেওয়া হল। এ উদাহরণ স্পষ্টতঃ সম্পূর্ণ নয়। ভারতের বাজারে ৫০-৬০ হাজার নানা বাণিজ্যিক নামের ওষুধ পাওয়া যায়—এ মহাভারত ঘাঁটা সম্ভব হয়নি। এদের মধ্যে কিছুকেই প্রতীকী হিসেবে রাখা হল ; বিশেষ কোন ওষুধ কোম্পানির প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা অনীহার কোন ব্যাপার নেই। বহু উপাদান আবার অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যান্য নানা কিছুর সাথে জগাখিচুড়ি করে মেশান আছে। এ ধরনের মিশ্র ওষুধের উল্লেখও এখানে করা হল না। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে দু'একটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে এ ধরনের মিশ্র ওষুধের কিছু নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রয়োজনীয় ওষুধের অর্থাৎ তার উপাদানের নামের পরে ব্র্যাকেটে যে পরিমাণে (dose-এ), যেভাবে তা ব্যবহার করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে ; পরের ব্র্যাকেটে ঐ ওষুধ সম্পর্কে বিশেষ কোন বক্তব্য রাখা হয়েছে। তার পরে রয়েছে বাণিজ্যিক নামের কয়েকটি উদাহরণ। যেগুলি আমাদের দেশের বাজারে, তালিকায় উল্লেখিত নামেই পাওয়া যায় বা যাদের বাণিজ্যিক নাম জানা নেই তাদের পাশে এস্থলে কিছু লেখা হল না।

১। অবেদনিক বা চেতনানাশক ওষুধ (anaesthetics)—

(১) সার্বিক (general) অবেদনিক ও অক্সিজেন—

ইথার এনেসথেটিক (নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিতে হবে) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন ; নিখুতভাবে রোগ নির্ণয় এবং বিশেষ উপকরণ বা সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।)

হ্যালোথেন (ঐ) (ঐ)

নাইট্রাস অক্সাইড (ঐ) (ঐ)

অক্সিজেন (ঐ)

থাওপেণ্টাল (ইনজেকশানের পাউডার ; ০.৫ গ্রাম, ১.০ গ্রামের এ্যাম্পুল—সোডিয়াম লবণ) (ঐ)

(২) স্থানীয় (local) অবেদনিক—

বুপিভ্যাকেইন (ইনজেকশান, ০.২৫%, ০.৫%—হাইড্রোক্লোরাইডের ভায়াল, ইনজেকশান, ১%, ২%) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় এবং বিশেষ উপকরণ বা সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এপিডুরাল এ্যানেস্থেশিয়ার জন্য।)

লিডোকেইন (ইনজেকশান, ১%, ২%+এপিনেফ্রিন—১ ঃ১০০০০০ অনুপাতের

ভায়াল ; চামড়ায় লাগানোর জন্য ২-৪%—হাইড্রোক্লোরাইড)

২। বেদনাহর (analgesic), জ্বরনিবারক (antipyretic), ননস্টেরয়েডেল প্রদাহরোধী (antiinflammatory) ওষুধ এবং গেঁটে বাত (gout)-এর চিকিৎসার জন্য ওষুধ—

(১) যে সব ওষুধে আসক্তি সৃষ্টি হয় না—

অ্যাসিটাইল স্যালিসিলিকএ্যাসিড(ট্যাবলেট ১০০-৫০০ মি গ্রা ; সাপোজিটরি ৫০-১৫০ মি গ্রা.)—মেজোরাল। (অতি সাধারণ এই ওষুধের জেনেরিক নাম এ্যাস্পিরিন, কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি—আলাদা ভাবে শুধু এই ওষুধটি বাজারে প্রায় পাওয়াই যায় না।* তবে ক্যাফিন, প্যারাসিটামল, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি নানা কিছুর সাথে মিশিয়ে অজস্র নামে পাওয়া যায়।)

এ্যালোপিউরিনল(ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা) (কিডনির গণ্ডগোল থাকলে বাদ দিতে হবে বা ডোজ ঠিক করে ব্যবহার করতে হবে)—সিপ্লোরিক, জাইলোরিক, এক্সিউরিক।

ইবোপ্রফেন (ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা)—ব্রেন, বুফেক্স, ফেন লং, ইবুফ্লামার, সুগাফেন, ব্রুফেন, ফেনস্প্যান (৩০০ ম গ্রা ; ক্যাপসুল), ইবুসিনথ্ (২০০, ৪০০ ও ৬০০ মি গ্রা এর ট্যাবলেট)।

ইণ্ডোমেথাসিন(ক্যাপসুল অথবা ট্যাবলেট, ২৫ মি গ্রা.)—সিপ্লাসিড, ইডিসিন, ইণ্ডোক্যাপ (২৫ ও ৫০ মি গ্রা. ক্যাপসুল), মাইক্রোসিড।

প্যারাসিটামল (ট্যাবলেট ১০০-৫০০ মি গ্রা. ; সাপোজিটারি ১০০ মি গ্রা.)—ক্যালপল, ক্রোসিন, পাইরেজেসিক, রেলিফ, প্যারাসিন, কিউরিপার, ম্যালিডেনস, প্রেডিমল, মোলিন।

কলচিসিন(ট্যাবলেট—০.৫ মি. গ্রা.) (পূর্বোক্ত ওষুধগুলি বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি কাজ না করে বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়, একমাত্র তখন ব্যবহার করা যায় এবং ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য ; এ ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট—তাই সাফল্যের জন্য অনেক ঝুঁকি নিতেহয়)—কলচিসিন।

---

* তার একটিই কারণ, এককভাবে এই ওষুধটির প্রতি ট্যাবলেটের দাম হয় মাত্র ৪—৬ পয়সা। এতে মানুষের উপকার হত, কিন্তু ওষুধ কোম্পানির লাভ থাকে নগণ্য। তাই নানা কিছুর সাথে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর মিশাল দিয়ে দাম বাড়িয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে। একটি বিদেশী কোম্পানি শুধু এ্যাস্পিরিন বিক্রি করত। এখন তা-ও তুলে নেওয়া হয়েছে। আর 'মেজোরাল' নামে বিশুদ্ধ এ্যাস্পিরিনের যে ট্যাবলেট পাওয়া যায় তা শুধু মাত্র বাচ্চাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী বলে বলা হয়। অথচ বাচ্চাদের জন্য এ্যাস্পিরিনকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন ভারতের ড্রাগ কণ্ট্রোলার। ('নিষিদ্ধ ওষুধ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

প্রোবেনেসিড (ট্যাবলেট, ৫০০ মি গ্রা) (কলচিসিনের অনুরূপ)— (ডাইনাসিল—পি আর বি, পেলউইন এল এ, রোসিনিড—এসবে এ্যামপিসিলিনের সাথে মিশিয়ে বিক্রি হয়।)

(২) আসক্তি সৃষ্টিকারী ও ক্রিয়ানাশক (antagonist) ওষুধ—

মরফিন (ইনজেকশান ১০ মি গ্রা—সালফেট অথবা হাইড্রোক্লোরাইড ; ১ মি লি এর এ্যাম্পুল) (সিংগল কনভেনশান অন নারকোটিক ড্রাগস, ১৯৬১ ও কনভেনশান অন সাইকোট্রোপিক সাব্‌স্ট্যান্সেস, ১৯৭১-এর অধীনে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ ওষুধ)

ন্যালোক্সোন (ইনজেকশান, ০.৪ মি গ্রা ; হাইড্রোক্লোরাইড, ১ মি লি-এর এ্যাম্পুল)

পেথিডিন (ইনজেকশান ৫০ মি গ্রা ; হাইড্রোক্লোরাইড ; ১ মি লি-এর এ্যাম্পুল)(পূর্বোক্ত ওষুধগুলি যখন পাওয়া যায় না তখন ব্যবহার করা যায় ; কিডনি ঠিকমত কাজ না করলে বন্ধ করে দিতে হবে ; 'মরফিন'-এর অনুরূপ)

৩। এ্যালার্জিরোধী ওষুধ—

ক্লোরোফেনামিন (ট্যাবলেট, ৪মি গ্রা—ম্যালিয়েট লবণ ; ইনজেকশান ১০ মি গ্রা—১ মি লি-এর এ্যাম্পুল)—এটি এ্যালার্জির অতি সাধারণ ওষুধ. অজস্র কাশি-সর্দির ওষুধে নানা কিছুর সাথে মিশাল দিয়ে এটি পাওয়া যায়, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এককভাবে পাওয়া যায় না (কারণটা এ্যাস্পিরিনের মতই)। (স্ট্যাডমেড-এর কোহিস্টিনে সাথে ভিটামিন-সি মেশান আছে, গ্ল্যাক্সোর পিরিটন এক্সপেক্টোর‍্যান্ট-এ এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম সাইট্রেট মেশান আছে। ইত্যাদি)

এপিনেফ্রিন (ইনজেকশান, ১ মি গ্রা ; হাইড্রোক্লোরাইড হিসেবে— ১ মি লি-এর এ্যাম্পুল)— এ্যাড্রেনালিন। (এছাড়া শোঁকার জন্য [illegible] ইনহ্যাল্যান্ট, চামড়ায় লাগানোর জন্য মেডিক্রিম ও চোখের ড্রপ [illegible] নানা কিছুর সাথে মিশিয়ে বাজারে ছাড়া আছে।)

ক্রোমোগ্লাইসিক এ্যাসিড (মুখে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেওয়ার জন্য কার্টিজ, ২০ মি গ্রা—সোডিয়াম সল্ট) (আগের ওষুধগুলো কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত হলে একমাত্র তখন ব্যবহার করা যায়। যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রয়োগ সীমিত হওয়া উচিত।)

৪। বিষক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতিষেধক ও অন্যান্য উপাদান—

(১) সাধারণ—

সক্রিয় চারকোল (পাউডার)—(অপ্রয়োজনীয়ভাবে নানা এনজাইমের সাথে

মিশাল দিয়েও বাজারে ছাড়া আছে যেমন বেষ্টোজাইম, পেপসিনোজাইম, মেরিজাইম, মলজাইম, ইউনিএনজাইম।)

ইপিকাকুয়ানহা (এমিটিন রূপে হিসেব করা ০.১৪% ইপিকাকুয়ানহা এল্‌কালয়েডযুক্ত সিরাপ)—(বিষক্রিয়ার জন্য নয়, কাশি-হাঁপানির জন্য অন্য নানা কিছুর সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মিশাল দিয়ে 'এ্যাজমাক' ও 'টরফিন' নামে বাজারে ছাড়া আছে।)

সোডিয়াম সালফেট(পাউডার ৫.১৫ গ্রাম)

(২) বিশেষ—

এট্রোপিন(ইনজেকশান ১ মি গ্রা—সালফেট, ১ মি লি এ্যাম্পুল)—এট্রোপিন ইনজেকশান। (বহু ওষুধে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকরভাবে এট্রোপিনের মিশাল দেওয়া থাকে যেমন ডায়ারিয়ার জন্য লোমোফেন বা লোমোটিল-এ, শ্বাসকষ্টের জন্য ব্রোভোন ইনহ্যালেন্ট-এ ইত্যাদি)

ডিফেরোক্সামিন(ইনজেকশান, ৫০০ মি গ্রা ভায়াল,, মেসিলেট)

ডাইমারকাপরোল(তেলযুক্ত ইনজেকশান, প্রতি মি লি-এ ৫০ মি গ্রা. ২ মি লি এ্যাম্পুল) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন)

ন্যালোক্সোন(ইনজেকশান, ০.৪মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড ;১মি লি এ্যাম্পুল)

প্রোটামিন সালফেট(ইনজেকশান, প্রতি মি লি-এ ১০ মি গ্রা ৫ মি লি এ্যাম্পুল)

সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ইডিটেট(ইনজেকশান ; প্রতি মি লি-এ ২০০ মি গ্রা. ; ৫ মি লি এ্যাম্পুল) ডাইমারকাপরোল-এর অনুরূপ)

সোডিয়াম নাইট্রাইট (ইনজেকশান ; প্রতি মি লি-এ ৩০ মি গ্রা-১০ মি লি এ্যাম্পুল)

সোডিয়াম থায়োসালফেট (ইনজেকশান, ২৫০ মি গ্রা—৫০ মি লি-এর এ্যাম্পুল)*

---

* স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৮৪ সালের ২রা ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইডের মাধ্যমে ভারতের ভূপালে যে মারণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তার হাজার হাজার সায়ানাইড আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় এটিরই জরুরী দরকার ছিল। জার্মান বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভন ডেবোল্ট এটি নিয়েও আসেন, কারণ এটি ভারতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ ডাঃ জাগের (Dr. Jager)-এর ও ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে সরকার ও ভূপালের ভারতীয় চিকিৎসকরা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। তবে জানা যায় ভূপালে বিশেষ কিছু ভি আই পি এই ইনজেকশান গোপনে নিয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। (একলব্য, ভূপাল প্রকাশিত Bhopal : a people's view of death)

মিথাইল থিওনিনিয়াম ক্লোরাইড (ইনজেকশান, প্রতি মি লি-এ ১০ মি গ্রা ; ১০ মি লি-এর এ্যাম্পুল) (বিরল ধরনের রোগে ব্যবহারের জন্য ; যখন পূর্ববর্ণিত ওষুধগুলি বিশেষ কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত বলে দেখা যায় তখন ব্যবহারের জন্য।)

পেনিসিলামিন(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট ; ২৫০ মি গ্রা) (বিরল ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ; অবশিষ্ট ডাইমারকাপরোল-এর অনুরূপ)

৫। মৃগী রোগের ওষুধ—

ডায়াজিপাম (ইনজেকশান, প্রতি মি লি-এ ৫ মি গ্রা ; ২ মি লি এ্যাম্পুল)—ক্যাম্পোজ, কামোড, কিউরিকাম, প্যাসিকুইল, প্যাক্সাম, সোমাটিন, ভ্যালিয়াম। (এছাড়া নানা পদার্থের সাথে মিশিয়ে ঘুমের ওষুধ হিসেবে এর ব্যাপক অপব্যবহারও হয় ও অজস্র নামে পাওয়া যায়, যেমন, ভিটামিন বি-৬-এর সাথে মিশিয়ে প্লাসিডক্স-২ নামে, ব্যথা কমানোর ওষুধের সাথে মিশিয়ে বেটাফ্রেম নামে ইত্যাদি।)

ইথোসাক্সিমাইড(ক্যাপসুল, ট্যাবলেট—২৫০ মি গ্রা)—জ্যারোন্টিন।

ফেনোবারবিটাল(ট্যাবলেট ৫০ মি গ্রা, ১০০ মি গ্রা ; সিরাপ—প্রতি ৫ মি লি -এ ১৫ মি গ্রা) (মরফিনের অনুরূপ)—গার্ডিনাল, লুমিনাল। (গ্যারোইন ট্যাবলেট-এ ফেনিটয়েন-এর সাথে মেশান আছে। এছাড়া বহু ধরনের ওষুধে এটি ঘুমের ওষুধ হিসেবে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ভাবে মেশান থাকে যেমন হাঁপানির জন্য সেডোনাল, এ্যাজমাপাক্স ডিপো, টেড্রাল, ফ্রেনল, এ্যাসথালাক ক্যাপসুল ইত্যাদিতে, পেটের ব্যথার জন্য বার্ডেজ, বেলাডোনাল, বেলাফেন ইত্যাদিতে।)

ফেনিটয়েন (ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট, ২৫ মি গ্রা , ১০০ মি গ্রা— সোডিয়াম সল্ট ; ইনজেকশান—৫০ মি গ্রা সোডিয়াম সল্ট প্রতি মি লি-এ—৫ মি লি-এর ভায়াল)—ডাইল্যান্টিন, এপটয়েন। (গ্যারোইন-এ ফেনোবার্বিটনের সাথে মেশান থাকে।)

কার্বামাজিপাইন(ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা) (আগের ওষুধগুলো যখন কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয় তখন ব্যবহার করা যায় এবং ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য)—কার্বাজিন, ম্যাজেটল।

ভ্যালপ্রোইক এ্যাসিড (ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা—সোডিয়াম সল্ট) (কার্বামাজিপাইনের অনুরূপ ; এর ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ; কিডনি ঠিকমত কাজ না করলে এটি বাদ দিতে হবে বা ডোজ ঠিক করতে হবে ;

বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি সাফল্যের মাত্রা কমিয়ে দেয়।)

৬। সংক্রমণ প্রতিষেধক ওষুধ-

(১) কৃমিনাশক—

মেবেণ্ডাজোল (ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা)—বেসান্টিন, এবেন, এমানথাল, ইডিবেণ্ড, মেবাজোল, মেণ্ডাজোল, প্যাণ্টেল-২০০, প্যাণ্টেলমিন, ভার্মিটেল, ওয়ার্মিন, মেবেক্স, এক্সপেল।

পাইপেরাজিন (ট্যাবলেট ৫০০ মি গ্রা—সাইট্রেট বা এ্যাডিপেট ; এলিক্সির বা সিরাপ -সাইট্রেটরূপে—৫০০ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ)—পাইপেরাজিন সাইট্রেট সিরাপ। (এছাড়া মৃদুভেদক বা পায়খানা করানর ওষুধ সেনোসাইডের সাথে মিশিয়ে নানা নামে পাওয়া যায় যেমন এ্যান্টিপার উইথ ল্যাক্সেটিভ, হেলমাসিড উইথ সেন্না, পিপসেন্না ইত্যাদি। ফাইলেরিয়ার ওষুধ ডাই ইথাইল কার্বামাজিনের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মিশিয়েও এটি বাজারে ছাড়া আছে যেমন, হেলমাজান।)

পাইরেণ্টাল (চিবিয়ে খাওয়ার বড়ি। ২৫০ মি গ্রা এমবোনেট রূপে ; মুখে খাবার তরল ওষুধ ৫০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ)—মিণ্টেল, পিরময়েড, নেমসিড, এক্সপেণ্ট, কমব্যাণ্ট্রিন (সবগুলি পামোয়েট রূপে)।

থায়াবেণ্ডাজোল (চিবিয়ে খাওয়ার বড়ি, ৫০০ মি গ্রা)—মিণ্টেজল।

(২) আমাশার জন্য (anti amoebic) —

ক্লোরোকুইন (ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা—ফসফেট বা সালফেট)—নিভাকুইন, ম্যালাকুইন, ল্যারিয়াগো, সিপ্লাকুইন, সেলুব্রিন, রিসচিন। (এসবগুলিই ম্যালেরিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাশার জন্য ব্যবহার্য বলে শুধু ক্লোরোকুইন বাজারে পাওয়াই যায় না; আরো নানা উপাদানের সাথে, যেমন ক্লিওকুইনলযুক্ত নানা পদার্থের সাথে মিশিয়ে নানা নামে পাওয়া যায়, যেমন এলিকুইন ফোর্ট, এমিক্লিন ও এমিক্লিন প্লাস, নিওভায়াসেপ্ট, নিভেম্বিন কম্পোজিটাম ইত্যাদি।)

ডাইলক্সানাইড (ট্যাবলেট—৫০০ মি গ্রা ; ফুরোয়েট)—ফুরামাইড। (মেট্রোনিডাজল এর সাথে মিশিয়ে এণ্টামিজল, ডাইরেড-এম, ওরোজিল-ডি এফ ইত্যাদি নামে, টিনিডাজোল-এর সাথে মিশিয়ে টিনিবা-ডিএফ, টিনিডাফিল প্লাস ইত্যাদি হরেক নামেও এটি বাজারে ছাড়া আছে।)

মেট্রোনিডাজল (ট্যাবলেট—২০০-৫০০ মি গ্রা)—এরিস্টোজিল, ডায়ানাজল, ফ্লাজিল, মেট্রন, মেট্রিল, মনিজল, ওরোজিল, ক্লণ্ট, ট্রাইকনেক্স, ইউনিমেজল। (এছাড়া অন্য উপাদানের সাথে জগাখিচুড়ি মিশিয়েও বাজারে পাওয়া যায়।)

ডিহাইড্রোএমিটিন (ইনজেকশন—৬০ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড, ১ মি লি এ্যাম্পুল) (আগের ওষুধগুলি যখন কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হবে তখন ব্যবহার করা যাবে, ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট রয়েছে। অবশিষ্ট মরফিনের অনুরূপ)—ডিহাইড্রোএমিটিন (রোস)।

(৩) জীবাণু নাশক ওষুধ—

(ক) পেনিসিলিন—

এ্যাম্পিসিলিন (ক্যাপসুল অথবা ট্যাবলেট, ২৫০ মি গ্রা., ৫০০ মি গ্রা.—এ্যানহাইড্রাস; মুখে খাবার তরল ওষুধের পাউডার, ১২৫ মি গ্রা.—এ্যানহাইড্রাস; ৫ মি লি ইনজেকশানের পাউডার ৫০০ মি গ্রা. সোডিয়াম সল্ট, ভায়াল) (কিডনি ঠিকমত কাজ না করলে বাদ দিতে হবে বা ডোজ ঠিক করতে হবে)—এ্যাম্পিজেট, এ্যামপিক, এ্যাম্পিপেন, বেসিপেন, ব্রোয়াসিল, ব্রোয়াডিসিলিন, ক্যাম্পিসিলিন, ডাইনাসিল, সিনথোসিলিন, রোসিনিড, মার্টিসিলিনও পেনসিন (ট্রাইহাইড্রেটরূপে), এম পি-সিলিন, রেম্পিসিলিন-৬, রোসিলিন।

বেঞ্জাথিন বেঞ্জাইল পেনিসিলিন (ইনজেকশান ,১.৪৪ গ্রাম; বেঞ্জাইল পেনিসিলিন—২৪ লক্ষ ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিট—৫ মি লি ভায়াল) (চিকিৎসার নির্দেশ বিধি মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা করা দরকার)—ডায়াপেন, লংগাসিলিন, পেনিডিওর-এল এ-৬, ১২, ২৪।

বেঞ্জাইল পেনিসিলিন (ইনজেকশানের পাউডার, ০.৬ গ্রাম—১০ লক্ষ ইন্টার ন্যাশন্যাল ইউনিট, ৩ গ্রাম—৫০ লক্ষ ই. ই.;—সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সল্ট; ভায়াল)—সোডিসিলিন। (অন্যান্য এ্যান্টিবায়োটিকের সাথে মিশিয়ে আরো নানা নামেও পাওয়া যায়।)

ফেনোক্সি মিথাইল পেনিসিলিন(ট্যাবলেট ২৫০ মি গ্রা.—পটাসিয়াম সল্ট; মুখে খাওয়ার তরল ওষুধের পাউডার—২৫০ মি গ্রা. পটাসিয়াম সল্ট প্রতি ৫ মি লি-এ)—ক্রিস্টাপেন ভি, কেপেন, ফেনোসিন।

প্রোকেন বেঞ্জাইল পেনিসিলিন(ইনজেকশানের পাউডার ১ গ্রা.-১০ লক্ষ ই ই; ৩ গ্রাম-৩০ লক্ষ ই ই) (ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট)—(বেঞ্জাইল পেনিসিলিনের সাথে মিশিয়ে প্রসিলিন ফোর্ট নামে, এর সাথে স্ট্রেপটোমাইসিন মিশিয়ে প্রসিলিন এস নামে ও ওমনামাইসিন নামে পাওয়া যায়। প্রোকেইন পেনিসিলিন থাকে বিস্ট্রেপেন, ডাইক্রিস্টিসিন, পোনডিওর-এ পি; ক্রিস-৪. ১২; লংগাসিলিন ফোর্ট ইত্যাদিতে।)

(খ) অন্যান্য জীবাণু নাশক—

ক্লোরামফেনিকল(ক্যাপসুল ২৫০ মি গ্রা ; ইনজেকশানের পাউডার—১ গ্রামের ভায়াল, সোডিয়াম সাক্সিনেট রূপে) (বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট রয়েছে)—ক্যাটিলান, ক্লোরোমাইসেটিন, কিউরিক্লোর, এণ্টেরোমাইসেটিন. হ্যালসেটিন, প্যারাক্সিন, ফেনিমাইসিন (৫০০ মি গ্রা), রেক্লোর, ভিটামাইসেটিন।

ক্লক্সাসিলিন(সোডিয়াম সল্টরূপে ক্যাপসুল ৫০০ মি গ্রা ও ইনজেকশানের পাউডার ৫০০ মি গ্রা. ভায়াল)—ক্লক্সিক্যাপস, ক্লক্স, স্ট্যাফনিল (সবাই ২৫০ মি গ্রা.), ক্লসিনিল।

ইরিথ্রোমাইসিন(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট, ২৫০ মি গ্রা - স্টিয়ারেট বা ইথাইল সাক্সিনেট রূপে—মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ ১২৫ মি গ্রা ৫ মি লি-এ ; ৫০০ মি গ্রা ইনজেকশানের পাউডার ল্যাকটোবায়োনেট রূপে)—এ্যালথ্রোসিন, এলটোসিন, ই-মাইসিন, ইরিনেট, ইরিস্টার, ইরিথ্রোসিন, ইরিথ্রোকেম, থ্রোমাইসিন।

জেণ্টামাইসিন(ইনজেকশান ১০ মি গ্রা, ৪০ মি গ্রা—সালফেট রূপে প্রতি মি লি-এ —২ মি লি ভায়াল) (কিডনি ঠিকমত কাজ না করলে বাদ দিতে হবে বা ডোজ ঠিক করতে হবে)—বায়োগারাসিন, গ্যারামাইসিন, জেনসিল, জেণ্টা-স্পোরিন, জেণ্টিসিন, লাইরামাইসিন, মেরিজেণ্টা।

মেট্রোনিডাজল(ট্যাবলেট ২০০-৫০০ মি গ্রা , ইনজেকশান ৫০০ মি গ্রা ; ১০০ মি লি —সাপোজিটরি, ৫০০ মি গ্রা., ১ গ্রাম)—আগে উল্লেখ করা হয়েছে ('আমাশার জন্য ওষুধ')।

সালাজোসালফাপাইরিডিন(ট্যাবলেট ৫০০ মি গ্রা.) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগনির্ণয়, উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন)— স্যালাজোপাইরিন (স্যালিসিলাজোসালফাপাইরিডিন)।

স্পেকটিনোমাইসিন(ইনজেকশানের পাউডার—হাইড্রোক্লোরাইড—২ গ্রামের ভায়াল)

সালফাডিমিডন(ট্যাবলেট ৫০০ মি গ্রা., মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ—৫০০ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ ; ইনজেকশান ১ গ্রাম, সোডিয়াম সল্ট, ৩ মি লি এ্যাম্পুল) (জেণ্টামাইসিনের অনুরূপ)—আলাদা পাওয়া যায় না; তবে অত্যন্ত ক্ষতিকর ভাবে বাচ্চাদের জন্য ডায়ারিয়ার ওষুধ ডায়ারমাইসিন-এন বা ইনসেপটিনের অন্যতম উপাদান হিসেবে আছে ; এছাড়া অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকরভাবে আছে স্ট্রেপটেট্রায়াড ও চামড়ায় লাগানো জন্য ট্রাইসালফা ক্রীম-এ)।

সালফামেথোক্সাজোল+ট্রাইমেথোপ্রিম (ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা + ২০ মি গ্রা ; ৪০০ মি গ্রা + ৮০ মি গ্রা) (জেন্টামাইসিনের অনুরূপ)—ব্যাকট্রিম, বেসকোট্রিম, কেমোট্রিম ফোর্ট (৪০০ মি গ্রা + ১৬০ মি গ্রা), ট্রাইসালফোস, টিমিজল, সিপলিন, সিপলিন ডি এস, কোপ্রিম, ফোর্ট্রিস, ইনফেকটো, ইনফেক্ট্রা, ট্যাব্রল, মেথক্সাপ্রিম, মর্টিন, নিওপ্রিম, সেপট্রান, সুমিট্রল, সাইনস্ট্যাট, সাইনারট্যাব, ডব্লু কে-ট্রিম, ব্যাকটপ ডি এস।

টেট্রাসাইক্লিন (ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট, ২৫০ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড) (জেণ্টামাইসিনের অনুরূপ)—এ্যাক্রোমাইসিন, এ্যালসাইক্লিন, সিব্রোলিন ২৫০, কিউর সাইক্লিন, (হোস্টাসাইক্লিন ৫০০), রেস্টেক্লিন, সুবামাইসিন, ট্রাইসিন।

এমিকেসিন(ইনজেকশান—২৫০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ—সালফেট ; ২ মি লি এ্যাম্পুল) (জেণ্টামাইসিনের অনুরূপ ; আগের ওষুধগুলো কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত তখন এবং বিরল ধরনের রোগে বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য)—এমিসিন।

ডক্সিসাইক্লিন (ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড রূপে —ইনজেকশান ১০০ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ, এ্যাম্পুল) (আগের ওষুধ গুলো কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে ব্যবহার করা যায়। চিকিৎসার নির্দেশ বিধি মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার। ওষুধের ভেষজ ক্রিয়াতাত্বিক গুণাবলী পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা দরকার)—ডক্সি-১, ডক্স-২৪, ডক্সিক্যাপস, ডক্সিপাল, ডুরাসাইক্লিন, লিডক্স, মার্টিডক্স, মাইক্রোডক্স, মিনি-সাইক্লিন, রেমডক্সি, টেট্রাডক্স, আলট্রামাইসিন, ভিভোসাইক্লিন, জিডক্স।

নাইট্রোফুরাণ্টয়েন(ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা) (জেন্টামাইসিনের অনুরূপ ; ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ; আগের ওষুধগুলো যখন পাওয়া যায় না কিংবা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত তখন ব্যবহার করা যায়)—ফুরাড্যাণ্টিন। (অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে ফিউরিলিক, ট্রাইফুরান ইত্যাদি নামেও পাওয়া যায়)

(গ) কুষ্ঠ রোগের ওষুধ—

ক্লোফাজিমাইন(ক্যাপসুল—১০০ মি গ্রা)—ক্লোফাজিমিন, হ্যানসেপ্রান।

ডেপসোন(ট্যাবলেট ৫০ মি গ্রা., ১০০ মি গ্রা.)—নোভোফোন।

রিফামপিসিন(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট—১৫০ মি গ্রা., ৩০০ মি গ্রা.)—কিউরিফাম, ফ্যামসিন, লসিট্রিল, মণ্টোমাইসিন, আর-সিন, রিফাম, রিফাসিলিন, রিফাডিন, রিম্পাসিন, টিবিরিম, রিফার্মেড, রিম্পিন, রিফামিনাল, রিফাসাইসিন, রিফিনেক্স, টিবামাইকিন।

ইথিওনামাইড(ট্যাবলেট ১২৫ মি গ্রা., ২৫০ মি গ্রা.) (আগের ওষুধগুলো কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে।)

প্রোটিওনামাইড(ট্যাবলেট ১২৫ মি গ্রা.) (ইথিওনামাইডের অনুরূপ)

(ঘ) যক্ষ্মার ওষুধ—

ইথামবিউটল(ট্যাবলেট ১০০, ৫০০ মি গ্রা.—হাইড্রোক্লোরাইড)—এ্যালিবুটল, বিডলবিউটল, বুটলট্যাবস, কমবিউটল, কম্বিটল, ইটি—৮০০, ইটিবি, ইটিনল, ইডিটল, মায়ামবিউটল, রেমটল, থেমিবিউটল, টিবিটল।

আইসোনায়াজিড(ট্যাবলেট—১০০-৩০০ মি গ্রা.)—এর্বাজাইড, ইপকাজাইড, আইসোকিন, আইসোনেক্স, আইসোপার, নাইড্রাজিড।

পাইরাজিনামাইড (ট্যাবলেট - ৫০০ মি গ্রা.)—পাইরালডিনা, ইউনিপিরা, মণ্টোজিন, লাইনামাইড, কোপিরাজিন, পি-জাইড, (পি-জেড এ-সিবা-৭৫০)।

রিফামপিসিন(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট ১৫০ মি গ্রা., ৩০০ মি গ্রা.)—(কুষ্ঠের ওষুধ দ্রষ্টব্য।)

স্ট্রেপটোমাইসিন্ (ইনজেকশানের পাউডার—১ গ্রা সালফেট, ভায়াল) (জেন্টামাইসিনের অনুরূপ)—এ্যাম্বিস্ট্রিন এস, মেরস্ট্রেপ।

থায়াসিটাজোন+ আইসোনায়াজিড (ট্যাবলেট : ৫০ মি গ্রা. + ১০০ মি গ্রা. ; ১৫০ মি গ্রা. + ৩০০ মি গ্রা.)—বি-টেবেন, আইসোকিন ফোর্ট, আইসোজোন, নাইজেট। (থায়োসিভেট-এ সাথে একগাদা ভিটামিনও মেশান আছে।)

(৪) ফাইলেরিয়ার ওষুধ—

ডাইইথাইল কার্বামাজিন (ট্যাবলেট—৫০ মি গ্রা.—সাইট্রেট)—বেনোসাইড, হেট্রাজেন। (এ্যালার্জির ওষুধের সাথে মিশিয়ে ইউনিকার্বাজেন ফোর্ট, কার্বামিল ডাইকার্ব, হেলমাজান ইত্যাদি নামেও পাওয়া যায়।)

সুরামিন সোডিয়াম(ইনজেকশানের পাউডার, ১ গ্রা ভায়াল)

(৫) ফাংগাসজনিত রোগের ওষুধ—

এমফোটেরিসিন(ইনজেকশানের পাউডার, ৫০ মি গ্রা. ভায়াল) (অন্য ওষুধ কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বা ব্যর্থ প্রমাণিত হলে ব্যবহার করা যায়)—ফাংগিজোন ইন্ট্রাভেনাস (সারাভাই)। (মেয়েদের শ্বেতস্রাবে ব্যবহারের জন্য ট্যালসুটিন ভ্যাজাইন্যাল ট্যাবলেটেও এটি রয়েছে।)

গ্রিসিওফুলভিন(ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ১২৫ মি গ্রা., ২৫০ মি গ্রা.) (প্রয়োগ সীমিত বা কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ)—গ্রিফাংগিন পি জি, গ্রিসাকটিন এফ পি, গ্রিসোভিন এফ পি, ইডিফুলভিন, ওয়ালাভিন ফে পি, মাইকোরাল।

নিস্টাটিন (ট্যাবলেট—৫ লক্ষ ই ই, পেসারি ১ লক্ষ ই ই)—মাইকো-স্ট্যাটিন, মাইকোস্ট্যাটিন ভ্যাজাইন্যাল।

ফ্লুসাইটোসিন্(ক্যাপসুল—৫০ মি গ্রা., ইনফিউসন—২৫ গ্রাম ২৫০ মি লি-এ)

(৬) কালাজ্বরের ওষুধ—

পেন্টামাইডিন(ইনজেকশানের পাউডার—২০০ মি গ্রা. ভায়াল—আইসেটিওনেট বা মেসিলেট) (চিকিৎসার উপযুক্ত নির্দেশ মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার)

সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট (ইনজেকশান—৩৩%, ১০% এ্যান্টিমনির সমান—৩০ মি লি ভায়াল)

(৭) ম্যালেরিয়ার ওষুধ—

ক্লোরোকুইন(ট্যাবলেট ১৫০ মি গ্রা.)—ফসফেট বা সালফেট রূপে—সিরাপ, ৫০ মি গ্রা. প্রতি ৫ মি লি-এ)—(আমাশার জন্য ওষুধ দ্রষ্টব্য)।

প্রাইমাকুইন(ট্যাবলেট ৭৫ মি গ্রা., ১৫ মি গ্রা—ফসফেট রূপে)

কুইনাইন (ট্যাবলেট ৩০০ মি গ্রা—বাইসালফেট বা সালফেট রূপে; ইনজেকশান, ৩০০ মি গ্রা. প্রতি মি লি-এ, ২ মি লি এ্যাম্পুল—ডি হাইড্রোক্লোরাইড রূপে)—(কুইনার্সল—সাথে এ্যান্টিপাইরিন ও সোডিয়াম ক্যাকোডাইলেট মেশান আছে)।

এ্যামোডায়াকুইন(তরল ওষুধ—১৫০ মি গ্রা. প্রতি ৫ মি লি-এ, হাইড্রোক্লোরাইড রূপে) (যখন অন্য ওষুধ কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত তখন দিতে হবে)—ব্যাসোকুইন সাসপেনসান। (ক্যামোকুইন নামে ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়।)

সালফাডক্সিন + পাইরিমেথামিন (ট্যাবলেট, ৫০০ মি গ্রা. + ২৫ মি গ্রা.) (এ্যামোডায়াকুইনের অনুরূপ)—ম্যালোসাইড, ক্রায়োডক্সিন—এফ এম, ওনলি-২। (মেটাকেলফিন-এ সালফাডক্সিনের পরিবর্তে সালফামিথোপাই-রাজিন আছে।)

(৮) সিস্টোসোমা বিরোধী ওষুধ (রোগটি আমাদের দেশে বিরল)—

মেট্রিফোনেট(ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা.)

ওক্সামনিকুইন(ক্যাপসুল-২৫০ মি গ্রা ; সিরাপ ২৫০ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ)

প্রাজিকোয়াণ্টেল(ট্যাবলেট-৬০০ মি গ্রা.)

(৯) ট্রাইপানোসোমা বিরোধী ওষুধ (রোগটি আমাদের দেশে বিরল)—

মেলারসোপ্রোল(ইনজেকশান ৩.৬%) (চিকিৎসার বিশেষ নির্দেশ মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার।)

পেণ্টামিডিন (ইনজেকশানের পাউডার—২০০ মি গ্রা. ; ইসেটিডনেট বা মেসিলেট) (ঐ)

সুরামিন সোডিয়াম(ইনজেকশানের পাউডার. ১ গ্রা. ভায়াল)

নিফারটিমোক্স(ট্যাবলেট—৩০, ১২০, ২৫০ মি গ্রা.) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়, বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন ; প্রয়োগ সীমিত হওয়া উচিত; ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য।)

৭। মাইগ্রেন (আধকপালী বা অর্ধশিরঃশূল)-এর ওষুধ—

আর্গোটামাইন(ট্যাবলেট, ২ মি গ্রা.—টারট্রেট রূপে)—(এককভাবে পাওয়া যায় বলে জানা নেই। ক্যাফিনের সাথে মিশিয়ে ক্যাফারগট ও আরো নানা কিছুর সাথে মিশিয়ে আর্গোফেন, মাইগ্রানিল, মিগ্রিল, ভেসোগ্রেন ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়।)

৮। (ক্যান্সারের জন্য) এন্টিনিওপ্লাস্টিক ও ইমিউনোসাপ্রেসিড ওষুধ—

অ্যাজাথিওপ্রিন (ট্যাবলেট ৫০ মি গ্রা ; ইনজেকশানের পাউডার ১০০ মি গ্রা. ভায়াল—সোডিয়াম সল্ট রূপে) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগনির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।)—ইমিউরান, ট্রানসইমিউন।

ব্লিওমাইসিন(ইনজেকশানের পাউডার ১৫ মি গ্রা. ভায়াল—সালফেট রূপে) (ঐ)—ব্লিওসিন।

বুসালফান(ট্যাবলেট ২ মি গ্রা.) (ঐ)

ক্যালসিয়াম ফোলিনেট (ট্যাবলেট ১৫ মি গ্রা. ; ইনজেকশান—৩ মি গ্রা. প্রতি মি লি-এ—১০ মি লি এ্যাম্পুল)

ক্লোরামবুসিল(ট্যাবলেট ২ মি গ্রা.) (ঐ)—লিউকেরান।

সাইক্লোফসফামাইড(ট্যাবলেট ২৫ মি গ্রা ; ইনজেকশানের পাউডার—৫০০ মি গ্রা. ভায়াল) (ঐ) এণ্ডোক্সান-এসটা, সাইক্লোক্সান।

সাইটারাবাইন(ইনজেকশানের পাউডার—১০০ মি গ্রা ভায়াল) (ঐ)

ডক্সোরুবিসিন (ইনজেকশানের পাউডার, ১০ মি গ্রা ; ৫০ মি গ্রা. ভায়াল—হাইড্রোক্লোরাইড)—এড্রিয়ামাইসিন।

ফ্লুরোইউরাসিল(ইনজেকশান—৫০ মি গ্রা. প্রতি মি লি-এ ৫ মি লি এ্যাম্পুল) (ঐ)—ফ্লুরাসিল, ফাইভফ্লুরো।

মেথোট্রেক্সেট(ট্যাবলেট, ২৫ মি. গ্রা.—সোডিয়াম সল্ট রূপে—ইনজেকশান ৫০ মি গ্রা. ভায়াল) (ঐ)—বায়োট্রেক্সেট, নিওট্রেক্সেট।

প্রোকারবাজাইন(ক্যাপসুল ৫০ মি গ্রা. হাইড্রোক্লোরাইড রূপে)

ভিনক্রিস্টিন (ইনজেকশানের পাউডার, ১ মি গ্রা. ৫ মি গ্রা. ভায়াল — সালফেট) (ঐ)—রিক্রিস্টিন, নিওক্রিস্টিন, ভিনক্রিস্টিন-বায়োকেম, ভি. সি আর।

৯। পারকিনসনিজ্‌ম্-এর ওষুধ—

বাইপেরিডেন (ট্যাবলেট, ২ মি গ্রা. হাইড্রোক্লোরাইড ; ইনজেকশান, ৫ মি গ্রা., ল্যাকটেট)—এই উপাদান নয়, একই ধরনের কাজের অন্য উপাদান (atropine like drug) দিয়ে ডিসিপাল, কেমাড্রিন, পারবেঞ্জ ইত্যাদি নামে ওষুধ পাওয়া যায়।

লিভোডোপা + কারবিডোপা(ট্যাবলেট ১০০ মি গ্রা. + ১০ মি গ্রা., ২৫০ মি গ্রা. + ২৫ মি গ্রা.) (চিকিৎসার নির্দেশ বিধি মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা থাকা এবং ওষুধের ক্রিয়াশীলতা পরীক্ষা করা দরকার।)

লিভোডোপা(ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ২৫০ মি গ্রা.) (আগের ওষুধগুলি পাওয়া না গেলে বা সরবরাহ না থাকলে ব্যবহার করা যায়)—লিভোপা, এলডোপাল।

১০। রক্তের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী ওষুধ—

(১) রক্তাল্পতার ওষুধ—

ফেরাস সল্ট (ট্যাবলেট-৬০ মি গ্রা লৌহ উপাদানের সমান—সালফেট বা ফিউমারেট রূপে ; মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ—০.৬ মি লি-এ ১৫ মি গ্রা. লৌহ উপাদানের সমান—সালফেট রূপে)—নোরি-এ, ফারসোলেট। (কয়েকশো তথাকথিত টনিকের অন্যতম উপাদান হিসেবে ফেরাস সল্ট রয়েছে, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকরভাবে সাথে মেশান আছে নানা ভিটামিন ও অন্যান্য মালকড়ি ; কিন্তু শুধু ফেরাস সল্ট দুর্লভ।)

ফলিক এ্যাসিড(ট্যাবলেট, ১ মি গ্রা. ইনজেকশান, ১ মি গ্রা.—সোডিয়াম সল্ট—১ মি লি. এ্যাম্পুল) (অ্যাজাথিওপ্রিনের অনুরূপ)— (এককভাবে ফলিক এ্যাসিড

দুর্লভ ; কিন্তু অজস্র টনিক-ভিটামিন ক্যাপসুলের অন্যতম উপাদান এটি।)

হাইড্রোক্সোবালামিন (ইনজেকশান, ১ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল) (ঐ)—(এককভাবে দুর্লভ ; নিউরাবল-এইচ-এ এ্যানাবলিক স্টেরয়েড ও ভিটামিন বি-১-এর সাথে মিশিয়ে বিক্রি হয়। আর সায়ানোকোবালামিন বা ভিটামিন বি-১২ হিসেবে অজস্র টনিকের অন্যতম উপাদান।)

ফেরাস সল্ট + ফলিক এ্যাসিড (ট্যাবলেট, ৬০ মি গ্রা + ২০০ মাইক্রোগ্রা) (বিরল, ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে)—ফেফল স্প্যানসুল, ফেরোস্টান লঙ্গিউল্‌স্ (১৫০ মি গ্রা + ৫০০ মাইক্রোগ্রাম), ফলভ্রন-এফ (১৯৪ মি গ্রা + ১৭০০ মাইক্রোগ্রাম)। (শুধু এ দুটির মিশ্রণ বাজারে কমই পাওয়া যায়, তবে অজস্র টনিকের অজস্র উপাদানের অন্যতম দুটি হিসেবে এরা রয়েছে। আর যে দু'একটি রয়েছে তাতে এদের মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণও লক্ষণীয়।)

আয়রন ডেক্সট্রান(ইনজেকশান ২ মি লি এ্যাম্পুল—প্রতি মি লি-এ ৫০ মি গ্রা লৌহ উপাদানের সমান) (চিকিৎসার নির্দেশ বিধি মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার ; আগের ওষুধগুলি কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত হলে তখন ব্যবহার করা যায়)—ইমফেরন।

(২) রক্তের জমাট বাঁধা রোধ করার ও ক্রিয়ানাশক ওষুধ (anticoagulants and antagonists)—

হেপারিন (ইনজেকশান ১০০০ ই ই, ৫০০০ ই ই, ২০০০০ ই ই প্রতি মি লি-এ ; ১ মি লি এ্যাম্পুল)—হেপারিন।

ফাইটোমিনাডিয়ন (ইনজেকশান—১০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ ৫ মি লি এ্যাম্পুল) — (ভিটামিন-কে। এককভাবে দুর্লভ। বহু ওষুধে মিশাল দিয়ে রয়েছে। আর অপ্রয়োজনীয়ভাবে বহু টনিকের অন্যতম উপাদানও এটি।)

প্রোটামিন সালফেট(ঐ) (এ্যাজাথিওপ্রিন-এর অনুরূপ)

ওয়ারফারিন (ট্যাবলেট ৫ মি গ্রা—সোডিয়াম সল্ট) (এ্যাজাথিওপ্রিনের অনুরূপ ; ওষুধের ক্রিয়াশীলতা পরীক্ষা করা দরকার)—ইউনিওয়ার্ফিন।

১১। রক্তজাত উপাদান ও রক্তের বিকল্প—

(১) প্লাজমা (রক্তরস)-এর বিকল্প—

ডেক্সট্রান৭০ (ইনজেকশানের দ্রবণ ৬%)

(২) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য প্লাজমা উপাদান—

মানবদেহের স্বাভাবিকএ্যালবুমিন(ইনজেকশানের সলিউশান ২৫%)

এ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (Factor VIII) (শুষ্ক) (অ্যাজাথিওপ্রিনের অনুরূপ ; প্রয়োগ সীমিত, বিরল ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য।)

(৩) প্লাজমার বিকল্প—

ফ্যাক্টর ix কমপ্লেক্স (Coagulation factors II, VII, IX, X Concentrate) (এণ্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর-এর অনুরূপ)

(২) ও (৩)-এর জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দিষ্ট নির্দেশ-বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে।

১২। হৃদরোগের ওষুধ—

(১) এনজাইনার ওষুধ—

গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট (ট্যাবলেট, ০.৫ মি গ্রা—জিভের নীচে রাখার জন্য)—এঞ্জিসেড।

আইসোসর্বাইড ডাইনাইট্রেট (ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা—জিভের নীচে রাখার জন্য)—আইসোম্যাক রিটার্ড, আইসর্ডিল, সর্বিটেট।

প্রোপ্রানলল(হাইড্রোক্লোরাইড ; ট্যাবলেট, ১০ মি.গ্রা., ৪০ মি গ্রা. ; ইনজেকশান, ১ মি গ্রা, ১ মি লি এ্যাম্পুল)—বিটাব্লক ফোর্ট, বিটানল, সিপলার, কার্ডিওলং, ইণ্ডেরাল, করবিটা, প্রোনোল—৪০, বিটালং।

ভেরাপামিল(ট্যাবলেট, ৪০ ও ৮০ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড—ইনজেক্শান, ২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ, ২ মি লি এ্যাম্পুল)—ভেরাপ্রিম, আইসপ্টিন, ভেসোপ্টেন, ভেরাট্রিল, ভেরামিল, কার্ডিলক্স ৪০, ৮০।

(২) ছন্দবৈষম্য (এ্যারিদ্‌মিয়া)-র জন্য—

আইসোপ্রেনালিন(ট্যাবলেট, ১০ মি গ্রা ১৫ মি গ্রা ; হাইড্রোক্লোরাইড বা সালফেট)— নিওএপিনিন, আইসোপ্রিন।

লিডোকেইন (ইনজেকশান, ২৫ মি গ্রা প্রতি মিলি-এ, ৫ মি লি এ্যাম্পুল)—জেসিকার্ড, জাইলোকার্ড।

প্রোকেনামাইড (হাইড্রোক্লোরাইড ; ট্যাবলেট, ২৫০ ও ৫০০ মি গ্রা. ; ইনজেকশান, ১০০মি গ্রা প্রতিমি লি-এ—১০মি লি এ্যাম্পুল)—প্রনেস্টিল।

প্রোপ্রানলল(আগেই বলা হয়েছে)

কুইনিডিন (ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা সালফেট) (আগের ওষুধগুলো যখন পাওয়া যায় না বা বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়, তখন ব্যবহার করা

যায়)—কুইনিডিন, (ন্যাটকার্ডিন)।

(৩) উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ—

হাইড্রালাজিন(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড)—জিনেপ্রেস।

হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা)—এসিড্রেক্স।

প্রোপ্রানলল (ট্যাবলেট ৪০, ৮০ মি গ্রা, হাইড্রোক্লোরাইড)

সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড(ইনফিউশান তৈরীর পাউডার ; ৫০ গ্রামের এ্যাম্পুল)

মিথাইল ডোপা(ট্যাবলেট, ২৫০ মি গ্রা) (কুইনিডিন-এর অনুরূপ, ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট)—এ্যালডোমেট, কিউবিডোপা, ডোপাজিট, এমডোপা, মেলডোপা।

রিসার্পিন(ট্যাবলেট, ০.১ মি গ্রা, ০.২৫ মি গ্রা ; ইনজেকশান ১ মি গ্রা, ১ মি লি, এ্যাম্পুল) (আগের ওষুধগুলির সরবরাহ না থাকলে ব্যবহার করা যায় ; ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট)—সার্পাসিল। (এ ছাড়া ডাইহাইড্রালাজিনের ও অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে এ্যাডেলফেন, এ্যাডেলফেন এসিড্রেক্স, এ্যালট্রিপ, ব্রিনার্ডিন, সার্পাসিল, টার্বোলেন, জেনোফেন, হাইথালটন-আর, নেফ্রিল-আর, সার্পালজিনো ইত্যাদি হরেক নামে পাওয়া যায়।)

(৪) কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস—

ডিগোক্সিন(ট্যাবলেট, ০.০৬২৫ মি গ্রা, ০.২৫ মি গ্রা ; মুখে খাবার দ্রবণ, ০.০৫ মি গ্রা, প্রতি মি লি-এ ; ইনজেকশান, ০.২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ—২ মি লি এ্যাম্পুল) (কিডনি ঠিকমত কাজ না করলে ওষুধটি বাদ দিতে হবে বা ডোজ ঠিক করতে হবে)—কার্ডিওক্সিন, ল্যানোক্সিন।

ডিজিটক্সিন (ট্যাবলেট, ০.০৫ মি গ্রা ০.১ মি গ্রা ; মুখে খাবার দ্রবণ, ১ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ ; ইনজেকশান, ০.২ মি গ্রা, ১ মি লি এ্যাম্পুল) (আগের ওষুধ কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে ব্যবহার করা যায় ; ওষুধের ক্রিয়াশীলতা পরীক্ষা করা দরকার।)

(৫) শক্ বা এ্যানাফাইল্যাক্সিসের জন্য—

ডোপামিন (হাইড্রোক্লোরাইড ; ইনজেকশান, ৪০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ, ৫ মি লি ভায়াল) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন)—ডোপামিন।

এপিনেফ্রিন(হাইড্রোক্লোরাইড রূপে, ইনজেকশান ১ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল)

১৩। চর্ম রোগের ওষুধ—

(১) ফাংগাস জনিত রোগের জন্য—

বেঞ্জোইক এ্যাসিড + স্যালিসিলিক এ্যাসিড (মলম বা ক্রীম, ৬% + ৩%) —(মাইকোডার্ম—ক্যাম্ফর, মেন্থল্ ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে।)

মাইকোনাজোল (মলম বা ক্রীম, ২%, নাইট্রেট)—ড্যাক্টারিন, ডেকানাজোল, মাইকোজেল, জোল।

(২) সংক্রমণ নাশক ওষুধ—

নিওমাইসিন + বেসিট্রাসিন (মলম, ৫ মি গ্রা নিওমাইসিন সালফেট—৫০০ ই ই বেসিট্রাসিন জিংক—প্রতি গ্রাম মলমে)—(শুধু এদুটির মিশ্রণ চামড়ার মলম আকারে দুর্লভ। অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে নেবাসালফ, নেপোডেক্স, নিওস্পোরিন ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়।)

(৩) প্রদাহ ও চুলকুনির ওষুধ—

বিটামিথাসোন (মলম বা ক্রীম, ০.১% —ভ্যালিয়েট রূপে) (অধিকতর কার্যকরী)—বেটনোভেট, (বেঞ্জোয়েট রূপে-টপিকাসোন)।

ক্যালামিন লোশন (লোশন)—ক্যালামিন লোশন, একোয়ামিনল, ক্যালামিনল, ক্যালামিল, (অন্যান্য পদার্থের সাথে মিশিয়ে—হিস্টাক্যালামিন, ক্যালাড্রিল, ক্যালাক্রিম)।

হাইড্রোকর্টিসোন (মলম বা ক্রীম—১%, এ্যাসিটেট)—লাইকর্টিন, ওয়াইকর্ট। (প্রায়শঃই অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনকভাবে, অন্যান্য নানা উপাদানের সাথে মিশিয়ে অজস্র নামে পাওয়া যায়, যেমন ক্লোরোকর্ট, সোফ্রাকর্ট, মেডিথেন, ইত্যাদি।)

(৪) এ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ওষুধ—

এ্যালুমিনিয়াম এ্যাসিটেট (দ্রবণ—১৩%, পাতলা করার জন্য)

(৫) কেরাটোপ্লাস্টিক ও কেরাটোলাইটিক—

কোলটার (দ্রবণ, স্থানীয় ভাবে ২০%)—অন্য পদার্থের সাথে মিশিয়ে—ডেরোবিন স্কিন)

স্যালিসিলিক এ্যাসিড (দ্রবণ, স্থানীয় ভাবে ৫%)—কর্ণাক (১৬.৫%)। (আরো নানা পদার্থের সাথে মিশিয়ে—কেরাসল, কেরালিন, ডেরোবিন স্কিন, কে-৫ হেয়ার টিংচার।)

(৬) খোসপাঁচড়া ও উকুনের জন্য—

বেঞ্জাইল বেঞ্জোয়েট (লোশন, ২৫%)—এ্যাসকাবিয়ল, স্ক্যাবিসিডল। (অন্য পদার্থের সাথে মিশিয়ে—ডার্মোস্ক্যাব, বেঞ্জোস্ক্যাব।)

লিনডেন (মলম বা লোশন, ১০%)*

১৪। বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য পদার্থ (diagnostic)—

এড্রোফোনিয়াম(ইনজেকশান, ১০ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল—ক্লোরাইড) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়, বিশেষ সরঞ্জাম ও সীমিত প্রয়োগ দরকার)।

টিউবারকুলিন(পরিশোধিত প্রোটিনজাত—PPD)

(১) চোখের জন্য—

ফ্লুওরেসিন(চোখের ফোঁটা—১০%, সোডিয়াম সল্ট)

(২) এক্সরে করার জন্য—

এডিপাইওডোন মেগ্‌লুমাইন(ইনজেকশান, ২৫%, ২০ মি লি ভায়াল)

বেরিয়াম সালফেট(পাউডার)

আইওপেনয়েক এ্যাসিড(ট্যাবলেট ৫০০ মি গ্রা)—সিস্টোবিল, টেলিপেক।

মেগ্‌লুমাইন এমিডোট্রাইজয়েট(ইনজেকশান, ৬০%, ২০ মি লি এ্যাম্পুল)—(আয়োডোফিল ভিসকাস।)

১৫। ডিসইনফেকট্যাণ্ট—

ক্লোরহেক্সিডিন(দ্রবণ, ৫%—গ্লুকোনেট, পাতলা করার জন্য)—(স্যাভলন—সেট্রিমাইডের সাথে মিশিয়ে।)

আয়োডিন(দ্রবণ, ২.৫%)

১৬। মূত্র বর্ধক ওষুধ—

এমিলোরাইড (ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড)—(বিডুরেট — হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড-এর সাথে মিশিয়ে।)

ফুরোসেমাইড(ট্যাবলেট, ৪০ মি গ্রা ; ইনজেকশান ১০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ ২ মি লি এ্যাম্পুল)—কিউরিমাইড, ফ্রুসেনেক্স, ল্যাসিক্স, স্যালিনেক্স।

হাড্রোক্লোরথায়াজাইড(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা)—এসিড্রেক্স।

* আগে একে গ্যামাক্সিন বা গামা বেঞ্জিন হেকসাক্লোরাইড হিসেবে অভিন্নরূপে গণ্য করা হত। এটি—লোরিয়েল, গ্যাব, গ্যামাডার্ম, এম্‌স্ক্যাব ইত্যাদি নামের ওষুধে রয়েছে।

ম্যানিটল (ইনজেকশান দেওয়ার দ্রবণ, ১০%, ২০%)

স্পাইরোনোল্যাকটোন(ট্যাবলেট, ২৫ মি গ্রা.)—এ্যালডাকটোন।

ক্লোরথালিডোন(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা.) (আগের ওষুধগুলি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে দেওয়া যাবে। ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার।)—হাইথালটোন।

১৭। পরিপাক তন্ত্রের ওষুধ—

(১) এ্যাণ্টাসিড ও আলসারের অন্যান্য ওষুধ—

এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড (ট্যাবলেট, ৫০০ মি গ্রা ; মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ—৩২০ মি গ্রা. প্রতি মি লি-এ)—এ্যালুড্রক্স। (এছাড়া অম্লনাশক অজস্র ওষুধে এটি অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।)

সাইমেটিডিন(ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা. ; ইনজেকশান, ২০০ মি গ্রা ২ মি লি এ্যাম্পুল)—সাইমেটিডিন-সিপলা, সাইমেটিডিন-ফ্রাংকো, সাইমেটিডিন-আই ডি পি এল, ডব্লুকে-সাইমেটিডিন।

ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড(মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ, ৫০০ মি গ্রা. ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের সমান প্রতি ১০ মি লি-এ)—(এককভাবে দুর্লভ, কিন্তু অন্যান্য নানা উপাদানের সাথে মিশিয়ে অজস্র নামে পাওয়া যায়।)

ক্যালসিয়াম কার্বোনেট(ট্যাবলট, ৫০০ মি গ্রা.) (আগের ওষুধগুলি যখন পাওয়া যায় না কিংবা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত, তখন ব্যবহার করা যাবে)—(এককভাবে পাওয়া যায় না, অন্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে নানা নামে পাওয়া যায়।)

(২) বমি বন্ধের ওষুধ—

প্রোমেথাজিন (হাইড্রোক্লোরাইড ; ট্যাবলেট, ১০ মি গ্রা., ২৫ মি গ্রা ; সিরাপ ৫ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ ; ইনজেকশান, ২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ, ২ মি লি.এ্যাম্পুল)—ফেনারগান।

মেটোক্লোপ্রমাইড (ট্যাবলেট, ১০ মি গ্রা. হাইড্রোক্লোরাইড রূপে) (ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য।)—ম্যাক্সেরন, পেরিনর্ম, টোমিড, ইমেনিল, ইমাক্সল, কোলান।

(৩) অর্শের জন্য—

লোকাল এ্যানেসথেটিক, এস্ট্রিনজেণ্ট ও প্রদাহরোধী ওষুধ ; মলম বা সাপোজিটরি—এনোভেট, প্রক্টোসেডিল, আলট্রাপ্রক্ট, নিউপারকেইনাল।

(৪) অন্ত্রের সংকোচন জনিত ব্যথার জন্য (Antispasmodic)—

এট্রোপিন (সালফেট ; ট্যাবলেট ১ মি গ্রা ; ইনজেকশান, ১ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল)—এট্রোপিন ইনজেকশান। (এছাড়া নানা উপাদানের সাথে মিশিয়ে নানা নামে পাওয়া যায়।)

(৫) বিরেচক (Cathartic) ওষুধ—

সেন্না (ট্যাবলেট, ৭৫ মি গ্রা., সেনোসাইড্‌স্)—গ্ল্যাক্সেনা, পার্সেনিড-ইন, (মিশ্রিত অবস্থায় থাকে ল্যাক্সেটিন, ইভাকুওল, হেলমাসিড-সেন্না, এ্যান্টিপার উইথ ল্যাক্সেটিভ, পিপসেন্না ইত্যাদিতে)।

(৬) ডায়ারিয়ার জন্য ওষুধ—

(ক) লক্ষণগত—

কোডেইন (ট্যাবলেট, ৩০ মি গ্রা., ফসফেট) (মরফিনের অনুরূপ)—(এককভাবে দুর্লভ। তবে ব্যথা কমানোর, কাশি ও শ্বাসকষ্টের নানা ওষুধের সাথে মিশিয়ে নানা নামে বিক্রি হয়।)

(খ) প্রতিস্থাপক দ্রবণ—

গ্লুকোজ-স্যালাইন—সোডিয়াম ক্লোরাইড ৩.৫ গ্রা প্রতি লিটারে
—সোডিয়াম বাইকার্বনেট ২.৫ ,,
—পটাসিয়াম ক্লোরাইড ১.৫ ,,
—গ্লুকোজ ২০ ,,

১৮। হরমোন—

(১) এড্রেনাল হরমোন ও তার কৃত্রিম বিকল্প—

ডেক্সামেথাসোন (ট্যাবলেট, ০.৫ মি গ্রা, ৪ মি গ্রা ; ইনজেকশান, ৪ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল—সোডিয়াম ফসফেট)—ডেকাড্রন, ডেক্সাসল, ডেক্সোনা, আইডিজোন, ওয়াইমেসোন।

হাইড্রোকর্টিসোন (ইনজেকশানের পাউডার ১০০ মি গ্রা ভায়াল—সোডিয়াম সাক্সিনেট রূপে)—লাইকর্টিন-এস, ওয়াইকর্ট (এ্যাসিটেট)।

প্রেডনিসোলোন (ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা)—ওয়াইসোলোন, হস্টাকর্টিন-এইচ, (ডেলট্রাকর্টিল ফোর্ট—১০ মি গ্রা)।

ফ্লুড্রোকর্টিসোন (ট্যাবলেট, ০.১ মি গ্রা—এ্যাসিটেট) (বিরল ক্ষেত্রে কিংবা ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য।) (অত্যন্ত ক্ষতিকরভাবে, অজস্র ওষুধে এড্রেনাল হরমোন ও তার কৃত্রিম বিকল্প মেশান আছে।)

(২) এণ্ড্রোজেনস—

টেস্টোস্টেরোন (ইনজেকশান, ২০০ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল—প্রোপিওনেট) (ডোপামিন-এর অনুরূপ ;)—টেস্টানন ২৫, টেস্টোভাইরন (অনাবশ্যকভাবে ভিটামিন ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে আরো নানা নামেও পাওয়া যায়।)

(৩) ইস্ট্রোজেনস—

ইথিনিল ইস্ট্রাডিয়ল(ট্যাবলেট, ০.০৫ মি গ্রা)—লাইনোরাল।

(৪) ইনসুলিন ও ডায়াবিটিসের ওষুধ—

কম্পাউণ্ড ইনসুলিন জিংক সাসপেনশান(ইনজেকশান, ৪০ ই ই প্রতি মি লি-এ ১০ মি লি ভায়াল ; ৮০ ই ই প্রতি মি লি-এ ১০ মি লি ভায়াল)

ইনসুলিন ইনজেকশান (ঐ)

গ্লাইবেনক্লেমাইড(ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা)—বিটানেজ, ডাওনিল, ইউগ্লুকন, ইডিমাইড।

(৫) জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য খাওয়ার বড়ি—

ইথিলিন ইস্ট্রাডিয়ল+লিভো-নরজেস্ট্রেল(ট্যাবলেট, ০.০৩ মি গ্রা + ০.১৫ মি গ্রা ; ০.০৫ মি গ্রা + ০.২৫ মি গ্রা)--(ডুওলুটন, ওভরাল ;প্রাইমোভলার-৩০ —এসবে নরজেস্ট্রেল আছে ০.০৩-০.৫ মি গ্রা ; এত বেশী মাত্রা ক্ষতিকর।)

ইথিলিন ইস্ট্রাডিয়ল + নরএথিস্টেরোন (ট্যাবলেট ; ০.০৫ মি গ্রা + ১.৫ মি গ্রা)—মিনভ্লার-ই ডি, অরলেষ্ট-২৮, (ওরাস্যাক্রন ফোর্ট-এ এথিস্টেরোন আছে ৫০ মি গ্রা)।

নরএথিস্টেরোন(ট্যাবলেট ; ০.৩৫ মি গ্রা) (আগের ওষুধগুলি কোন বিশেষ মহিলার ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে)—(প্রাইমোলুট-এন ; কিন্তু এতে এটি আছে ৫ মি গ্রা -ক্ষতিকরভাবে বেশী পরিমাণে।)

(৬) ডিম্বস্ফোটন (ovulation) সহায়ক ওষুধ—

ক্লোমিফিন(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা—সাইট্রেট) (নিফারটিমোক্স-এর অনুরূপ ; ৬।(৯) দ্রষ্টব্য)—ফার্টোমিড, ফার্টোট্যাব, ইণ্ডোভুলাল, সেরোফিন।

(৭) প্রজেস্টোজেনস—

নরএথিস্টেরোন(ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা)—প্রাইমোলুট-এন।

(৮) থাইরয়েড হরমোন ও এণ্টি থাইরয়েড ওষুধ—

লিভোথাইরোক্সিন (ট্যাবলেট ০.০৫ মি গ্রা ; ০.১ মি গ্রা—সোডিয়াম সল্ট)—এলট্রক্সিন।

পটাসিয়াম আয়োডাইড(ট্যাবলেট ; ৬০ মি গ্রা.)

প্রপাইল থায়োইউরাসিল(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা.)

১৯। প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত—

(১) রক্তরস ও ইমিউনো গ্লোবিউলিনস—

এ্যান্টি-ডি ইমিউনোগ্লোবিউলিন(মানবদেহজাত) (ইনজেকশান, ০.২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ)

এ্যান্টিরেবিস হাইপার ইমিউন সিরাম (ইনজেকশান, ১০০০ ই ই, ৫ মি লি এ্যাম্পুল)

এ্যান্টিভেনম সিরাম(ইনজেকশান)

ডিপথেরিয়া এ্যান্টিটক্সিন(ইনজেকশান, ১০০০০ ও ২০০০০ ই ই—ভায়াল)

ইমিউনো গ্লোবিউলিন(মানবদেহজাত, স্বাভাবিক ; যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন) (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী)

টিটেনাসএ্যান্টিটক্সিন(ইনজেকশান, ৫০০০০ ই ই, ভায়াল)

(২) প্রতিষেধক টীকা (ভ্যাক্সিন)

(ক) সর্বজনীন (universal immunisation)—

বি. সি. জি. ভ্যাক্সিন(শুষ্ক) (ইনজেকশান)

ডিপথেরিয়া-হুপিংকাশি-টিটেনাসেরভ্যাক্সিন(ট্রিপল্ এ্যান্টিজেন) (ইনজেকশান)

হামের ভ্যাক্সিন(ইনজেকশান)

পোলিওর ভ্যাক্সিন(লিভ এ্যাটেনুয়েটেড) (মুখে খাওয়ার দ্রবণ)

টিটেনাসের ভ্যাক্সিন(ইনজেকশান)

(জৈব উপাদান সম্পর্কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার যে বিশেষ বিধি রয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে)

(খ)নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য—

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাক্সিন(ইনজেকশান)

মেনিন্‌গোকক্কাল ভ্যাক্সিন (,,)

জলাতঙ্কের ভ্যাক্সিন (,,)

টাইফয়েড ভ্যাক্সিন (..)

ইয়েলো ফিভার ভ্যাক্সিন (..)

২০। মাস্‌ল রিলাকসান্ট ও কলিনএস্টারেজ ইনহিবিটর—

নিওস্টিগমিন (ট্যাবলেট, ২৫ মি গ্রা ব্রোমাইড ; ইনজেকশান, ০.৫ মি গ্রা., ১ মি লি এ্যাম্পুল—মেটিল সালফেট)—প্রস্টিগ্‌মিন।

গ্যালামিন (ইনজেকশান, ৪০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ, এ্যাম্পুল, ট্রাইইথিওডাইড) (যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন)—ফ্লাক্সেডিল।

সাক্সামেথোনিয়াম (ইনজেকশান, ৫০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ ক্লোরাইড, ২ মি লি এ্যাম্পুল) (ঐ)

পিরিডোস্টিগমিন (ব্রোমাইড : ট্যাবলেট, ৬০ মি গ্রা ; ইনজেকশান, ১ মি লি এ্যাম্পুল) (ক্রোমোগ্লাইসিক এ্যাসিড-এর অনুরূপ ; ২৫। (১) দ্রষ্টব্য)

২১। চোখের রোগের ওষুধ—

(১) সংক্রমণ রোধী—

সিলভার নাইট্রেট (আই ড্রপ, ১%)

সালফাসিটামাইড (চোখের মলম, ১০% ; আই ড্রপ, ১০% ;—সোডিয়াম সল্ট)—এলবুসিড, লোকুলা।

টেট্রাসাইক্লিন (চোখের মলম, ১%, হাইড্রোক্লোরাইড)—এলসাইক্লিন আই, এ্যাক্রোমাইসিন আই, টেরামাইসিন অপথ্যালমিক, রেষ্টেক্লিন অপথ্যালমিক।

(২) প্রদাহরোধী—

হাইড্রোকর্টিসোন (চোখের মলম, ১%, এসিটেট) (বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট রয়েছে ; যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন)—লাইকর্টিন আই অয়েন্টমেণ্ট, (এলোকর্ট ড্রপ)।

(৩) লোকাল এ্যানেস্‌থেটিক—

টেট্রাকেইন (আই ড্রপ, ০.৫%, হাইড্রোক্লোরাইড)

(৪) মায়োটিক—

পাইলোকার্পিন (আই ড্রপ, ২%, ৪%, হাইড্রোক্লোরাইড বা নাইট্রেট)—পাইলোকার, কার্পো-মায়োটিক।

(৫) মিড্রিয়াটিক—

হোমাট্রোপিন(আই ড্রপ, ২%, হাইড্রোব্রোমাইড)—বেল-হোমাট্রোপিন আই।

এপিনেফ্রিন(আই ড্রপ, ২%, হাইড্রোক্লোরাইড রূপে) (ক্যালসিয়ামকার্বোনেটের অনুরূপ ; এবং ডোপামিনের অনুরূপ.)—(পিউপিলেটো ফোর্ট ; এতে ফিনাইল এফ্রিন আছে ১০%।)

(৬) খাওয়ার ওষুধ—

এসিটাজোলামাইড(ট্যাবলেট, ২৫০ মি গ্রা.)—ডায়ামক্স।

২২। প্রসবত্বরক (oxytocic)—

আর্গোমেট্রিন(ম্যালিয়েট ; ট্যাবলেট, ০.২ মি গ্রা ; ইনজেকশান ০.২ মি গ্রা., ১ মি লি এ্যাম্পুল)—ইনগাজেন-এম (মিথাইল আর্গোনভিন ম্যালিয়েট থাকে মেথার্জিন, মেথেরন ইত্যাদিতে)।

অক্সিটোসিন(ইনজেকশান, ১০ ই ই, ১ মি লি এ্যাম্পুল)—পিটোসিন (০.৫ মি লি এ্যাম্পুল সিণ্টোসিনন (২ বা ৫ ই ই যুক্ত এ্যাম্পুল)।

২৩। পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের জন্য—

ইনট্রাপেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস সলিউশান(যথাযথ উপাদান সহ) (Paren -teral solution)

২৪। মানসিক রোগের জন্য—

এমিট্রিপটিলিন (ট্যাবলেট, ২৫ মি গ্রা., হাইড্রোক্লোরাইড)—এ্যামিলিন, এ্যার্মিট্রিন, ট্রিপটানল, কোয়েটাল।

ক্লোরপ্রমাজিন (হাইড্রোক্লোরাইড ; ট্যাবলেট, ১০০ মি গ্রা ; সিরাপ ২৫ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ ; ইনজেকশান, ২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ ২ মি লি এ্যাম্পুল)—ক্লোরপ্রোমাজিন হাইড্রোক্লোরাইড, লার্গাক্টিল।

ডায়াজিপাম (ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা.)—ক্যামড, ক্যাম্পোজ, প্যাসিকুইল, প্যাক্সাম, সোমাটিন, ভ্যালিয়াম।

ফ্লুফেনাজিন (ইনজেকশান, ২৫ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল, ডেকানোয়েট বা, এনানটেট) (চিকিৎসার নির্দেশবিধি মেনে চলার উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার)—এ্যানাটেনসল।

হ্যালোপেরিডল (ট্যাবলেট ২ মি গ্রা ; ইনজেকশান, ৫ মি গ্রা., ১ মি লি এ্যাম্পুল)—হ্যালিডল, ডেপিডল, সেরিনেস।

লিথিয়াম কার্বনেট(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট, ৩০০ মি গ্রা) (হাইড্রোকর্টিসোনের

অনুরূপ, এবং কিডনি ঠিকমত কাজ না করলে বাদ দিতে হবে বা ডোজ ঠিক করতে হবে)—লাইক্যাব, লিথোকার্ব (১৫০ মি. গ্রা.)।

২৫। শ্বাসতন্ত্রের ওষুধ—

(১) হাঁপানির জন্য

এ্যামাইনোফাইলিন(ট্যাবলেট, ২০০ মি গ্রা ; ইনজেকশান ২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি -এ ১০ মি লি এ্যাম্পুল)—(একক ভাবে দুর্লভ, মিশাল দিয়ে অজস্র ওষুধে রয়েছে।)

এপিনেফ্রিন(হাইড্রোক্লোরাইড রূপে, ইনজেকশান ১ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল)

স্যালবুটামল(ট্যাবলেট, ৪ মি গ্রা সালফেট ; মুখে লাগিয়ে শ্বাসে নেওয়ার জন্য প্রতি মাত্রায় ০.১ মি গ্রা ; সিরাপ ২ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ, সালফেট)—এ্যাজমানিল, এ্যাসথালিন, ব্রংকোসিরাপ, ব্রংকোট্যাব, ব্রোনোসল —৪, স্যালবেটল, ক্রয়সাল, স্যাল্‌মাপ্‌লন।

বেক্লোমেটাসন(ডিপ্রোপাইওনেট ; মুখে লাগিয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্য ; প্রতি মাত্রায় ০.০৫ মি গ্রা.) (আগের ওষুধগুলি যখন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপযুক্ত তখন ব্যবহার করা যায় ; প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সীমিত)—বেক্লেটইনহেলার, ১৭-২১ এরোসল ইনহেলার।

ক্রোমোগ্লাইসিক এ্যাসিড(মুখে লাগিয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্য কার্ট্রিজ, প্রতি মাত্রায় ২০ মি গ্রা সোডিয়াম সল্ট) (বেক্লোমেটাসন-এর অনুরূপ এবং যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় ও বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন)

ইফেড্রিন(হাইড্রোক্লোরাইড রূপে—ট্যাবলেট, ৩০ মি গ্রা. ; তরল ওষুধ ১৫ মি গ্রা প্রতি ৫ মি লি-এ ; ইনজেকশান ৫০ মি গ্রা ১ মি লি এ্যাম্পুল, সালফেট) (আগের ওষুধগুলি যখন পাওয়া যায় না তখন ব্যবহার করা যায়)—(এককভাবে দুর্লভ। কিন্তু আরো নানা পদার্থের সাথে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকরভাবে মিশাল দিয়ে অজস্র বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়।)

(২) কাশির জন্য—

কোডিন (ট্যাবলেট, ১০ মি গ্রা ফসফেট) (মরফিনের অনুরূপ, পৃঃ **১৮৭**)—(এককভাবে দুর্লভ, কিন্তু নানা কিছুর সাথে মিশিয়ে অজস্র নামে বিক্রি হয়।)

২৬। জল, ইলেকট্রোলাইট ও এ্যাসিড-বেস-এর ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য ব্যবহার্য দ্রবণ—

(১) মুখে খাওয়ার—

ওরাল রিহাইড্রেশান সল্ট(গ্লুকোজ-লবণ দ্রবণের জন্য)

(উপাদানের জন্য ১৫ (৬) (খ) দ্রষ্টব্য)

পটাসিয়াম ক্লোরাইড(মুখে খাওয়ার দ্রবণ)

(২) পেশী বা শিরায় ইনজেকশান দিয়ে ব্যবহারের জন্য—

গ্লুকোজ(ইনজেকশানের যোগ্য ২৫%—আইসোটনিক, ৫০%—হাইপারটনিক)

সোডিয়াম ক্লোরাইড + গ্লুকোজ (৪% গ্লুকোজ + ০.১৮% সোডিয়াম ক্লোরাইড়—সোডিয়াম আয়ন ৩০ মিলিমোল ও ক্লোরাইড আয়ন ৩০ মিলিমোল প্রতি লিটারে ; ইনজেকশান)

পটাসিয়াম ক্লোরাইড(ইনজেকশান যোগ্য দ্রবণ)

সোডিয়াম বাইকার্বনেট (ইনজেকশান যোগ্য দ্রবণ, ১.৪%—আইসোটনিক, সোডিয়াম আয়ন ১৬৭ মিলিমোল ও বাইকার্বনেট আয়ন ১৬৭ মিলিমোল প্রতি লিটারে)

সোডিয়াম ক্লোরাইড (ইনজেকশানযোগ্য দ্রবণ, ০.৯%—আইসোটনিক ; সোডিয়াম আয়ন ১৫৪ মিলিমোল ও ক্লোরাইড আয়ন ১৫৪ মিলিমোল প্রতি লিটারে)

ওয়াটার ফর ইনজেকশান(২ মি লি, ৫ মি লি ও ১০ মি লি এ্যাম্পুল)

২৭। ভিটামিন ও মিনারেলস—

এ্যাসকরবিক এ্যাসিড(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা)—(ভিটামিন সি) সেলিন। (সঠিক নির্দেশ অনুযায়ী দুর্লভ। লিমসি, সর্ভিসিন, রেডোক্সন ইত্যাদিতে আছে ২০০ বা ৫০০ মি গ্রা করে। স্পষ্টতঃ অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত পরিমাণ দেওয়া আছে এবং দাম বাড়ান হয়েছে। সিকন, চিউসি, সিট্রাভাইট, সিটাসিন, সাক্‌সি ইত্যাদিতে সাথে মেশান আছে সোডিয়াম এ্যাসকর্বেট। এছাড়াও অজস্র ওষুধে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এটি মেশান থাকে।)

আর্গোক্যালসিফেরল(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট, ১২৫ মি গ্রা বা ৫০০০০ ই ই ; মুখে খাওয়ার দ্রবণ, ০.২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ, ১০০০ ই ই)—(ভিটামিন-ডি) (এককভাবে ও সঠিক নির্দেশ অনুযায়ী দুর্লভ। একক ভাবে আছে এ্যারাকিটল,ক্যালসিরল-এ,—৬০০০০০ ই ই। আর অসংখ্য ওষুধে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে মিশাল দিয়ে পাওয়া যায়।)

নিকোটিনামাইড(ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা)—(এককভাবে দুর্লভ। কিন্তু অসংখ্য ওষুধে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে মিশিয়ে রাখা আছে এবং প্রায় সর্বত্রই ১০০ মি

গ্রা. অর্থাৎ দিবগুণ পরিমাণে।)

পাইরিডক্সিন (ট্যাবলেট, ২৫ মি গ্রা—হাইড্রোক্লোরাইড)—(ভিটামিন বি-৬) (এককভাবে দুর্লভ, কিন্তু অসংখ্য ওষুধে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া আছে।)

রেটিনল(ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট, ৭-৫ মি গ্রা বা ২৫০০০ ই ই ; মুখে খাওয়ার দ্রবণ ; ১৫ মি. গ্রা. বা ৫০০০০ ই ই প্রতি মি লি-এ) (এর অভাবে চোখের রোগ বা জেরফ্থ্যালমিয়া হলে, তার চিকিৎসায় একক মাত্রায় ব্যবহার করা হলে ওষুধ দেবার ৪ মাস পার না হলে আবার তা দেওয়া যাবে না)—(ভিটামিন-এ) এরোভিট, একোয়াসল-এ, ক্যারোফ্রাল। (ভিটামিন-ডি, বি-কমপ্লেক্স বা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ভিটামিন-ই-এর সাথে মিশাল দিয়েও অসংখ্য নামে পাওয়া যায়।)

রাইবোফ্ল্যাবিন(ট্যাবলেট, ৫ মি গ্রা)—(ভিটামিন-২) লিপাবল। (কিন্তু অসংখ্য ওষুধে মিশাল দিয়ে পাওয়া যায়।)

সোডিয়াম ফ্লোরাইড (ট্যাবলেট, ০.৫ মি গ্রা) (ওষুধের প্রয়োগ সীমিত হওয়া উচিত)—ওটোফ্লোর (কিন্তু এর প্রতি ট্যাবলেটে সোডিয়াম ফ্লোরাইড থাকে ২০ মি গ্রা অর্থাৎ ৪০ গুণ বেশী)।

থায়ামিন (ট্যাবলেট, ৫০ মি গ্রা হাইড্রোক্লোরাইড)—(ভিটামিন বি-১) বেনালজিস, বিনিউরন, বিটাবায়ন, বেরিন। (এছাড়া অসংখ্য ওষুধে অন্যান্য ভিটামিন ইত্যাদির সাথে মিশাল দিয়ে বর্তমান।)

ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট(ইনজেকশান, ১০০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ ; ১০ মি লি এ্যাম্পুল) (ক্লোমিফিন-এর অনুরূপ ;)—(এককভাবে দুর্লভ, কিন্তু বহু ওষুধে অন্যান্য নানা পদার্থের সাথে মিশিয়ে থাকে। তবে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ-এ আছে শুধু ক্যালসিয়াম গ্লুকোনোগ্যালাকটো গ্লুকোনেট।)

•

এইখানেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রায় ২৫০টি প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা শেষ। কিন্তু যথাসম্ভব এর পরই ওষুধ কোম্পানির কাজ শুরু। বিভিন্ন দেশ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এর সাথে সংযোজন পরিবর্জন করতে পারেন।

যেমন আমাদের দেশে সরকার নিযুক্ত হাথী কমিটি বিভিন্ন উপাদানসহ মোট মাত্র ১১৭টি ওষুধের কথা বলেছিলেন (১৯৭৫)। এখন থেকে তের বছর আগে পেশ করা এই তালিকায় এমন কিছু ওষুধ রয়েছে যা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত তালিকায় নেই এবং এখন নানা দেশে বাতিল করা হয়েছে, যেমন গ্রাইপ ওয়াটার, এনালজিন, হাঁপানির ওষুধে ঘুমের ওষুধের মিশ্রণ, বোরিক এসিড, আমাশার জন্য

আয়োডোক্লোরো হাইড্রক্সি কুইনোলিন ইত্যাদি।হাথী কমিটির সুপারিশ করা এই ওষুধগুলি নিম্নরূপ (এদের মধ্যে চিকিৎসার প্রাথমিক কিছু সরঞ্জামও রয়েছে যেমন এডহেসিভ প্লাস্টার)—

পেনিসিলিন ইনজেকশান
বেঞ্জাইল পেনিসিলিন পি পি, ফর্টিফায়েড ইনজেকশান (প্রো:কেন বেঞ্জাইল পেনিসিলিন ৩ লক্ষ ইউনিট, বেঞ্জাইল পেনিসিলিন ১ লক্ষ ইউনিট)
টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড, ২৫০ মি গ্রা., ট্যাবলেট
টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড মলম (১%, জীবাণুমুক্ত ভিত্তি উপাদানে)
স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইনজেকশান
সালফাডিমিডিন ট্যাবলেট
সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপ
থায়াসিটাজোন ৩৭.৫ মি গ্রা., (BPC) ও আইসোনায়াজিড ৭৫ মি গ্রা (IP), ট্যাবলেট
নাইট্রোফুরাণ্টয়েন ট্যাবলেট
নাইট্রোফুরাজোন মলম (০.২%, চর্বিজাতীয় নয় এমন ভিত্তি উপাদানে)
ক্লোরামফেনিকল সাসপেনসান (১২৫ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ)
ক্লোরামফেনিকল, ২৫০ মি গ্রা ট্যাবলেট
ক্লোরোকুইন সালফেট, ০.২ গ্রা ট্যাবলেট (বা ফসফেট ০. ২৫ গ্রা., ট্যাবলেট)
প্রাইমাকুইন ডাইফসফেট ট্যাবলেট (২.৫ গ্রাম প্রাইমাকুইন)
ড্যাপসোন, ৫০ মি গ্রা ট্যাবলেট
ব্লীচিং পাউডার
বোরিক এসিড-এলকোহল-গ্লিসারল ড্রপ (বোরিক এসিড ১.৫% ; গ্লিসারল ৩.৫% — ৯৫% এলকোহলে ; ১০ মি লি)
কার্বলিক এ্যাসিড
সেট্রিমাইড লোশন
আয়োডোক্লোরো হাইড্রক্সি কুইনোলিন, ৫০০ মি গ্রা., ট্যাবলেট
মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট
আয়োডিন (resublimated) ৪% ও মিথাইল স্যালিসিলেট ৫% মলম
আয়োডিন দ্রবণ (ক্লডিয়াম দ্রবণ)—ক্যাটগাট, লুপ ইত্যাদি পরিস্কার করার জন্য (আয়োডিন-১ গ্রাম, পটাসিয়াম আয়োডাইড ১.৫ গ্রাম, ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার ১০০ মি লি পর্যন্ত)

টিংচার আয়োডিন
ডাইইথাইল কার্বামাজিন সাইট্রেট ৫০ মি গ্রা., ট্যাবলেট,

ফিনাইল
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ৫ গ্রামের প্যাকেট
লাইজল
এন্টিডিফথেরিয়া সেরাম, ইনজেকশান
এন্টিটিটেনাস সেরাম, ইনজেকশান
এন্টি ভেনম সেরাম, ইনজেকশান (পলিভ্যালেণ্ট)
টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকশান
ডিফথেরিয়া টক্সয়েড, ইনজেকশান
ইমেটিন হাইড্রোক্লোরাইড, ইনজেকশান
বেঞ্জাইল বেঞ্জোয়েট ইমালসান
ইউক্যালিপটাস তেল ৮%, ক্লোভ অয়েল ১%, ক্যামফর ৫%, মেনথল ৩%, থাইমল ২%, মিথাইল স্যালিসিলেট ৫% মলম
হুইটফিল্ড মলম (বেঞ্জোইক এসিড ৬ গ্রাম, স্যালিসিলিক এসিড ৩২ গ্রাম, এলকোহল ৭০% মোট ১০০ গ্রাম)
পোলিওর টীকা মুখে খাওয়ার
ডিফথেরিয়া-হুপিংকাশি-টিটেনাস-এর টীকা
আই এন এইচ, ট্যাবলেট
প্যাস, গ্র্যানিউল
প্যারাসিটামল সিরাপ (১২৫ গ্রাম প্রতি মি লি-এ)
এনালজিন, ট্যাবলেট
এস্পিরিন, ট্যাবলেট
এট্রোপিন ইনজেকশান
বেলাডোনা এক্সট্রাক্ট্ (ফেনোবার্বিটোন ও বেলাডোনা এক সাথে)
নর এড্রেনালিন ইনজেকশান
এড্রেনালিন ইনজেকশান
এমাইনোফাইলিন ইনজেকশান (০.৫% গ্রা, প্রতি ২ মি লি-এ)
ক্লোরফেনিরামাইন ইনজেকশান
ক্লোরফেনিরামাইন ট্যাবলেট
ক্লোরপ্রোমাজিন ইনজেকশান
ক্লোরপ্রোমাজিন ট্যাবলেট
ডিগক্সিন ট্যাবলেট
রিসার্পিন ট্যাবলেট
ফ্রুসেমাইড ইনজেকশান
হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড ট্যাবলেট

গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রাইট ট্যাবলেট
প্যারালডিহাইড ইনজেকশান
মরফিন সালফেট ইনজেকশান
পেথিডিন ইনজেকশান
ফেনোবার্বিটোন ট্যাবলেট
ফেনোবার্বিটোন সোডিয়াম ইনজেকশান (২০০ মি গ্রা প্রতি মি লি-এ)
জাইলোকেইন ইনজেকশান
ডাইইথাইল ইথার (অজ্ঞান করার জন্য)
সোডিয়াম পেন্টাথল
ইথাইল ক্লোরাইড, ২০০ মি লি স্প্রে
ভিটামিন-এ ট্যাবলেট
ভিটামিন-এ ৬০০০ ইউনিট ও ক্যালসিফেরল ১০০০ ইউনিট, ক্যাপসুল
ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ট্যাবলেট
ভিটামিন-সি ট্যাবলেট
ভিটামিন-ডি ট্যাবলেট
ফোলিক এসিড ট্যাবলেট
ফেরাস সালফেট ট্যাবলেট
হেকসাভিটামিন (NFI) ট্যাবলেট
শ্বাসকষ্ট কমানোর ট্যাবলেট (ইফেড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০ মি গ্রা, থিওফাইলিন ৬৫ মি গ্রা, ফেনোবার্বিটোন ৩০ মি গ্রা)
নোসকাপিন সিরাপ
প্রেডনিসোলোন ইনজেকশান
প্রেডনিসোলোন ট্যাবলেট
মেফেনটারমাইন ইনজেকশান
মিথাইল আর্গোমেট্রিন ইনজেকশান
অক্সিটোসিন ইনজেকশান (প্রতি মি লি-এ ৫ ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিট)
জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার বড়ি (পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর যেভাবে অনুমোদন করবেন)
টলবুটামাইড ট্যাবলেট
ইনসুলিন (প্লেন) ইনজেকশান (প্রতি মি লি-এ ৪০ ইউনিট)
আর্গট ট্যাবলেট (আর্গট-এর উপক্ষার যুক্ত—আর্গোটক্সিন উপক্ষারের মোট ০.৪ মি গ্রা-এর সমান)
অম্বলবিরোধী ট্যাবলেট (BNF)
মিল্ক অব্ ম্যাগনেশিয়া ট্যাবলেট
পাইপারেজিন সিরাপ

পাইপারেজিন ট্যাবলেট
রিহাইড্রেশান ফ্লুইড (কলেরার চিকিৎসায়)
গ্রাইপ মিক্সচার (বাচ্চাদের জন্য) (সোডিয়াম বাইকার্বনেট ৫ মি গ্রা, ডিহাইড্রেটেড এলকোহল IPO ০.২৪৮ মি লি প্রতি ৫ মি লি-এ; সিরাপ ইত্যাদি)
হোমএট্রোপিন চোখের ড্রপ
ইসেরিন সালফেট চোখের ড্রপ
ক্রুশেন সল্ট (প্রতি গ্রামে সোডিয়াম সালফেট ২০ মি গ্রা., সোডিয়াম ক্লোরাইড ১০ মি গ্রা., পটাসিয়াম ক্লোরাইড ১০ মি গ্রা, পটাসিয়াম সালফেট ৫৫ মি গ্রা, সাইট্রিক এ্যাসিড ৪৫ মি গ্রা, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট)
এপসম সল্ট
টেট্রাক্লোরইথিলিন ট্যাবলেট
সাক্সিনিল কোলিন ইনজেকশান
পেট্রোলিয়াম জেলি
এডহেসিভ প্লাস্টার
প্লাস্টার অব্ প্যারিস ব্যাণ্ডেজ
ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ইনজেকশান
গ্লুকোজ এ্যাম্পুল (ডেক্সট্রোজ ২৫%)
ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার ২৫ মি লি এ্যাম্পুল

• • •

হাথী কমিটির পেশ করা এই তালিকার কিছু সীমাবদ্ধতা হয়তো রয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার পরিমার্জন ও পরিবর্ধনও করা প্রয়োজন। তবে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, সাধারণ রোগ চিকিৎসার জন্য সীমিত সংখ্যক এই কিছু ওষুধই যথেষ্ট।

তবু আমাদের দেশে ৫০-৬০ হাজার নানা নামের ওষুধ বিক্রি হয়। এগুলি কিন্তু আলাদা ওষুধ নয়। মূলত একই পদার্থ নানা নামে এবং একাধিক পদার্থ নানা ভাবে মিশিয়ে নিছকই ব্যবসায়িক কারণে সরকারী অনুমোদন দিয়ে বাজারে ছাড়া আছে।

আর আছে অপ্রয়োজনীয় নানা মালকড়ি, অন্যত্র নিষিদ্ধ নানা রাসায়নিক পদার্থ। দেশীবিদেশী পুঁজিপতিদের ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র এই ভারত আর তার অন্যতম অব্যর্থ অস্ত্র এই ওষুধপত্র।

মহান স্বীকারোক্তি অথবা কুম্ভীরাশ্রু !

"নয়াদিল্লী, ৮ই মার্চ—সারা দেশে বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকাবক যে সব অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরী করছেন সেগুলি রদ করা এবং সস্তায় জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করছেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের উপমন্ত্রী কৃষ্ণকুমার আজ এই কথা জানান। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার ফলে বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারক বিপুল পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাজারে ছেড়েছেন। এসব ওষুধ তৈরী বন্ধ করা দরকার।......" (যুগান্তর ; ১০. ৩. ৮৬.)

লক্ষ্যণীয়, মন্ত্রীর মতে "সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার ফলে" অপ্রয়োজনীয় ওষুধ চলছে—যেন সরকারের অজ্ঞতা- অনীহা- প্রশ্রয়ে নয়।

বিদেশে বাতিল একটি ওষুধ

প্রদাহ কমানোর জন্য কিছু এনজাইম এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে একসাথে আমাদের দেশে খুব ব্যবহৃত হয়—বহু বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকই তার নিদান দেন। এ ওষুধের দামও বেশ বেশি। এ ধরনের কয়েকটি এনজাইম হল ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, স্ট্রেপটোকাইনেজ ইত্যাদি। এলক্যাপসিন, কাইমোরাল, কাইমোরাল ফোর্ট, কাইমোপসিন ইত্যাদি বাণিজ্যিক নামে তা পাওয়া যায়। কিন্তু "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তপক্ষ (F D A) এই জাতীয় প্রদাহ নিবারক এনজাইম (Pro-teolytic enzymes) সমূহকে ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণরূপে অকেজো ও অর্থের অপচয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন।" "ফিলিপাইন সরকারের ব্যুরো অব্ ফুড এণ্ড ড্রাগসের পরিচালক মিসেস কাটালিয়া সানচেজ ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে তথাকথিত প্রদাহ নিবারক এই সব এনজাইম মিশ্রিত ৭৯টি অকেজো ওষুধ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন।" (Script, 22-24 April, 1987 ; মাসিক গণস্বাস্থ্য), মে, ১৯৮৮ থেকে সংগৃহীত)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ওষুধ নিয়ে বেসাতি

স্বাস্থ্য- ও শরীর-ব্যবসার সংপৃক্ত অংশ এই ওষুধ ব্যবসায় সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, রোগ হয়ই আর তার জন্য ওষুধের চাহিদা মানুষের সব সময়েই রয়েছে, এতে লাভের হার সীমাহীনও হতে পারে এবং ব্যবসাটি বেশ সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত।

ওষুধ ব্যবসার ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে বিদেশী বহুজাতিক ও কিছু দেশী ওষুধ কোম্পানি, এক দিকে চিকিৎসক আর বাকী দিকে সেই জনগণ। বিভিন্ন অবস্থানে রয়েছে সরকার ও সরকারী আইনকানুন, যা মূলতঃ প্রথমটিকেই সাহায্য করে ; আর আছে খুচরো ওষুধ দোকানদাররা। মানুষের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কিছু চিকিৎসক বা নার্সিংহোম-এর মালিকরা যেমন ব্যবসা করেন* ওষুধ ব্যবসায়ীরাও করে আরো নিষ্ঠুরভাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে। ওষুধ ব্যবসার এটিও বিরাট সুবিধা। তাই সত্যি হোক মিথ্যে হোক, অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার অভিযোগে জনসাধারণের হাতে ডাক্তাররা মার খায় কিন্তু ক্ষতিকর বা ভেজাল ওষুধ ইত্যাদির কারণে ওষুধ কোম্পানির মালিক মার খেয়েছে জানা নেই।

সারা পৃথিবীতেই ওষুধের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীদেশ। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান ও পূর্ব ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ সহ এই সব ধনী দেশ ১৯৮০ সালে, পৃথিবীর মোট ওষুধ উৎপাদন (৮৩৫৩ কোটি ডলার)-এর ৮৮.৫% উৎপাদন করেছে। পৃথিবীর বাকী দরিদ্র দেশগুলিতে উৎপন্ন হয়েছে বাকী মাত্র ১১.৫% ওষুধ।[১] আমাদের স্বাধীন দেশেও ওষুধের উৎপাদন এখনো

* এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু সিজারিয়ান অপারেশনের কথাই বলা যায়। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বাচ্চাকে ভূমিষ্ঠ করানোর জন্য এধরনের অস্ত্রোপচার না করাই উচিত—বাচ্চা ও মা উভয়ের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু অধিকাংশ নার্সিংহোমে বা প্রাইভেট প্র্যাকটিশনাররা সামান্য কারণে, কখনো বা বিনা কারণে এটি করেন ; বাড়ীর লোককে বোঝানো হয় এটি না করলে বাচ্চা ও মা উভয়ের বিপদ হবে। ফলে আতংকিত বাড়ীর লোক যেভাবেই হোক অর্থ সংগ্রহ করেন। অন্যান্য অস্ত্রোপচার, বিশেষ ধরনের চিকিৎসা, কিংবা শারীরিক নানা পরীক্ষা (বিশেষ এক্সরে, ইত্যাদি)—এগুলোর ক্ষেত্রেও এই ব্যবসায়িক পন্থা অবলম্বন করতে পিছপা হন না অনেকেই। কোন্ ধরনের চিকিৎসা সত্যিকারের প্রয়োজন তা বোঝার সামর্থ্য সাধারণ মানুষের থাকে না। এই অজ্ঞতার সুযোগে চলে এমন ব্যবসা। ব্যাপারটি শুধু আমাদের দেশেই নয়—যেসব দেশেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যবসায়িক স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই এটি ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে চালু রয়েছে। "কানাডার অটাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্যুনিটি বিভাগের অধ্যাপক জিওফ্রে এণ্ডারসন ও জোনাথান লোমাস সম্প্রতি.....(সমীক্ষায়) লক্ষ্য করেন যে, সত্তর দশকের চেয়ে আশির দশকে, রোগীর শারীরিক কারণে নয়, শিশুর স্বার্থেও নয়, কেবলমাত্র চিকিৎসকের ব্যবসায়িক স্বার্থে সিজারিয়ান অপারেশনের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ...... গবেষকরা অবৈজ্ঞানিক কারণে সিজারিয়ান সেকশান করার বিরুদ্ধে সচেতন হবার জন্য জনগণ ও চিকিৎসক সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন।"[৪]

মূলতঃ বিদেশের উপর নির্ভরশীল। অজস্র বিদেশী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি এখানে অবাধে ব্যবসা চালায়। কিছু পুরানো একটি হিসেব থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। ১৯৭৩ সালে ভারতে ছোট-বড় ২৩০০ ওষুধ কোম্পানি ৩৭০ কোটি টাকার ওষুধ উৎপাদন করে ; এর মধ্যে ২৯৬ কোটি টাকার ওষুধ তৈরী করেছে ১৯০টি একচেটিয়া বৃহৎ কোম্পানিগুলি অর্থাৎ কোম্পানিগুলির ৪% তৈরী করেছে মোট ৮০% ওষুধ। এর মধ্যে ২৮টি কোম্পানি (১.২%) সম্পূর্ণ বিদেশী আর এরা তৈরী করেছে ৪০% ওষুধ।[২] এ ছবি পাল্টায়নি, বরং আরো ভয়াবহ হচ্ছে। সাম্প্রতিক আরেকটি হিসাব অনুযায়ী, আমাদের দেশের ওষুধের ৭৮% তৈরী করছে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলি, ৬% সরকারী কোম্পানিগুলি (যেমন IDPL, HAL, SSPL, BEPL) আর বাকী ১৬% বেসরকারী ভারতীয় মালিকরা।

■ ওষুধকে ঘিরে এই একচেটিয়া ব্যবসা অবাধ শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করেছে, কোম্পানিগুলি অসুস্থ মানুষের পকেট কেটে ওষুধ থেকে লোভনীয় হারে লাভ করে। ক্লোরামফেনিকল তৈরী করতে যা খরচ পড়ে, বিক্রি হয় তার তিনগুণ দামে, টেট্রাসাইক্লিন ২৭ গুণ দামে। সুইজারল্যাণ্ডের একটি ওষুধ কোম্পানি আমাদের দেশে লিব্রিয়াম চালু করে প্রতি কিলোগ্রাম ৫৫৫৫ টাকা দরে, অথচ দিল্লীর একটি কোম্পানি তা মাত্র ৩১২ টাকা দরে আমদানী করতে সক্ষম ছিল। আরেকটি বিদেশী কোম্পানি ডেক্সামেথাসোন নামের ওষুধটির ৬০০০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম দর চেয়েছিল। কিন্তু চাপে পড়ে তা ১৬০০০ টাকা করতে বাধ্য হয়। এবং অবশ্যই এরপরও তারা লাভ করেছে।[২] সাধারণতঃ এই সব ওষুধ কোম্পানি আইনের সুযোগ নিয়ে তাদের মূল বিদেশী সংস্থা থেকে অত্যন্ত চড়া দামে ওষুধের মূল উপাদান কেনে, তারপর তাতে 'ভারতে তৈরী' ছাপ মেরে বাজারজাত করে ও প্রচুর দামে বিক্রি করে। ঐ কোম্পানির পিতৃভূমির মানুষেরা কিন্তু অতিদরিদ্র ভারতীয়দের চেয়ে (তাদের আয়ের বিচারে তুলনামূলক) কম দামেই ওষুধটি পায় এবং ভারতে ওষুধটি পায় মূলত ধনীরাই।

আমাদের সরকারও শোষণের এ ব্যবস্থা আইন করে পাকা করে দিয়েছেন। বৃটেনে ওষুধের ওপর লাভের হার ছিল ২৪%, কিন্তু পরে তা কমিয়ে ২১% করা হয়েছে অর্থাৎ একটি ওষুধের মোট খরচ যদি একটাকা হয় তবে বৃটেনের মানুষকে তার জন্য সর্বাধিক দিতে হবে ১.২১ টাকা। কিন্তু আমাদের দেশের আইনে তা ন্যূনতম ১.৪০ থেকে ১০ বা ২০ টাকাও হতে পারে। আমাদের দেশের মানুষেরা কি বিশাল ধনী কিংবা ওষুধ তাদের কাছে বিলাসদ্রব্য ? আমাদের দেশে ওষুধকে মোটামুটি ৪টি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ প্রতিষেধক ওষুধপত্র রয়েছে এক নম্বর ক্যাটেগরিতে। এতে সরকার নির্ধারিত লাভ করার সর্বোচ্চহার উৎপাদন মূল্যের ৪০%। জীবনদায়ী ও এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলি রয়েছে ২ নং ক্যাটেগরিতে ; এসবে ৭৫% পর্যন্ত মুনাফা করতে পারে ওষুধ কোম্পানি। তিন

নং ক্যাটেগরিতে রয়েছে এনজাইম, কাশির সিরাপ ইত্যাদি। এতে ১০০-২০০% লাভ করা যায়। ৪ নং ক্যাটেগরিতে আছে তথাকথিত টনিকগুলি। এতে লাভের হার সীমাহীন। হ্যাঁ, সীমাহীন। সরকারের মহৎ (!) উদ্দেশ্য ছিল যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগে ভোগা গরীব মানুষেরা ও দেশের আপামর জনসাধারণ প্রয়োজনীয় ওষুধগুলি অন্ততঃ কিছু কম দামে পাবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে এধরনের উদ্ভট আইনের ফলে লাভের মধ্যে হয়েছে—কোম্পনিগুলি প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক ওষুধের উৎপাদনই কমিয়ে দিয়েছে। আর সীমাহীন বা প্রচুর লাভের ব্যবস্থা থাকায় টনিক, ভিটামিন, কাশির ওষুধ ইত্যাদিতেই তারা টাকা ঢালছে—অথচ এসব ওষুধ অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, কখনো ক্ষতিও কিছু করে।

আপনি যে কোন ওষুধের দোকানে যে কোন সময় অজস্র টনিক-ভিটামিন পাবেন—হরেক রঙের মোড়কে, মনোহারী বোতলে ; কিন্তু প্রায়ই দেখা যাবে যক্ষ্মার ওষুধসহ নানা ধরনের এ্যান্টিবায়োটিক, ইনসুলিন, হৃৎপিণ্ডের রোগের ওষুধ ইত্যাদি নানা জরুরী ও একান্ত প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী নানা ওষুধই বাজারে নেই। এর কারণ—ইচ্ছে করেই এদের কম উৎপাদন করা হয়, নিছক মুনাফার জন্য। যেমন ধরা যাক যক্ষ্মার ওষুধ। আমাদের দেশে ৫০০০০ মানুষ প্রতি বছর যক্ষ্মায় মারা যান। দেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কম করেও এক কোটি। এঁদের জন্য দরকার যে কয়েকটি ওষুধ তার মধ্যে রয়েছে কয়েক পয়সা দামের INH. দেশের সব রোগীর জন্য এর বাৎসরিক চাহিদা ২৪০.১০ মেট্রিক টন। সরকার প্রদত্ত লাইসেন্স অনুযায়ী দেশে এর উৎপাদন ক্ষমতাও ৫৩৮.৫৬ মেট্রিক টন। কিন্তু কোম্পানিগুলি তৈরী করেছে, ১৯৭৬-৭৭ সালে মাত্র ৭১.২ টন, ১৯৭৭-৭৮ সালে ৭৯ টন। ১৯৬৭ সালে দেশে যে ৭০০ কোটি টাকার ওষুধ তৈরী হয়েছে তার মাত্র ১.৪% যক্ষ্মার জন্য, ২৫% হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় টনিক-ভিটামিন-এনজাইম ইত্যাদি মালপত্র। একইভাবে ভারতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কম করে ২৫ লক্ষ। তাদের জন্য প্রয়োজন ড্যাপসোন নামের ওষুধ, দাম খুবই কম। দরকার মাত্র ৪৮.৪৫ টন। কিন্তু এর সরকারী লাইসেন্স ৩৭.৮ টনের, আর ১৯৭৬-৭৭ সালে উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ১৬.৪২ টন।[৫] না, এত সব করেও ক্ষান্ত নেই ব্যবসায়ীরা ও তাদের সরকার। এখন ষড়যন্ত্র চলছে ঐ কয়েক পয়সা দামের সস্তা ওষুধের পরিবর্তে ২-২.৫০ টাকা দামের অন্য একটি দামী ওষুধ বাজারে ছাড়ার, তাই সৃষ্টি করা হয়েছে কৃত্রিম অভাব। পঃ বঃ ড্রাগ এ্যাকশান ফোরামের এক মুখপাত্রের মতে ছ'মাস ধরে বাজারে কুষ্ঠের কোন ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ ব্যবসায়ীরা ঐ দামী ওষুধ ছাড়ার তালে রয়েছে।১৯৮১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ভারতের পেট্রোলিয়াম রসায়ন-সার মন্ত্রীও লোকসভায় স্বীকার করে ছিলেন প্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে (যেমন যক্ষ্মার প্রাথমিক ওষুধগুলি)। অন্য দিকে অন্য ধরনের ওষুধের

আমদানী বেড়ে চলেছে।[৬]
কিন্তু এসবে স্বীকৃতি নিছকই কথার কথা, বাধ্য হয়ে করা। তার পরিবর্তনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এই কাঠামোর মধ্যে সরকারের নেই। এই স্বীকারোক্তির সময়ের পরেও, ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মোট ৫ বছরে সরকারেরই নাকের ডগায় বসে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন বাড়িয়েছে মাত্র ৫% আর টনিকের উৎপাদন বাড়িয়েছে ৫০%।[৭] ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারই এম. পি. জয়সুখলাল হাথীরসভাপতিত্বেএকটি ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। ওষুধ শিল্পের বিকাশ, সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা, ওষুধের গুণগত মানের নিশ্চয়তা, ওষুধের দাম, সরবরাহ—এধরনের ৮টি বিষয়ে এ কমিটিকে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কমিটি এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে তাঁদের রিপোর্টপ্রকাশ করেন। কিন্তু সরকারী এই কমিটির রিপোর্টে প্রায় কোন প্রস্তাবই সরকার গ্রহণ করে নি। উদ্দেশ্য একটাই—দেশী, বিশেষ করে বিদেশী সমগোত্রীয় শোষকদের না চটানো।

যেমন হাথী কমিটি বলেছেন, আমাদের দেশে ১১৭টি ওষুধ সব রোগের চিকিৎসায় যথেষ্ট। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও সর্বাধিক প্রায় ২৫০টি ওষুধের কথা বলেছেন, যার সাহায্যে সাধারণ সব রোগের চিকিৎসা করা যাবে। এগুলি হল জেনেরিক নামের ওষুধ অর্থাৎ ওষুধের গোত্রের নাম। যেমন একটি ওষুধ-এর রাসায়নিক নাম এ্যাসিটাইল স্যালিসিলিক এ্যাসিড; এর জেনেরিক নাম এ্যাস্পিরিন। আর একটির রাসায়নিক নাম এন-এ্যাসিটাইল প্যারাআমাইনোফিনল, এর জেনেরিক নাম প্যারাসিটামল। এই জেনেরিক নাম সারা বিশ্বে স্বীকৃত। কিন্তু সরকারী আইনের সাহায্য নিয়েই প্রায় কোন কোম্পানি জেনেরিক নামে ওষুধ বাজারে ছাড়ে না। একই ওষুধ বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে বাজারে ছাড়ে—এই নাম ওষুধের ব্র্যাণ্ড নাম। যেমন নানা কিছুর সাথে মিশাল দিয়ে এ্যাস্পিরিন-এর অন্যতম ব্র্যাণ্ড নাম ডিস্প্রিন (রেকিট্স কোম্পানি), মাইক্রোপাইরিন (নিকোলাস), অ্যাসাবুফ (কার্টার ওয়ালেস), ক্যাফিয়াস্পিরিন (বেয়ার) ইত্যাদি। একইভাবে প্যারাসিটামল-এর বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড নাম হল ক্রোসিন (ডুফার), ক্যালপল (ওয়েলকাম), ম্যালিডেন্স (নিকোলাস), প্যারাসিন (স্ট্যাডমেড), পাইরেজেসিক (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস) ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে আমাদের দেশে ৫০০০০-৬০০০০ এরও বেশী নামের ওষুধ চালু রাখা হয়েছে ব্র্যাণ্ড নামে, এবং জেনেরিক নামের পরিবর্তে ব্র্যাণ্ড নামে ওষুধ চালানোর একটাই উদ্দেশ্য—ব্যবসা। জেনেরিক নামে ওষুধ চালালে তার ওপর ১২.৫% ট্যাক্স কমে যায়। তাতে ক্রেতাদের সুবিধে, কিন্তু কোম্পানির নয়। কারণ ব্র্যাণ্ড নামের সুযোগে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন দাম নিতে পারে, ঐ বিশেষ ব্র্যাণ্ড নামের সপক্ষে জোরদার প্রচারের জোরে বিশেষ চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। ডাক্তারদের মধ্যে নতুন ব্র্যাণ্ড নামের প্রতি মোহ সৃষ্টি করতে পারে।* এবং সব মিলিয়ে বিক্রি বাড়িয়ে মুনাফা লুটতে পারে। একই জেনেরিক নামের ওষুধে বিভিন্ন দাম নেওয়া তো সম্ভব

নয়! যেমন জেনেরিক নামের একই ওষুধ এ্যাম্পিসিলিন, (২৫০ মি গ্রা.) আমাদের দেশে রেম্পিলিন-৬ নামে বিক্রি হয় প্রতি ক্যাপসুল প্রায় ৯৫ পয়সা দামে, আর রোসিলিন বিক্রি হয় ১.৬০ টাকা দামে, এম্পিপেন ১.৮০ টাকা দামে ইত্যাদি। বাংলাদেশের পাইওনিয়ার নামে ওষুধ কোম্পানি টেট্রাসাইক্লিন ট্যারাসিন নামে বিক্রি করে প্রতি ক্যাপসুল ০.৯০ বাংলাদেশী টাকায়; I.C.I. কোম্পানি বিক্রি করে ১.০৫ বাংলাদেশী টাকায়। অথচ এদের প্রকৃত মূল্য অনেক কম। যেমন বাংলা দেশের স্বাস্থ্য ও ওষুধ নিয়ে জনস্বার্থে আন্দোলনরত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যে ওষুধের কারখানা করেছেন (গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ) তাঁরা—সামান্য কিছু লাভ করেও, টেট্রাসাইক্লিন বিক্রি করেন প্রতি ক্যাপসুল ০.৫০ বাংলাদেশী টাকায় অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক দামে।

ব্র্যাণ্ডনামের আরেকটি সুবিধে দীর্ঘস্থায়ী বাজার। কোন কোম্পানি একটি জেনেরিক নামের ওষুধ নিজেদের বিশেষ ব্র্যাণ্ড নামে বাজার জাত করার পর আমাদের দেশে সাত বছর তার লাইসেন্স থাকে। এই সময়ে ব্যাপক প্রচার করে কোম্পানিটি চিকিৎসক ও মানুষের মনে এই নামটি গেঁথে দেয়। সাত বছর পরে অন্য কোম্পানি একই ওষুধ অন্য ব্র্যাণ্ড নামে—হয়তো কম দামে—বাজারে ছাড়লেও আগের কোম্পানির ব্র্যাণ্ড নাম যথেষ্ট বিক্রি হয়।

জেনেরিক নামের বদলে বিশেষ ব্র্যাণ্ড নামে বাজারে ওষুধ ছেড়ে ব্যবসার মত ওষুধ কোম্পানিগুলি ক্রেতাদের মন ভোলায় বাহারী মোড়ক, সুদৃশ্য বোতল ইত্যাদি দিয়েও—ভেতরে মাল যাই থাক না কেন! ক্রেতার মন ভোলান ছাড়া এধরনের প্যাকিং লাভের অংকও বাড়ায়। যেমন কোন ওষুধের খরচ ধরা হয়—কাঁচামাল ও তার থেকে ওষুধ তৈরী করার খরচ এবং প্যাকিং-এর খরচ; এর ওপর কোম্পানি লাভ করতে পারে ৪০% থেকে সীমাহীন অর্থাৎ কোন ওষুধের কাঁচামাল ও তার থেকে ওষুধটি তৈরী করার খরচ বাদে প্যাকিং-এর খরচই যদি ১ টাকা হয় তবে এর জন্যই কোম্পানিটি লাভ করতে পারবে কমপক্ষে ৪০ পয়সা। হ্যাঁ, আমাদের দেশের আইনের সাহায্যেই।

এই বোতল আর মোড়ক থেকে লাভের এমন *অমানবিক সুযোগ থাকার ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলি আরো ভয়াবহ যে কাজ করে তা হল, প্রয়োজনীয় ওষুধের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ বোতলজাত করা। স্থান সংক্ষেপ

* অনেক সময় চেনা নামের ওষুধ রোগীকে না দিয়ে ডাক্তাররা নতুন নামের, অথচ একই, ওষুধ দিয়ে রোগীর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন, রোগীও নতুন ওষুধ পেয়েছেন ভেবে মানসিক তৃপ্তি পান। যেমন ভাইরাস জনিত জ্বরের জন্য কোন ডাক্তার হয়তো এ্যাম্পিলিন ক্যাপসুল আর ক্যালপল ট্যাবলেট দিয়েছিলেন,—দু'দিন ওষুধ খেয়েও জ্বর পুরো না কমায়, রোগী গেলেন অন্য ডাক্তারের কাছে। তিনি হয়তো দিলেন রোসিলিন ও পাইরিজেসিক। জিনিষ একই। কিন্তু আরো দিন দুয়েক যাওয়ার পর জ্বর কমতে থাকল। আর ভাইরাস জনিত জ্বর ৫-৭ দিনের মধ্যে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মাঝখান থেকে জয়জয়কার হয় দ্বিতীয় চিকিৎসকের এবং ঐ ওষুধের।

করার জন্য দু একটা উদাহরণই দেওয়া যায়। যেমন ধরা যাক র‍্যানবেক্সি কোম্পানির বাচ্চাদের জন্য রসিলিন(এ্যাম্পিসিলিন) সিরাপের কথা। ছোট একটা শিশিতে ৪০সি.সি.(প্রায় ৮ চামচ) রাখা থাকে। কিন্তু এর পুর্ণ মাত্রা হল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিনে ৩-৪ চামচ—অন্তত ৫-৭ দিন। অর্থাৎএই শিশিতে চলবে তিন দিনেরও কম। তাই বাধ্য হয়ে আরেকটা বোতল কিনতেই হয়। অথচ অনায়াসে ৭০-৮০সি.সি. ওষুধ বোতলজাত করা যায়.—ছিপি খোলার পর এই ক'দিনে ওষুধটি নষ্ট ও হয় না। এধরনের প্রয়োজনীয় ওষুধের ক্ষেত্রে এভাবে ক্রেতাকে ওষুধের পেছনে ততটা নয়— বোতল, প্যাকেট ইত্যাদির পেছনেই বেশী খরচ করতে বাধ্য করা হয়। অথচ প্রায় সব 'টনিক'ই ১০০-১৫০সি.সি.র বোতলে বিক্রি হয়; এক্ষেত্রে এইভাবে অপ্রয়োজনীয় এ পদার্থটিকে বেশী খেতে বা কিনতে বাধ্য করা হয়। (এ্যাম্পিসিলিনের মত এ্যান্টিবায়োটিককে কম পরিমাণে বোতলজাত করার অন্য বিপদ রয়েছে। অনেক সময় ২-৩ দিন খাওয়ার পর জ্বর বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কষ্ট কমে গেলে, আরেক শিশি ওষুধ কেনা বা অবহেলা কিংবা উভয় কারণেই ওষুধটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। পূর্ণমাত্রা না খাওয়ায় রোগ জীবাণু পুরো ধ্বংস হয় না এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে পরে আবার রোগটি দেখা দেয়, হয়তো আরো জটিল আকারে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওষুধ লাগে অনেক বেশি। সব মিলিয়ে ওষুধ কোম্পানির আসে পৌষমাস—সাধারণ মানুষের সর্বনাশ।)

স্বাধীন দেশের মানুষের পকেট কেটে এভাবেই ওষুধ কোম্পানিগুলি মুনাফা লোটে। প্যাকিং ছাড়া আরেকটি যে খরচ আমাকে-আপনাকে ওষুধের জন্য বহন করতে হয় তা হল ডাক্তারদের পেছনে করা ওষুধ কোম্পানিগুলির খরচ তথা প্রচারের খরচ। এ খরচও ওষুধের মূল দামের মধ্যে পড়ে না, অথচ তার দাম দিতে হয় ক্রেতাকেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিয়মই তাই কোন পণ্যকে বাজারে ছাড়ার জন্য সত্যি-মিথ্যা প্রচারের পেছনে বিরাট অর্থ ব্যয় করা হয় এবং কোম্পানিগুলি এ অর্থ ক্রেতাদের কাছ থেকেই তুলে নেয় বহু গুণে।টিভি-ফ্রিজ-গাড়ী-পোশাক-এর থেকে ওষুধের ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার হলো এখানে ডাক্তাররা ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রচার ও ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে, তৈরী করা দালালের ভূমিকা পালন করেন। ডাক্তারী ছাত্র ও সদ্য পাস করা তরুণ চিকিৎসক থেকে শুরু করে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি চিকিৎসকের তালিকা অন্য কারো কাছে না থাকলেও বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলির কাছে থাকে। নানা রকম খেলনা,পেন, ফ্রি ওষুধ, লেখার প্যাড, এমনকি টিভি-ফ্রিজ দিয়েও ডাক্তারদের হাত করা হয়। ডাক্তারদের নানা সেমিনার বা সম্মেলনে ভুরিভোজ খাওয়ান, সিনেমা দেখান, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির পেছনেও ওষুধ কোম্পানিগুলি অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।সরকারী হিসেবে ওষুধের মোট দামের ৩০-৪০% ব্যয় করা হয় এ বাবদে। এ

দাম ক্রেতাকেই দিতে হয়। অর্থাৎ একটি ওষুধ কোম্পানির প্রচারক (মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ) একজন চিকিৎসককে নানা উপহারে ভুলিয়ে যে ওষুধটি আপনাকে প্রেসক্রিপশান করায়, তার দাম যদি ৫ টাকা হয় তবে তার ২ টাকাই আপনি দিচ্ছেন ডাক্তারদের ভোলানোর জন্য খরচ করা এই কোম্পানির টাকা উশুল করার জন্য। তানজানিয়ার একটি হিসেবে দেখা যায়, সে দেশের প্রায় ১৫০ টি ওষুধ কোম্পানি দেশের ৬০০ ডাক্তারের পেছনে ২ কোটিরও বেশী টাকা খরচ করে (১০.৭ লক্ষ পাউণ্ড)। অথচ সেদেশের সরকারও এই সব ডাক্তারের পড়ানর পেছনে এত টাকা খরচ করতে পারেন না। স্কুইব নামক ওষুধ কোম্পানির প্রাক্তন মেডিক্যাল ডাইরেক্টর ডাঃ ডালে কনসোল মন্তব্য করেছেন, "আমার চিকিৎসক ভাইদের এ কথা বোঝানো অসম্ভব যে, ওষুধ কোম্পানিগুলির অধিকর্তারা ও মেডিক্যালরিপ্রেজেণ্টেটিভরা হয় ধূর্ত ব্যবসায়ী বা ধূর্ত বিক্রেতা—তারা কখনোই জনদরদী নয়। এরা (ডাক্তারদের) উপহার দেয় না, (এই উপহারের মাধ্যমে অর্থ) বিনিয়োগ করে।" আমেরিকায় ওষুধ কোম্পানিগুলি একজন চিকিৎসকের পেছনে বছরে ৫০০০ ডলার বিনিয়োগ করে (উপহার ইত্যাদির মাধ্যমে)—কিন্তু এর বিনিময়ে তারা কয়েক লক্ষ ডলারের ওষুধ লিখিয়ে নেয়, তাদের ৮৯% ব্র্যাণ্ডনামের ওষুধ প্রেসক্রিপশান করায়। ১৯৫৯ সালের একটি হিসেবে আমেরিকার সব ওষুধ কোম্পানি তাদের ওষুধের প্রচারের ও বিক্রি বাড়ানোর জন্য ৭৫ কোটি ডলার খরচ করেছিল। অথচ ঐ বছর সমগ্র আমেরিকার সব মেডিক্যাল স্কুল-কলেজের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০ কোটি ডলার।

আর এভাবেই ওষুধ আর চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে অবাধে চলছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। এখন আর কোন দেশে কষ্ট করে যুদ্ধ-টুদ্ধ করে উপনিবেশ গড়তে হচ্ছে না। সাহায্য আর মাল যোগানের মুখোশ পরে, দেশীয় তাঁবেদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা আইনকানুনের সুযোগে চলছে নিষ্ঠুর নিঃশব্দ শোষণ, এবং তা ক্রমবর্ধমান। হাঁড়ির একটা চাল টিপে অবস্থা বোঝার মত শুধু একটি উদাহরণ থেকেই এ ধরনের ক্রমবর্ধমান শোষণের আঁচ পাওয়া যাবে। বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা আলবার্ট ডেভিড ১৯৮৪ সালে মোট লাভ করেছিল (অর্থাৎ এদেশের টাকা নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল) ৪৭.০৬ লক্ষ টাকা ; ১৯৮৫ সালে তারা লাভ করেছে ১.০৩ কোটি টাকা অর্থাৎ এক বছরে ১২০% বৃদ্ধি। নীট লাভ করেছিল ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৮.৬২ লক্ষ টাকা, ১৯৮৪-৮৫ সালে ৪৭.৬৫ লক্ষ টাকা। ১৯৮৪ তে ওষুধ বিক্রি করেছিল ৯.০১ কোটি টাকার, ১৯৮৫তে ১১.৬২ কোটি টাকার (৩০শে সেপ্টেম্বর অব্দি)।[৮] এই ভাবেই এ দেশ থেকে মুনাফা লুটছে আরো নানা বিদেশী কোম্পানি।

এবং এভাবেই চলছে। একজন চিকিৎসকও সচেতন বা অসচেতন ভাবে ওষুধ ব্যবসায়ীদের দালালে, এই শোষণের অন্যতম শরিকে পরিণত হয়েছেন। কোন ওষুধ কোম্পানি যদি আমাদের দেশের (বা যে কোন) একজন চিকিৎসককে বলে

যে, তাঁকে কোম্পানি থেকে প্রতিমাসে একহাজার টাকা দেওয়া হবে, এর বিনিময়ে তিনি যেন তাদের ওষুধগুলিই লেখেন—তাহলে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই সব চিকিৎসক ঘৃণা ও ভয়ে এধরনের ঘুষ অগ্রাহ্য করবেন। তা জানে বলেই ওষুধ কোম্পানিগুলি কম-বেশী এই একই অর্থ ডাক্তারের পেছনে ঢালে ভিন্নভাবে—ওষুধ, উপহার, খাওয়ান ইত্যাদির নামে। ডাক্তাররাও এই পরোক্ষ ঘুষ নেওয়াকে লজ্জার মনে করেন না, বরং যে যত বেশী উপহার পান তিনি তত বেশী সম্মানিত ও গর্বিত অনুভব করেন এবং অবশ্যই কৃতজ্ঞতাবশে কলম দিয়ে বেরোয় প্রচারিত ওষুধের নাম,—তা ক্ষতিকর, নিষিদ্ধ বা অপ্রয়োজনীয় হলেও। অন্যদিকে এইভাবে ওষুধ কোম্পানিগুলি নেপথ্যে থেকে মুনাফা লোটে, রোগী তথা ক্রেতাদের সাথে তাদের যোগসূত্র ঘটায় চিকিৎসকেরা বা চিকিৎসকরা এইভাবেই ব্যবহৃত হন। ফলে জনসাধারণের ওষুধ সম্পর্কিত নানা অভিযোগের সরাসরি শিকার হন এই চিকিৎসকরাই। আড়ালে মজা দেখে ব্যবসায়ীরা।

একই ভাবে বিশেষ ওষুধ কোম্পানির মুনাফা বাড়ানর জন্য অসহায় রোগীকে কিনতে বাধ্য করেন দামী ওষুধ। একই ওষুধ যদি কম দামেরও হয় তবু ঐ ব্র্যাণ্ড নাম না লিখে বেশী দামের নামী (অবশ্যই বিদেশী) কোম্পানির ওষুধ দেওয়া হয়। কোম্পানির প্রচারের জোরে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে দামী হলেই ওষুধ ভাল হবে। টনিক-ভিটামিন-লৌহঘটিত লবণের ক্ষেত্রে এটি বীভৎস ভাবে প্রযোজ্য।

ওষুধ কোম্পানিগুলি ডাক্তারের পেছনে এমনভাবে লেগে থাকে যে, এক সময় অধিকাংশ চিকিৎসকই এইসব ওষুধ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভদেরই নিজেদের অজান্তে শিক্ষক হিসেবে বরণ করে নেন—চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্যাদির উৎস হিসেবে সাম্প্রতিক ওষুধের খবর জানার জন্য তাদের উপর নির্ভর করেন। কোম্পানির ওষুধের প্রচারপত্রগুলিই একসময় ঐ চিকিৎসকের টেক্স্ট্ বই-এর ভূমিকা পালন করে ফেলে। ওষুধ কোম্পানিগুলি (বিশেষতঃ বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি) তাদের আদর্শ শিকার হিসেবে তৃতীয় বিশ্বকে চিনতে পেরেছে। আর এই শিকারের কাজে তাদের মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভদের লাগায়। উন্নত দেশের তুলনায় তাই এদের সংখ্যা তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশে অনেক বেশী। যেমন ব্রিটেনে প্রতি ১৮ জন ডাক্তার পিছু একজন **মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ** রয়েছে; অন্যদিকে বাংলাদেশে রয়েছে ৭ জন পিছু একজন; তাঞ্জানিয়ায় ৪ জন পিছু একজন, নেপাল, ব্রেজিল, ল্যাটিনআমেরিকারকিছু দেশে ৩ জন পিছু একজন।[৯] ভারতের সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই, তবে এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হবে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি হিসেব অনুযায়ী আমাদের দেশের ৫২টি বড় বড় ওষুধ কোম্পানি ১৯৭৫-৭৬ সালে প্রচারের বাবদ খরচ করেছিল ৬৮.৬ কোটি টাকা, ১৯৭৭-৭৮ সালে ৮,৪০ কোটি টাকা; একই সময়ে এরা গবেষণার (?) জন্য ব্যয় করেছে এর নগণ্য অংশ,—মাত্র যথাক্রমে ১০৭ ও ১৫৬ কোটি টাকা। ব্যবসা

সুরক্ষিত করার অন্যতম শর্ত, কমিশনের টোপ দেওয়ার পেছনেও খরচ হয়েছে এর অনেক বেশী—যথাক্রমে ৬৩.১ ও ৬৫.৬ কোটি টাকা।[১০] গবেষণার ব্যাপারটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিছক লাভের জন্য প্রচার ও কমিশনের এই যে বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষকেই পকেট থেকে দিতে হচ্ছে, তা কি করে সুস্থ মস্তিষ্কে মানা যায়?

তবে তথাকথিত এই সব গবেষণার বড় অংশটাই সত্যিকারের গবেষণা নয়। আমেরিকার স্কুইব ওষুধ কোম্পানির প্রাক্তন গবেষণা অধিকর্তার হিসাব অনুযায়ী তাঁর কোম্পানির গবেষণা খাতে ব্যয়ের মাত্র ২৫% ছিল সত্যিকারের গবেষণামূলক, বাকী ৭৫%-ই ব্যয় হয়েছে একটা পরিচিত উপাদানের সাথে আরেকটি পরিচিত উপাদান মিশিয়ে কিভাবে নতুন ব্র্যাণ্ড নামের 'ওষুধ' বানানো যায় বা এই ধরনের তথাকথিত দিবতীয় শ্রেণীর দ্রব্য তৈরী করার পেছনে।[১১]

বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নিছক মুনাফা লোটার জায়গা বলেই মূলত গণ্য করে। এরই ভয়াবহ একটি পরিনাম হল, ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক বলে নিজেদের দেশে নিষিদ্ধ হওয়া ওষুধ এ সব দেশে বিক্রি করা। যেমন প্রাণঘাতী ফেনাসেটিন ইংল্যাণ্ডে ১৯৭৪ সালেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং বিনা প্রেসক্রিপশানে বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তারও বহুদিন পর পর্যন্ত এই ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডেরই বুটস কোম্পানি (ও অন্যান্য কয়েকটি কোম্পানিও) ফেনাসেটিন যুক্ত এ পি সি (A P C) ট্যাবলেট অবাধে বিক্রি করে গেছে—কোন সতর্কতা, সাবধানবাণীর ধারকাছ দিয়েও যায় নি। অন্য দিকে কম গুণগত মানের ওষুধ, উৎপাদনে কোন ত্রুটিযুক্ত ওষুধ বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও বহু ধনী দেশ গরীব দেশগুলিতে চালান করে। এ সব গরীব দেশের সরকার যারা চালায় ঐ সব তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের অনেকেও ঐ সব দেশেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দালালের ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৬৩-১৯৭৪ সময় কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওষুধের মান বিষয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনের কিছু মন্তব্য স্মরণ করা যায়। বলা হয়েছে আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু গরীব দেশ কিছু সস্তায় ওষুধ ইত্যাদি কেনায় আগ্রহী—ঐ সুযোগে ধনী দেশগুলি খারাপ মানের ("unacceptable quality") ওষুধ চালান করে। যেমন ইংল্যাণ্ড ও ইটালিতে এমন কোন আইন নেই যার সাহায্যে বিদেশে রপ্তানির জন্য তৈরী করা ওষুধের গুণাগুণ বিচার-করা যায়। এই সুযোগে ও দেশের ওষুধ কোম্পানি এই ধরনের অমানবিক ব্যবসা চালায়।[১২]

সত্য-অর্ধসত্য বা মিথ্যে প্রচার, জেনেরিক নামের পরিবর্তে ব্র্যাণ্ড নামের কায়দা, প্রকৃত উৎপাদনমূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দামে বিক্রি করা, মোড়ক ইত্যাদিতে খরচ করে তার থেকেও লাভ করা, বাতিল-ক্ষতিকর অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বিক্রি করা ইত্যাদি নানা ভাবে চূড়ান্ত ব্যবসা করার সাথে রয়েছে ওষুধে ভেজাল। এটি প্রায় সর্বজনবিদিত একটি নগ্ন সত্য যে, ওষুধ কোম্পানিগুলি

বিশেষতঃ সরকারী হাসপাতালে যে ওষুধ যোগান দেয় তার বেশীর ভাগটাই হয় ভেজাল বা নিম্নমানের, কখনো বা একেবারেই অকার্যকরী। ভারত সরকারের ওষুধ অধিকর্তার মতে ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধের অনুপাত ২৫-৩০%।[১৩] সরকারী ভিন্নতর মতে ২০%।[১৪] বেসরকারী অন্য একটি সমীক্ষায় ৫২%।[১৫] অর্থাৎ যে ওষুধ আমরা বাজার থেকে কিনছি তার দু'টির মধ্যে একটি, কিংবা অন্ততঃ ৪টির মধ্যে একটি নিম্নমানের বা ভেজাল যুক্ত। এ ব্যাপারে সরকারী আন্তরিকতাও সন্দেহজনক। কারণ সারা দেশে, হাথী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ওষুধের মান নির্ধারণ করার জন্য ৩০৫ জন ড্রাগ ইনস্পেকটর রয়েছে। অথচ একমাত্র মহারাষ্ট্রেই ওষুধের কারখানা রয়েছে প্রায় ২০০০, ওষুধের দোকান আছে ১৫০০০।[১৬] ১৯৮৬-এর শুরুর দিকে নতুন দিল্লীতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের সম্মেলন হল। এতে দেখা যায় দেশের মোট ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে সন্দেহজনক ওষুধ পরীক্ষা করার কোন্ ল্যাবরেটরিই নেই, আরো কিছু জায়গায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সব রাজ্যেরই ওষুধের ব্যাপারে তদন্ত করা ও আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার বিশেষ বিভাগ(cell) থাকার কথা। একমাত্র কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে তা আছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ড্রাগ ইনস্পেক্টরের অনুমোদিত সংখ্যা ৩৫০—আছে মাত্র ৫৮ জন।[১৮] অন্য একটি হিসেবে সারা দেশে এই drug inspector-এর সংখ্যা ৬০০ যারা সারা দেশের ৬০০০ ওষুধের কারখানা ও লক্ষাধিক ওষুধের দোকানের উপর নজর রাখবেন বলে আশা করা হয়।[১০] স্পষ্টতই ড্রাগ ইনস্পেক্টরের সংখ্যা হাস্যকর ভাবে কম। এছাড়া রয়েছে এই সব ড্রাগ ইনস্পেক্টরের কারোর কারোর ফাঁকিবাজি, আন্তরিকতার অভাব, ঘুষ নিয়ে মিথ্যে কথা বলা বা ঢিলেঢালা ভাব। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা ভয়াবহ।

আর জাল ওষুধের ব্যাপারটা হয়তো অনেকেই জানেন। কলকাতায় বড়বাজার, চাঁদনীচক ইত্যাদি নানা অঞ্চলে কিছু দোকান ঢালাওভাবে এর ব্যবসা করে। খালি ক্যাপসুলের ভেতরে গ্লুকোজ বা চকের মিহি গুঁড়ো পুরে, নামী কোম্পানির দামী ওষুধের ছাপ মারা হয়। অনেক অসৎ দোকানদার তা কিনে নিয়ে রোগীকে খাওয়ায়। আবার অনেক ওষুধ কোম্পানিও হাসপাতালে যে বিপুল পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ করে তার মধ্যে নিম্নমানের ওষুধ বেশ কিছু পরিমাণে ঢুকিয়ে দেয়। মানুষের অসুস্থতা বা মুমূর্ষু অবস্থা নিয়ে এমন হৃদয়হীন ব্যবসা বোধহয় আর নেই। সাম্প্রতিক একটি আংশিক হিসেবে দেখা যায় দেশে ৪০ কোটি টাকারও বেশী ভেজাল ওষুধ চলছে।[১৮]

আমার-আপনার কাছে হৃদয়হীন—আমাদের সরকারের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। হলে যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। তা হয় না। ১৯৮৪ সালে মহারাষ্ট্রে ২২০টি ক্ষেত্রে ওষুধ সংক্রান্ত মারাত্মক অপরাধ

নথিভুক্ত হয়। এর মধ্যে মাত্র ৬টি ক্ষেত্রে শাস্তি হয়েছে।[১৮] ১৯৮০ সালে সারা ভারতে ১২৮২৯৭টি ওষুধের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে ১৭৬১৫টি নমুনা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে (১৪% ওষুধে) ; এদের মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ৫৩৮০ ক্ষেত্রে (মাত্র ৩০% ক্ষেত্রে)। পশ্চিমবঙ্গের ছবিও আলাদা কিছু নয়। পরীক্ষিত ২৭৪৮টি নমুনায় ৪২৮টি ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে আর শাস্তি হয়েছে মাত্র ১০৬টি ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়। একটি ওষুধের নমুনা ভেজাল প্রমাণের জন্য পরীক্ষাগারে নিয়ে আসার পর তার পরীক্ষা হতে হতে এক বছর বা তারও বেশী সময় কেটে যায়—ভেজাল থাকলেও ততদিন ধরে সে ওষুধ বাজারে চলতে থাকে ; আর এদ্দিন পড়ে থাকার ফলে ওষুধ ও ভেজালটির রাসায়নিক গুণমানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ভেজাল প্রমাণে অসুবিধেও হয়। অনেক ভেজাল ওষুধ এভাবেও পার পেয়ে যায়। কিন্তু সেই টাটকা ভেজাল বাজারে রোগীরা আগেই খেয়ে শেষ করে বসে আছে।

কুম্ভীরাশ্রুর মত, ক্ষুদ্রশিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগ ব্যাপারটিকে ভয়াবহ করে তোলে। এ ধরনের উৎসাহ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার জন্য অন্যান্য সরকারী আইনকানুনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্রশিল্পকে নিছক উৎসাহ দেওয়ার আপাত মহানুভবতা অসদুপায়কেই প্রশ্রয় দিয়েছে। আমেরিকা পৃথিবীর ওষুধ বাজারের ২০% নিয়ন্ত্রণ করে, অথচ সেখানে ওষুধ কারখানা আছে প্রায় ১০০০। আর ভারতবর্ষে বিশ্বের সমগ্র ওষুধের ১.৪% মাত্র উৎপাদন করে, কিন্তু এখানে ওষুধ তৈরীর কারখানা আছে প্রায় ৫০০০, যার মধ্যে ৩০০০-এর বেশী ক্ষুদ্র শিল্প। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এসব 'ওষুধ কারখানার' রহস্যময় চরিত্র মিজোরামের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সত্তর দশকের শেষের দিকে এখানে ৩০০টি এধরনের ছোট ওষুধ প্রতিষ্ঠান রহস্যময়ভাবে দু'বছরের মধ্যে তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলে।[১৮] এসব কারখানার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় টনিক, এনজাইম, কাশির সিরাপ ইত্যাদি হাবিজাবি ও নানা ক্ষতিকর মালমশলা বাজারে ছাড়ে। এসব কারণেও সমগ্র ওষুধ শিল্পকে জাতীয়করণ করাটা অবশ্য প্রয়োজন।

তবে সরকারী মানসিকতা অপরিবর্তিত রেখে তথা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তথাকথিত জাতীয়করণও হাস্যকর হবে। স্বনির্ভরতার ঘোমটা পরিয়ে সৃষ্টি করা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। যেমন ১৯৫৪ সালে সরকারী সংস্থা হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিকস্ লিমিটেড (H A L) গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এটি তৈরী হয়েছে আমেরিকার (মার্ক কোম্পানির) সহযোগিতায়। তবু উদ্দেশ্য ছিল এ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করা। ১৯৫৬ সালে পুনার কাছে পিম্পারিতে এর কারখানা ভারতে প্রথম পেনিসিলিন তৈরী করে। কিন্তু সমস্ত বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যখন ক্রমবর্ধমান হারে এদেশ থেকে মুনাফা লুটছে, তখন অজস্র কারণে এই সরকারী, দেশী সংস্থা প্রতিবছরই কোটি

কোটি টাকার লোকসানে চলছে। ১৯৭৪-৭৫-এ লোকসান হয় ৩.২৮ কোটি টাকা, ১৯৭৬-৭৭-এ ৬৮ লক্ষ টাকা, কিন্তু ১৯৮০-৮১তে আবার ৩ কোটি টাকা। আর বিদেশের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা থাকায় প্রকৃত স্বনির্ভরতা আদৌ নেই। যেমন H A L-এর গবেষকরা এম্পিসিলিন তৈরীর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন (Penicillins I crystal—6 A.P.A.—Ampicillin)। কিন্তু এ আবিষ্কারকে গুরুত্ব না দিয়ে আমেরিকা থেকে 6 A.P.A. আমদানি করে তার থেকেই H A L বানিয়ে চলেছে এম্পিসিলিন। স্বনির্ভরতার কথা নিছক ফাঁকা বুলিতে পরিণত।[১০]

প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির কাছে আমাদের মত দেশ নতি স্বীকারই করে। যেমন আমেরিকার ফাইজার নামে ওষুধ কোম্পানি টেট্রাসাইক্লিন জেনেরিক নামের ওষুধ টেরামাইসিন ব্র্যাণ্ড নামে বিক্রি করে। ফাইজার ছাড়া আরো চারটে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিও এই টেট্রাসাইক্লিনের ব্যবসা করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মত তারা সারা পৃথিবীর বাজার ভাগ করে নিয়ে সুষ্ঠভাবে ব্যবসা করে, যাতে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি না হয়। ফাইজারের ভাগে পড়েছে আমেরিকা,পশ্চিমজার্মানী, ভারত ও এশিয়ার অন্য কয়েকটি দেশ। ব্যবসা ভালই চলছিল। কিন্তু একদিন আমেরিকায় ধরা পড়ল, ফাইজার কোম্পানি অনেক বেশী দামে ওষুধটি বিক্রি করে সরকার ও দেশের মানুষকে ঠকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের আশ্রয় নেওয়া হল, কোম্পানিটি তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হল। পশ্চিম জার্মানীতেও একই ব্যাপার ধরা পড়ল। ভারতেও পরে এ ব্যাপার জানা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মজার আইনে (!) আমেরিকার আদালতে তাদের অভিযুক্ত করার কোন ব্যাপার নেই। (সম্প্রতি ভূপালের ঘটনার পর এ সংক্রান্ত আইনের কিছু সংশোধন করা হয়েছে।) তবে আমেরিকার আইনে ওদের দেশের কোন কোম্পানি বাইরে বেআইনী কাজ করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা করতে করতে কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে ফাইজার কোম্পানি ভেতরে ভেতরে প্রচুর টাকা ঢেলে দেশের আইনটাকেই পাল্টানর জন্য বিল আনার ব্যবস্থা করেছে—এর ফলে অন্য দেশের কেউ ঐ আইনটার সুযোগই পাবে না। ফাইজার যা ঠকিয়েছে ঐ অনুযায়ী ভারত সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত ৯৬০ কোটি টাকা। কিন্তু কোম্পানিটি তা দিতে রাজী না হওয়ায় ভারত সরকার মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যাপারটি ফয়সালা করতে চেয়েছে। অর্থাৎ দেশের মানুষের কাছে কিছু মুখ বাঁচানর চেষ্টা, অন্যদিকে প্রভু দেশের প্রভু কোম্পানিকে না চটান। তা সত্ত্বেও ফাইজার (অন্তত ১৯৮২ সাল অব্দি) কোন উচ্চবাচ্য করেনি। (সাম্প্রতিক ভূপালের ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়।) শুধু আমেরিকা নয়, বৃটেনেও এইভাবে রোশ কোম্পানি লিব্রিয়াম আর ভ্যালিয়াম নামে ঘুমের ওষুধে লোক ঠকিয়ে মাত্রাতিরিক্ত লাভ করার জন্য ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে সে দেশের সরকারকে।[১৬] না, আমাদের দেশে এভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা মুস্কিল। এর

ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলিও যে লাগামছাড়া লাভ করার চেষ্টা করবে, তাতে বিচিত্র কি ? বহুজাতিক হেক্সট কোম্পানি এক কেজি ব্যারালগান কেটোন-এর দাম নিত ২৩৬২৫ টাকা, ১৯৭৭ সালে তা কমে যায় ৪০১৯ টাকায়। ভারত সরকার হিসেব করে দেখল আসল দাম পড়বে আরো কম। দাম ঠিক করে দিল ১৮১০ টাকা। কিন্তু কোম্পানি ভারতীয় আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং জিতে যায় [৭] এমনই আমাদের দেশের আইন।

নামীদামী বৃহৎ বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলি, ব্যাপক প্রচারের জোরে অর্জিত নিজেদের সুনামকে হীনভাবেও কাজে লাগায়। দেশী ছোট কোম্পানিকে কিছু টাকা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে সেগুলো নিজেদের নামে চড়া দামে বিক্রি করে। "আজ ফাইজার কোম্পানি যে বম্বের কিংবা স্যাণ্ডোজ ও হেক্সট দক্ষিণ ভারতের ছোট ছোট কোম্পানিগুলিকে দিয়ে ওষুধ তৈরী করিয়ে নিজেদের ছাপ মেরে বাজারে বিক্রি করে এ সত্যকে চাপা দিয়ে রাখতে পারছে না"। [১৭]

দেশের মানুষের পকেট কেটে এভাবেই ব্যবসা চলে অথবা চালাতে দেওয়া হয়। এগুলি আটকানোর জন্য অনেক কিছুই করা যায়। যেমন ব্র্যাণ্ড নামের ওষুধ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, টনিক ভিটামিন জাতীয় ওষুধের অপপ্রয়োগ বন্ধ করা, ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা, প্রয়োজনীয় ও জীবনদায়ী ওষুধের তালিকা তৈরী করে চিকিৎসক ও জনসাধারণকে জানান, ওষুধে লাভের হার ন্যূনতম করা, সমস্ত ওষুধ কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্ততঃ সরকারেরই নিযুক্ত হাথী কমিটির সুপারিশগুলিকে অনুসরণ করলেই অনেক কাজ হয়। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়ার মত কিছু ছোট ছোট দেশেও এধরনের ব্যবস্থা নিয়ে ছবিটার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমান কাঠামোয় সরকার অন্তত ঐটুকু করতে পারেন। তবে এটি ঠিকই যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের প্রভাব মুক্ত না হতে পারলে, দেশের মানুষের দারিদ্র্য-অপুষ্টি-অশিক্ষার সমাধান না করতে পারলে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হলে—সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে এগুনো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা-তানজানিয়ার মানুষের চাপে সরকার কিছু ব্যবস্থা নিলেও ওদেশের মানুষ যে স্বর্গসুখে আছে তা ভাবার কোন কারণ নেই। ঐ সব দেশেরও ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে, শিশু মৃত্যু, নানা রোগব্যাধি, অপুষ্টি ও বৈষম্যও ব্যাপক। অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করে প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা যদি অনুসরণও করা হয়, তবে ঐসব দেশের কজন মানুষ তাই বা কিনতে পারে ? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকেও ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশের এই বৈষম্য স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এসব দেশের অধিকাংশ মানুষই প্রচলিত ও জ্ঞাত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচী থেকে কোন উপকার পান না। দেশের বৃহত্তর যে জনগণকে তার সেবা করা উচিত তার, পরিবর্তে সে সেবা করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে। ... কাকে বেশী সেবা করা উচিত তার উপর

উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যাদের কাজে লাগা উচিত 'ওষুধ' তাদের হাতে নেই।" [২১] তাই শুধু ওষুধনীতি ও প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাই যথেষ্ট নয়—তা চিবিয়ে খেয়ে রোগ সারবে না। আমাদের দেশেও তা সত্যি। সামাজিক যে সব কারণের জন্য রোগ হয়, বৃহত্তর জনগণ চিকিৎসা পান না, ওষুধ কিনতে পারেন না সেগুলি দূর করাই গুরুত্বপূর্ণ। তবু অবশ্যই চরম দুরবস্থা থেকে কিছু মুক্তির জন্য, সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানর জন্য এ ধরনের ব্যবসা রোধে এখুনি চেষ্টা করা দরকার।

যেমন চীন ১৯৪৯ সালে মুক্ত হবার পর সমস্ত বিদেশী, বহুজাতিক ব্যবসাকে বাজেয়াপ্ত করে এবং স্বনির্ভর শিল্প ও অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। বৈদেশিক আমদানী-রপ্তানির নতুন নীতি গ্রহণ করে তাকে যেমন বাড়িয়ে তোলে তেমনি দেশের মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদী বা বিদেশী শোষণও বন্ধ করে। চীনে ওষুধের উৎপাদন ১৯৫২ সালে ১০০ টনের তুলনায় ১৯৮০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪০১০০ টন।[১৯] ১৯৫০ সালের পর মোট ৮ ধাপে ওষুধের দাম কমান হয়েছে।[২০] তবে চীনে দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন, গাছগাছড়ার ওষুধ, আকুপাংচার, ছিকুং (শ্বাসের ব্যায়াম) ইত্যাদির উপর গবেষণা করে ব্যাপক প্রয়োগ করার ফলে পাশ্চাত্য ওষুধের প্রয়োজন কিছু কম।

কিন্তু আমাদের দেশে সত্যিকারের জনস্বার্থবাহী কোন ওষুধ নীতিই নেই, স্বাস্থ্য নীতি দূরের কথা। এত অজস্র আইনকানুন-নীতিমালা কর্মসূচী রয়েছে ও নেওয়া হচ্ছে, দেরীতে হলেও ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি যাই হোক একটা 'ক্রীড়ানীতি' ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যনীতি, যা দেশের মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্তভাবে যুক্ত তা সূত্রবদ্ধ হয় নি, অথচ এর জন্য দাবী যে ওঠে নি, তা নয়। চিকিৎসকদের বৃহত্তম সর্বভারতীয় বেসরকারী সংগঠন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসেসিয়েশান অন্তত মৌখিক ভাবে এ দাবী করে আসছেন। ১৯৭৮ সালেই প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকপত্রে তাঁরা বলেছিলেন, "জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ছাড়া এই বিশাল দেশের জনগণের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত করা সম্ভব নয়।....বিশেষজ্ঞ কমিটির দেওয়া বিভিন্ন প্রস্তাব এর অভাবে কার্যকরী করাও যাচ্ছে না।"[২২] এসব সত্ত্বেও এখনো স্বাস্থ্যনীতি ঘোষিত না হওয়ার মূল কারণ, তা হলে দেশের শাসকশ্রেণীর অক্ষমতা ও কথাবার্তার পরস্পর বিরোধিতা নগ্ন হয়ে পড়বে, সামাজিক বৈষম্য দূর না করে যে স্বাস্থ্যনীতি ও ওষুধ নীতি অবাস্তব তা স্পষ্ট হয়ে পড়বে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ উচ্ছেদ না করে যে যথার্থ জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি হাস্যকর—তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তবু এই ব্যবস্থাতেই কিছু একটা করার প্রচারিত সদিচ্ছা থেকে ১৯৮৬ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করার কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু এটি জনমুখী না হয়ে পুঁজিবাদীমুখীই হয়েছে। এটি অস্বাভাবিক নয়।

সরকারীভাবেই দেশে পুঁজিবাদী শোষণ সুপ্রসারিত করতে সরকার নিযুক্ত কমিটিই করা হয়েছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আমলে গড়া ডঃ অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি কিছুদিন আগে তাঁদের প্রস্তাবগুলি রেখেছেন এবং সরকার এগুলি গ্রহণ করার কথা ভাবছেন। এসব প্রস্তাবে মূল কথা হল দু'চারটি ছাড়া সব শিল্পোদ্যোগকে বেসরকারী মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া, উন্নত প্রযুক্তি আমদানীর নামে দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি। এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে যে স্বাস্থ্য ও ওষুধ নীতি হয় তাও যে ব্যবসায়িক দিক্ থেকে আরো লাভজনক তা ওষুধ কোম্পানিগুলিও জানে।

তাই সরকারের ওষুধ নীতি ঘোষিত হওয়ার আগেই এ ব্যবসাকে স্বর্ণপ্রসূ বলে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে। একারণে বিশেষতঃ বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির শেয়ার দর হুড় হুড় করে বেড়ে গেছিল ঘোষণার আগেই। কেমন করে বেড়েছিল তা নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে।[২৩]

কোম্পানির শেয়ার	১৯৮৫-এর শেষে দাম (টাকা)	১৪.২.৮৬-তে দাম (টাকা)	শতকরা বৃদ্ধি
এ্যাবট	৪৪	৫২	১৮.২
বেয়ার	৪৪৫	৬৪০	৪৫.৫
বুটস	১৫০	১৮৫	২৩.৩
বারোজ ওয়েলকাম	১৪৭	১৮০	২২.৫
সাইনামিড	৭০	৮২	১৭.১
এসকেয়েফ	১৪২	১৯০	৩৩.৮
মার্ক	৭১	৯২.৫০	৩০.৩
হেক্স্ট	৭৪০	৯৮০	৩২.৪
গ্লাক্সো	৬৩.৫০	৭৯	২৪.৪
হিন্দুস্থান সিবা	৩৯৫	৫৭৫	৪৫.৬
মে এ্যাণ্ড বেকার	৫২	৬৮	৩০.৮
ফাইজার	৮৫	১১৬	৩১.৫
পার্ক ডেভিস	৫৪	৬৮	২৫.৯
রোস	৪৪	৫৫	২৫
র‍্যানবেক্সি	১০৫	১৫৫	৪৭.৬
সার্লে	৩৬০	৪০০	১১.৩
স্যাণ্ডোজ	৬২	৮৭	৪০.৩
ওয়ার্ণার হিন্দুস্থান	৬৪	৯৭.৫০	৫২.৩

প্রকৃতপক্ষে সরকারী এই ঘোষণা ওষুধনীতি বা স্বাস্থ্যনীতি নয়—হয়েছে ওষুধের মূল্যনিয়ন্ত্রণকারী ঘোষণা (Drug Price Control Order or DPCO)। ১৯৮৬-এর ডিসেম্বরে ঘোষণা করা এই তথাকথিত ওষুধনীতি ও ১৯৮৭ সালে ঘোষিত তার সংশোধনীর সুযোগ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলি ওষুধের দাম দিবগুণ হারে বাড়িয়ে ফেলেছে। যেমন এই ঘোষণার আগে হাঁপানির ওষুধ এ্যামাইনোফাইলিনের ১০০০টি ট্যাবলেট যুক্ত বাক্সের দাম ছিল ৫১.৭৪ টাকা। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ তারিখে কেন্দ্রীয় শিল্প রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অরুণাচলম স্বীকার করেছেন, এখন ঐ একই বাক্সের দাম হয়ে গেছে ১৪৭.৫০ টাকা—প্রায় তিনগুণ। টিটেনাস এ্যান্টি টক্সিনের দাম DPCO ঘোষণার পর বেড়েছে ২৫০%। তবে সরকারী চাপে পড়ে কিছু দাম কমানও হচ্ছে। যেমন বারোজ-ওয়েলকাম ১০০০টি এ্যামাইনোফাইলিনের দাম ১৪৭.৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৯৮.৫৫ টাকা করতে রাজী হয়েছে—অবশ্য স্পষ্টই তা আগের দামের প্রায় দিবগুণ। একই ভাবে ক্লোথালটন ট্যাবলেট ১০০টির দাম DPCO ঘোষণার আগে ছিল ১২.৩০ টাকা, ঘোষণার পরে হয়েছিল ৩০ টাকা,—কথাবার্তা বলে এই দাম, যেমন সারাভাই কেমিক্যালস, কমিয়ে করেছে ২৩ টাকা। স্পষ্টতঃ এটিও আগের দামের দিবগুণই। তথাকথিত এই সরকারী ওষুধ নিয়ন্ত্রণ আদেশের পরে যেভাবে দাম বেড়েছে তার একটি আংশিক তালিকা এই রকম[২৪]—

ওষুধের নাম	পরিমাণ	আগের দাম (টাকায়)	পরের দাম (টাকায়)
এমাইনোফাইলিন	১০০০ ট্যাঃ	৫১.৭৪	১৪৭.৫০
পেথিডিন হাইড্রো ক্লোরাইড (১০০ মি গ্রা)	২ মি লি× ১০০টি এ্যাম্পুল	১৪৭.১৩	২৮০.৯৫
বেনাড্রিলকাশিরসিরাপ	১১৪ মি লি	৬.৩৬	৯.০০
এম্পিসিলিন ক্যাপসুল (২৫০ মি গ্রা)	১০০০ ক্যাঃ	১০৬৭.৫৫	১৩৫৮.১০
ক্যালাড্রিল লোশন	১৭১ মি লি	৭.৫৯	১১.০০

স্পষ্টতঃই জনস্বার্থে নয়, যেভাবেই হোক না কেন ব্যবসায়ীদের স্বার্থই এখনো অব্দি রক্ষা করছে এই সরকারী-ঘোষণা।

জনস্বার্থবিরোধী এই ওষুধনীতির পেছনে যে সব রাজনৈতিক কারসাজি করা হয়েছিল তার আঁচ তখনকার একটি প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে—

"বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির চাপের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেই কেন্দ্রীয় সরকার 'জাতীয় ওষুধনীতি'র খসড়া তৈরী করেছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এই ওষুধনীতি লোকসভায় উপস্থাপিত করা হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

"এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ওষুধনীতি নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে রিভিউ কমিটি গঠন করেছিলেন, গত অক্টোবর মাসেই সেই কমিটি তাঁদের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। কমিটির অন্যতম সদস্য ডঃ মীরা শিবার কাছ থেকে সম্প্রতি জানা যায়, বহির্ভারতে নিষিদ্ধ তথা ক্ষতিকারক ওষুধগুলির বিক্রি এদেশে বন্ধ করার জোরালো সুপারিশই ছিল তাঁদের রিপোর্টের মূল কথা। রিভিউ কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে—(ক) ওষুধের উৎপাদন ও বিপণনের সুবিধার্থে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধগুলির একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরী করতে হবে। (খ) স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে বেসরকারী ড্রাগ ইনফর্মেশন সেণ্টার স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। (গ) সুলভ মূল্যে ওষুধ বিক্রি করার জন্য গ্রহণযোগ্য সরবরাহ প্রকল্প চালু করতে হবে। (ঘ) ওষুধ-পত্রের বিপণন ও বাণিজ্যিক ধারাকে নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

"রিভিউ কমিটির প্রস্তাবগুলি অবশ্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক গ্রহণ করতে পারেন নি।......চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত এই রিভিউ কমিটির সুপারিশ সমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অগ্রহণযোগ্য ঠেকায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক খানিকটা বিপাকে পড়ে যান। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন তড়িঘড়ি একটা স্টিয়ারিং কমিটি তৈরী করে তাঁদের হাতে জাতীয় ওষুধনীতি প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। নবগঠিত স্টিয়ারিং কমিটি সম্পূর্ণভাবে আমলা নির্ভর। বেসরকারী কোন ব্যক্তিই—চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক বা স্বাস্থ্যকর্মী—এই কমিটিতে জায়গা পান নি। অতএব, আমলারাই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের 'জাতীয় ওষুধনীতি' নির্ধারণ করলেন।......

"(স্টিয়ারিং কমিটির এক সদস্য) পরিস্কার ভাষায় জানালেন, পূর্ববর্তীরিভিউ কমিটির সুপারিশগুলি মেনে 'জাতীয় ওষুধনীতি' নির্ধারণ করতে গেলে বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে একটা বিরোধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিত। কেন্দ্রীয় সরকার এই মুহূর্তে এ ধরনের কোন বিরোধ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে চান।....স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশসমূহে এমন কিছু নেই যা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থহানি ঘটাতে পারে। বরং তাদের দাবিগুলি যথাসম্ভব মেনে নেওয়াই হবে জাতীয়ওষুধনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।"[২৫]

সত্যি কথা বলতে কি "প্রভাবশালী ভারতীয় কোম্পানি-গুলি যদি দাবী করে যে, নতুন ওষুধ নীতির আদৌ কোন দরকার নেই,যা চলছে তাই চলুক, তাহলে এই নীতি ঘোষণার ব্যাপারটি আরো দূরে সরে যাবে।"[৭] প্রস্তাবিত এই ওষুধ নীতিতে

আরো বলা হয়েছিল পেটেণ্টের মেয়াদ ৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হবে। ব্র্যাণ্ডনাম আদৌ না তুলে তাকে এভাবে আরো জোরদার করা হবে। এর ফলে পেটেন্ট নেওয়া বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড নাম ওষুধ কোম্পানি গুলি আরো দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করার তথা দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবে।

হ্যাঁ, আপাত অবিশ্বাস্য মনে হলেও—প্রায় ৪০ বছর ধরে স্বাধীন, ওষুধনীতিহীন একটি দেশের সম্ভাব্য 'ওষুধনীতির লক্ষ্য ছিল এটিই।

তবু এই নয়া, তথাকথিত জাতীয় ওষুধনীতিতে (১৯৮৬) কিছু ভাল ভাল কথাও বলা হয়েছে যদিও প্রকৃত প্রয়োগের অভাবে সেগুলি এখনো কথার কথা হয়েই আছে। যেমন বলা হয়েছে,"স্বাস্থ্য মানুষের প্রাথমিক একটি অধিকার।" স্বীকার করা হয়েছে, যথেষ্ট চিকিৎসাগত যৌক্তিকতা ছাড়াই, যেভাবে দেশে নানা ফর্মুলার, নানা ঢং-এর ওষুধ বেড়ে চলেছে, তা চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ করা, নতুন ফর্মুলার ওষুধ নথিভুক্ত করা, ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করা, দেশে বাজারজাত করা ওষুধের জন্য দেশের সরকারী বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যে নিতান্তই নগণ্য, তাও স্বীকার করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ও নানা রাজ্যে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সমস্ত ওষুধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা, ব্যবহার ও প্রেসক্রিপশান-এর সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করার জন্য সেণ্ট্রাল ইনফর্মেশান ব্যাঙ্ক স্থাপন করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। নতুন 'ওষুধ' বাজারজাত করার ব্যাপারেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা ভাবা হয়েছে।[২৬]

কিন্তু এতসব ভাবনাচিন্তা অসার প্রতিপন্ন হয় যখন দেখা যায় এগুলিকে বাস্তবায়িত করার প্রকৃত উদ্যোগ অনুপস্থিত। স্বাস্থ্যেরঅধিকার সহ নানা মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সংবিধানে গালভরা কথাবার্তা থাকলেও দেশের বৃহত্তর জনগণের কাছে সেগুলি যেমন বিগত ৪০ বছরেও আকাশকুসুম থেকে গেছে, তেমনই এই ওষুধনীতির কথাবার্তাগুলিও প্রচলিত ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে ব্যবসায়ীদেরই স্বার্থরক্ষা করেছে। সরকারেরই নিযুক্ত হাথী কমিটি ১৯৭৫ সালেই সুপারিশ করেছিলেন—বহুজাতিক সংস্থাগুলির জাতীয়করণ করা হোক, ওষুধ প্রযুক্তিতে দেশীয় প্রযুক্তি ও পাবলিক সেক্টরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক, বাজারে চালু হাজার হাজার ওষুধের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় সীমিত সংখ্যক উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হোক, ওষুধের বাণিজ্যিক বা ব্র্যাণ্ড নামের পরিবর্তে জেনেরিক নাম চালু করা হোক ইত্যাদি। কিন্তু এসব সুপারিশকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। এই মানসিকতা অপরিবর্তিত রেখে নয়া ওষুধনীতি নেহাতই একটি ধোঁকা।

১৯৮৬ সালে বোম্বাই-এর বিখ্যাত জে জে হাসপাতালে বিষাক্ত গ্লিসারল খেয়ে ১৪ জনের মৃত্যু এবং তারপর অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী

টালবাহানা এই ধোঁকাবাজি ও জনস্বার্থবিরোধী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার আরো নগ্নভাবে ঘটেছে।

জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক (এক ও দুই নং ক্যাটেগরীর) ওষুধে সরকারের বেঁধে দেওয়া লাভের সর্বোচ্চ সীমা, উৎপাদনমূল্যের শতকরা ৪০-৭৫ ভাগ। ওষুধনীতি ঘোষিত হওয়ার আগে থেকেই বহুজাতিক কোম্পানি চেয়েছিল এই হার আরো বাড়াতে। টনিকে (চার নং ক্যাটেগরির ওষুধ) লাভের হার সীমাহীন (অর্থাৎ দামের নিয়ন্ত্রণ নেই)। এরা তেমনি লাভ করতে চায় এবং নতুন ওষুধ নীতি অনুযায়ী অত্যাবশ্যক জীবনদায়ী ওষুধে লাভের হার বাড়াতে সরকারও রাজী হয়ে গেছেন। ন্যাশন্যাল ড্রাগ্‌স এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস কাউন্সিল-এর স্টীয়ারিং কমিটি সুপারিশ করেছিল মূল্যনিয়ন্ত্রণ করার যোগ্য ওষুধের সংখ্যা কমাতে। ঘোষণার আগে ৩৬৮টি ওষুধের দাম সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল—অর্থাৎ এসবে যথেচ্ছ গাঁটকাটা যেত না। কিন্তু স্টীয়ারিং কমিটির মত ছিল এ সংখ্যা ৯০-এ নামিয়ে আনা উচিত। আর ওষুধ উৎপাদককের সংগঠন, অর্গানাইজেশান অব্ ফার্মাসিউটিক্যালস অব্ ইণ্ডিয়া (OPPI) চাইছিল, এ সংখ্যা ২০-তে নামিয়ে আনা হোক—শুধু যক্ষ্মা কুষ্ঠের মত দু'চারটি রোগের ওষুধের জন্য। বাকী সমস্ত ওষুধে তারা চায় লাগাম ছাড়া লাভ করতে।

তবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে সরকারী ঘোষণায় নিয়ন্ত্রিত দামের ওষুধের সংখ্যা এত কম আর করা হয় নি। এ সংখ্যাটি করা হয়েছে ১৬৮—অর্থাৎ আগের থেকে ২০০টি কম ওষুধ। এইভাবে ওষুধ কোম্পানিরগুলি আগে যে সব ওষুধে লাগামছাড়া লাভ করত, এখন ঐ সব ওষুধের সাথে আরো ২০০টি ওষুধ যোগ করে দেওয়া হল—হ্যাঁ, আমাদের সরকারই তা করে দিলেন। এবং ভয়াবহ হল টীকা, জীবনদায়ী সেরাম ও আরো অনেক জীবনদায়ী ওষুধই বর্তমানে হয়ে গেল অনিয়ন্ত্রিত। এ সবের দাম ইতিমধ্যেই বেড়ে গেছে—হয়তো আরো বাড়বে। (আগের তালিকা দ্রষ্টব্য) ওষুধ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ হয়ে উঠছে বিত্তশালীদের ব্যাপার ; গরীব জনসাধারণের জন্য ক্রমশঃ আরো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার দরজা; রোগ থেকে মুক্তি আর মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার চাবি কাঠি গরীব মানুষদের হাতের নাগাল থেকে তুলে রাখা হল আরো উঁচুতে।

বহুজাতিক কোম্পানির লোমহর্ষক ওষুধ-গবেষণা

মানুষের জ্ঞানের বিকাশের জন্য ও এই বিকশিত জ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলে লাগানোর উদ্দেশ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই কাম্য। ওষুধ সম্পর্কিত গবেষণাও তার ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু বহুজাতিক বৃহৎ ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রায় সবগুলিই নিছক মুনাফার

ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়েতাদের তথাকথিত ওষুধ গবেষণা চালায়, নতুন 'ওষুধ' আবিস্কার করে পেটেন্ট নিয়ে বাজার জাত করার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। ওষুধের নামে অনেক ক্ষতিকর পদার্থ যেমন এভাবে আবিস্কৃত হয়েছে, তেমনি সত্যিই কার্যকরী অনেক ওষুধও আবিস্কৃত হয়েছে, উপকৃত হয়েছে মানুষ। কিন্তু ওষুধ কোম্পানির আসল লক্ষ্য অবশ্যই মানুষের উপকার করা নয়,—শুধু পুঁজির পাহাড় জমান ছাড়া। আর এর জন্য তারা হেন কোন অপকর্ম নেই যা করতে পারে না। ক্ষতিকর বলে জানা সত্ত্বেও সেই ওষুধের ব্যবসা করা, উন্নত দেশে নিষিদ্ধ 'ওষুধ' তৃতীয় বিশ্বে চালান, অপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করা ও তার চাহিদা গড়ে তোলা ইত্যাদির পাশাপাশি, এদের করা গবেষণার রীতিপদ্ধতির একটি নমুনা থেকে তাদের দানবিক চরিত্রের কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

হিটলারের সময় জার্মানির আই. জি. ফার্বেন-এর সংস্থাটি আউস-উইৎস কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পে তাদের গবেষণা চালায়। এই সংস্থাটি বর্তমানে হেক্সট, বেয়ার ও বি এ এস এফ কোম্পানিতে বিভক্ত এবং এখন হেক্সট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও বেয়ার তৃতীয় বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানি।উপরোক্ত কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প থেকে ফার্বেন অসহায় বন্দীদের কিনে নিত 'গবেষণার' জন্য। ঐ ক্যাম্প কর্তপক্ষকে লেখা ফার্বেন-এর কিছু চিঠির অংশবিশেষ এই রকম—

"ঘুমের একটি নতুন ওষুধের পরীক্ষাদির উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য আপনারা যে বেশ কিছু মহিলা জোগাড় করে দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের উত্তর পেয়েছি, কিন্তু একজন মহিলাপিছু ২০০ মার্ক (জার্মান মুদ্রা) আমাদের কাছে বেশী মনে হচ্ছে। আমাদের প্রস্তাব মাথাপিছু ১৭০ মার্ক রাখুন। যদি রাজী থাকেন তবে আমরা মহিলাদের নেব। আমাদের প্রায় ১৫০ জন দরকার।......"

"১৫০ জন মহিলা পেয়েছি। তারা বেশ রোগা, তবে কাজ চলে যাবে। আমাদের পরীক্ষাদির ফলাফল পরে জানাব।"

"পরীক্ষাদি করা হয়েছে। সবাই মারা গেছে। নতুন এক দলের জন্য আমরা শিগ্গির আবার যোগাযোগ করছি।"[২৭]

হুবহু এ ছবি হয়তো এখন পাল্টেছে, কিন্তু মূল মানসিকতা পাল্টায় তো নি, বরং ব্যাপকতর হয়েছে।

যেমন আরেকটি বহুজাতিক কোম্পানি সিবা-গেইগি তাদের নতুন কীটনাশক পরীক্ষা করেছে তৃতীয় বিশ্বের গরীব শিশুদের উপর। মাত্র কয়েক পেনি মুদ্রার বিনিময়ে খোলা মাঠে প্রায় নগ্ন করে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তাদের উপর দিয়ে পরীক্ষাধীন কীটনাশক গ্যালেক্রন ছড়িয়ে দেয় একটি এয়ারপ্লেন। পরে শিশুদের প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয়। ১৯৭৬ সালে আলেক্সান্দ্রিয়ায়এই 'গবেষণা' চালায় সিবা-গেইগি।[২৮]

নিজের দেশের মানুষদের তারা এভাবে সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরীক্ষার গিনিপিগ করতে সাহস পায় না। কিন্তু ভারতের মত দেশের গরীব মানুষেরা এ ধরনের গবেষণার ব্যাপক শিকার।

এই ব্যাপকতার অন্য কিছু দিক বোঝা যাবে এদের গবেষণার বৈষম্য থেকেও। ধনী বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যে সব দেশের, ঐ সব দেশে এরা তাদের আয়ের ১০% গবেষণার পেছনে খরচ করে। কিন্তু ভারতে এ বাবদে বিনিয়োগ মাত্র ১.৫% আর এ গবেষণাও মৌলিক কোন গবেষণা নয়; নানা অপ্রয়োজনীয় উপাদান কিভাবে সুষ্ঠুভাবে মিশিয়ে ব্যবসা করা যায় তার জন্যই এর সিংহভাগ ব্যয় করা হয়।[১০] এইভাবেই তৈরী হয় হাজার হাজার ব্র্যাণ্ড নামের ওষুধ॥।

• • •

এইভাবেই চলছে ওষুধ নিয়ে বেসাতি। সরকারী ভাবেও আইন করে এই বেসাতিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলছে। ক্রমবর্ধমান মুনাফার জন্য লালায়িত বহুজাতিক কোম্পানি আর দেশীয় দোসরদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সোনার সিঁদকাঠি।

সূত্র

১। Socialist Health Review ; June, '85

২। In Search of Diagnosis ; Medico Friends Circle.

৩। Dr. Pankaj Saha (Link, August, 1984)

৪। The New England Journal of Medicine ; 4. 10. 84.

(মাসিক গণস্বাস্থ্য থেকে সংগৃহীত)

৫। Health for Million ; Voluntary Health Association of India, 1981.

৬। The Statesman ; 21. 2. 86.

৭। India Today ; 15. 6. 85.

৭ (ক)। Drugs and the Common Man ; Science Today, November, 1970

৮। আজকাল ; ২১. ১. ৮৬

৯। Bitter Pills, Diana Melrose, 1982.

১০। Aspects of Drug Industry in India ; Mukarram Bhagat ; 1982

১১। ঐ (মূল সূত্র : Transnational Corporations and the Pharmacutical Industry ; United nations Centre on Transnational Corporation ; United Nations, New York, 1979)

১২। Insult or Injury ? (Indian Edition), Charles Medawar, 1981.

১৩। Delhi Recorder, July 8, 1981

১৪। Estimates Committee of the Parliament

১৫। Drugs & the Third World, Anil Agarwal

১৬। Medical Times, August, 1981 (Dr. S. K. Bhattacharya)

১৭। প. ব ডা. কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির মুখপত্র, অঙ্কুর, অক্টোবর, ১৯৭৯ ; (কমিটির নিউ ব্যারাকপুর শাখা আয়োজিত আলোচনায় সভার FMRAI-এর পূর্বাঞ্চলীয় সম্পাদক শ্রী অমিতাভ গুহের বক্তৃতা)।

১৮। The Statesman ; 3. 3. 86

১৯। China Handbook Series—Economy (1984)

২০। China Reconstructs, March, 1985

২১। Community Health in Asia.Edited by Susan B. Rifkin, 1977

২২। The Statesman, 2. 9. 78.

২৩। The Economic Times ;18.2.86.

২৪। Sunday ; 17-23 April, 1988

২৫। আজকাল ; ৬. ১. ৮৬ (শ্রী শুভশঙ্কর ভট্টাচার্য)

২৬। Drug Disease Doctor (Drug Action Forum, W. B.), Vol 2, No.1 (Jan., 1987)

২৭। Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, John Braithwate (1984) (Socialist Health Review, Vol II, No. I, থেকে সংগৃহীত)।

২৮। Gluttons for Punishment, James Erlichman (Bhopal : The Lessons of a Tragedy, Sanjoy Hazarika, 1987 থেকে সংগৃহীত)।

....শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দেবযহিংসা বিলাসবিভ্রম
সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।

(রক্তকরবী প্রসঙ্গে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঠাকুরের পাদোদকের মত টনিক, সেক্স টনিক, নার্ভ টনিক, লিভার টনিক, হজমে ও গ্যাসের দাওয়াই ইত্যাদি কাজ করে নিছক মানসিক প্রভাবে, ক্ষতিকর অপ্রয়োজনীয় বলে অন্যত্র নিষিদ্ধ বহু ওষুধ এদেশে চালু আছে। বেবিফুড, টুথপেষ্ট, হরলিকস্, বোরোলিন, কেওকার্পিন, ওয়েসিশ ধরনের নানা পণ্যের প্রতি প্রচারের জোরে সৃষ্টি হয়েছে মিথ্যা ও ক্ষতিকর অন্ধ বিশ্বাস, এসব নিয়েই এ বই। সাথে আছে কিছু ওষুধের অপরিনামদর্শী ব্যবহারের কুফল, ভারত সরকারের নিষিদ্ধ করা ওষুধ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা আছে, সংশ্লিষ্ট শারীরিক অসুবিধার নিরাপদ প্রতিবিধান ও নির্মম ওষুধ ব্যবসার কিছু দিক। চিকিৎসক—অচিকিৎসক সকলের গ্রহণীয় একটি বই।